গবেষণা পত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

রাধা গঙ্গোপাধ্যায় (নাগ)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯৬

পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রস্তুত গবেষণা-পত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

গবেষক — রাধা গঙ্গোপাধ্যায় (নাগ)

গবেষণা নির্দেশক - ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
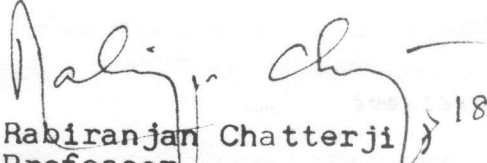
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১৮/১২/১৯৯৬

R. RABIRANJAN CHATTERJI
ROFESSOR
EPARTMENT OF BENGALI
NIVERSITY OF BURDWAN

GOLAPBAG, BURDWAN
PIN - 713 104
WEST BENGAL

This is to certify that Smt. Radha Gangopadhyay (Nag) has worked on the problem entitled "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প" under my direct supervision and that she has fulfilled the requirements of regulations relating to the nature, period of research and presentation of Seminar talk. It is also certified that the research work embodies the results of an original investigation made by Smt. Gangopadhya (Nag). The thesis now submitted is in fulfilment of the Ph.D. (Arts) degree in Bengali of the University of Burdwan and it has not been presented before for any degree whatsoever by her or anyone else.

18.12.96

(Rabiranjan Chatterji)
Professor
Department of Bengali
University of Burdwan
and
Supervisor of
Smt. Radha Gangopadhyay(Nag)

সূচীপত্র

ভূমিকা

আদিকাল থেকে মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই । ছোটবেলা থেকেই গল্পরসের প্রতি আমার খুব আকর্ষণ। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করবার সময় ছোটগল্পে মানবজীবনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পেয়েছি; ফলে ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও বেড়েছে। এম. এ পড়বার সময় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের সংস্পর্শে এসে, তাঁদের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছোটগল্পের বিচিত্র রূপ-রীতি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। এই সূত্রে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠছোটগল্পকারদের – বিশেষ করে, শেকভ, গোর্কী, টুর্গেনিভ, মোপাসাঁ, ওহেনরী, সমারসেট মম প্রভৃতির গল্প পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছি। তাছাড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির সঙ্গে ছাত্রজীবনেই পরিচয় ঘটেছে। ছাত্রজীবন শেষ করে আমি তাই ছোটগল্প নিয়ে গবেষণার কথা ভেবেছি। একজন ছোটগল্পকারের সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আলোচনা করবো বলে স্থির করি।

ছেলেবেলায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিনতাম প্রধানত 'টেনিদা'র জন্য। তখন নারায়ণবাবুর অনান্য গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলাম না। পরবর্তীকালে দেখলাম যে, ছোটগল্প নিয়ে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেখানে নারায়ণবাবু সম্পর্কে সামান্যই লেখা হয়েছে। উৎকৃষ্ট গল্প লেখা সত্ত্বেও সমালোচকবৃন্দের দ্বারা উপেক্ষিত তিনি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং আমার পিতা জগন্নাথকিশোর কলেজের অধ্যাপক সঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে আমি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প এবং অ্যানান্য রচনাগুলি পড়তে শুরু করি। ছোটগল্পগুলি পড়তে পড়তেই আমি বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি যে তাঁর অনেকগুলি গল্পই রসোত্তীর্ণ, অথচ এই সুন্দর গল্পগুলি গবেষক ও সমালোচকদের দৃষ্টিপ্রদীপে ধরা পড়েনি তেমন উজ্জ্বলভাবে; ফলে তাঁর গল্পের গুরুত্বপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একই সঙ্গে সমালোচক ও স্রষ্টা। ছোটগল্পকার ও ছোটগল্পের রূপ-রীতি, আঙ্গিক বিষয়ে তিনি 'ছোটগল্পবিচিত্রা', 'সাহিত্যে ছোটগল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। নিজের রচিত গ্রন্থের ছোটগল্প-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাকে তিনি যে-ভাবে তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলিতে প্রতিফলিত করেছেন, তা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয় বলে মনে হয়েছে আমার। তাছাড়া তাঁর ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাবৈশ্বর্য এবং সরস পরিবেশনভঙ্গী আমাকে তাঁর গল্পগুলিকে নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছে।

এই গবেষণা করতে গিয়ে আশাতীতভাবে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি। প্রথিতযশা অধ্যাপক ও সাহিত্য-গবেষক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর মূল্যবান মতামত জানিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর মত বড় মাপের মানুষের কাছে আমি একজন অতি নগণ্য হয়েও যে আশাতীত স্নেহ ও সাহায্য পেয়েছি, তা ভাবতেও অবাক লাগে। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ও আমার গবেষণায় তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য আমার গবেষণার শেষ পর্যায়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সনৎ মিত্র গবেষণা-পত্র প্রস্তুত বিষয়ে সস্নেহ উপদেশ দিয়ে আমাকে সবিশেষ উপকৃত করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিঠি-পত্রে যোগাযোগ করে উপকৃত হয়েছি। নারায়ণবাবুর 'টেনিদা'র উৎস ও প্রেরণাস্থল 'আসল টেনিদা' প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তিনি আন্তরিকভাবে কথা বলে আমার গবেষণার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার গবেষণার পথ-নির্দেশক ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। তিনি পথ না দেখালে, উৎসাহ না দিলে আমার গবেষণার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। তিনি আমাকে গবেষণার ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন; আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছেন, তাতে কেবল গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রেই আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারবো। আমি ওঁর কাছে চিরঋণী।

গবেষণার কাজে প্রধানত ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমি এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সন্দীপ দত্তের অকৃপণ সাহায্যের কথা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাহায্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রকাশকাল ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করতে সন্দীপবাবু আমাকে সাহায্য করেছেন।

— রাধা গঙ্গোপাধ্যায় (নাগ)

১৮/১২/৯৬

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঃ দেশ - কাল - পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলা সাহিত্যে বিচিত্রমুখী প্রতিভা নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্বিভাব। মহাযুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ সৃষ্ট সমাজ-বিকৃতি , মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার অবক্ষয় তাঁর কলমের মুখে যেমন এসেছে, তেমনি এই বাস্তব পঙ্গুঁতার পাশে তিনি বিস্ময়করভাবে রোমান্টিকতাকে ও নির্মল হাস্যরসধারাকে স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর রচনাবলী এক অনন্য বিশিষ্টতা নিয়ে হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের দেশ - কাল - পটভূমিকে জানতে হলে সে সময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাই সে বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক্।

রাজনৈতিক –

নারায়ণবাবুর শিল্পী — সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে দেশ - কালের পটভূমিতে আবিষ্কার করার জন্য তাঁর জন্মের, অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত আলোচনা করছি। কারণ, জন্মের পর থেকে নানা ঘটনা চেতনে ও অবচেতনে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব গঠন করে। নীচে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির কালানুক্রমিক উল্লেখ করা হলো।

১৯১৮ সাল – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম কাল – অর্থনৈতিক সঙ্কট ও হতাশার যুগ।

১৯১৯ সাল –রাউলাট আইন ও জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

১৯২০ সাল – অমৃতসর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট প্রকাশ, বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা, রাশিয়ায় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা।

১৯২১ সাল – কেন্দ্রীয় আইন সভার উদ্বোধন, মালাবার অঞ্চলে মোপলা বিদ্রোহ, ভারতে প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের আগমনে প্রতিবাদ ও হরতাল পালন।

১৯২২ সাল – চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড; গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার, ইংরেজ সরকারের দ্বারা গান্ধীজীর গ্রেপ্তার; স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব ও কংগ্রেসে ভাঙ্গন।

১৯২৩ সাল – কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির ঐক্যপ্রতিষ্ঠা।

১৯২৪ সাল – কেন্দ্রীয় আইন সভার উদ্বোধন; কামাল পাশা কর্তৃক খলিফা পদের অবলোপ; লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন।

১৯২৫ সাল – ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষভাবে কানপুরে 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠা এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সারা ভারতে আন্দোলন, স্বরাজ্য দলে ভাঙন, হিন্দু মহাসভা দলের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

১৯২৬ সাল – সাম্যবাদী পত্র-পত্রিকা ঃ 'লাঙল,' 'গণবাণী', 'ক্রান্তি', 'কীর্তি', 'কিষাণ', ইত্যাদির প্রকাশ । ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রসার।

১৯২৭ সাল – শ্রমিক - কৃষকদের মধ্যে ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে চেতনার প্রসার; সাইমন কমিশন বর্জন ও কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের বিকল্প খসড়া রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯২৩ – ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ১১২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আনুমানিক ৪৫০ জনের মৃত্যু হয় ও ৫০০০ ব্যক্তি আহত হন।[১]

১৯২৮ সাল – সারা ভারতে ২০০টিরও বেশী শিল্প ধর্মঘট; লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা; মহম্মদ জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগ।

১৯২৯ সাল – মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সঙ্কট কাল; কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী; মহম্মদ আলী জিন্নার চোদ্দ দফা দাবী পেশ; কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভগৎ সিং কর্তৃক বোমা নিক্ষেপ এবং বড়লাট আরউইনের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ।

১৯৩০ সাল — গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, পেশোয়ার, মাদ্রাজ, বম্বে, কলকাতা, চট্টগ্রাম, করাচী, দিল্লীতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ; সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন। বিনয় - বাদল - দীনেশের মহাকরণ অভিযান; বৃটিশের দমন নীতির ফলে মেদিনীপুর, কলকাতায় সন্ত্রাসের রাজত্ব। কিছু স্থানে কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রমিক বিদ্রোহ; বম্বেতে দাঙ্গা। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা —কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর আন্তর্জাতিক মূল্যহ্রাস। ২৬শে জানুয়ারী দেশনেতাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন — বৃটিশ সরকার কর্তৃক কংগ্রেস পার্টি বেআইনী ঘোষিত। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ; মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণে তীব্র গণ-প্রতিবাদ।

১৯৩১ সাল —কলকাতায় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন। 'চাষী', মজুর', 'দিন-মজুর', 'মার্কস-পন্থী' 'মার্কসবাদী' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ। বন্দী কংগ্রেসীদের মুক্তিলাভ; গান্ধী - আরউইন চুক্তি; গান্ধীজীর দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান ও শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩২ সাল — আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় — গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দী; গান্ধীজীর অনশনভঙ্গ ও পুণাচুক্তি।

১৯৩৩ সাল — গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিতকরণ।

১৯৩৪ সাল — কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা — ভারতের রাজনীতিতে বামপন্থী দলের শক্তি বৃদ্ধি।

১৯৩৫ সাল — বিভিন্ন কারাগারে বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রসার। ভারত-শাসন আইনে বৃটিশ রাজ সম্মতি — প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রবর্তন।

১৯৩৬ সাল — মুক্ত বিপ্লবীদের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগদান। নতুন শাসন আইনে কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত; নিখিল ভারত কৃষকসভার প্রতিষ্ঠা; ফৈজপুরে জাতীয় কংগ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তী সম্মেলন।

১৯৩৭ সাল — নির্বাচনে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৩৮ সাল — হরিপুরায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন।

১৯৩৯ সাল — কংগ্রেস দলের সভাপতির পদ থেকে সুভাষ চন্দ্র বসুর পদত্যাগ। ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ। ভারতের বড়লাট লিনলিথগোর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগের নির্দেশ। মুসলিম লীগের ২২শে ডিসেম্বরকে কংগ্রেস শাসন থেকে 'মুক্ত দিবস' হিসাবে ঘোষণা।

১৯৪০ সাল — বৃটিশ সরকারের নিকট কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণপরিষদের দাবী; ফ্রান্সের পতন; সুভাষ চন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার, গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা।

১৯৪১ সাল — অন্তরীণ সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তর্ধান। আটলান্টিক সনদ ঃ রুজভেল্ট ও চার্চিলের যুদ্ধ ঘোষণা। ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ধৃত বন্দীদের মুক্তি।

১৯৪২ সাল — সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতন। ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান; ক্রীপসের লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন। গান্ধীজীর ' ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা; কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার এবং কংগ্রেস দল বেআইনী ঘোষিত। সারা ভারতে হাঙ্গামার সূত্রপাত।

১৯৪৩ সাল — মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্য; বাংলায় সর্বনাশা মন্বন্তর।

১৯৪৪ সাল — ভারতীয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সহায়তায় জাপানী সৈন্যের ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অনুপ্রবেশ। মিত্রবাহিনীর ফ্রান্সে অবতরণ। ইম্ফলে জাপানী সৈন্যের পরাজয়। রাজাগোপালাচারির সূত্র প্রকাশিত; গান্ধী - জিন্নার বৈঠক ও আলোচনায় কোনও ফললাভে ব্যর্থতা।

উপরের সাল-ভিত্তিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ২৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবেশের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর মানসিক গঠনে ঐ ঘটনাবলীর সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। বিশেষ ক'রে, কিশোর ও নবীন যুবক নারায়ণ প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতবাসীর পরাধীনতা মুক্তির আন্দোলন — যা ছিল অহিংস এবং সশস্ত্র। তিনি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে একদিকে যেমন সচেতন হয়েছেন, তেমনি দেখেছেন পঞ্চাশের মানুষ-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের দুঃসহ রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ও যুদ্ধোত্তর জীবনের অসহায় অন্ধকার, জটিল রাজনৈতিক চক্রান্ত, জীবনের কুশ্রীতার বীভৎস নগ্নরূপ, অর্থনৈতিক সঙ্কট, পরিস্থিতির দ্রুত বদল, মার্কসবাদী ও ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগের দানবীয় আবির্ভাবে মানবিক মূল্যবোধের হ্রাস প্রভৃতি সেই রাজনৈতিক পটভূমির

মানচিত্রের আউট-লাইন রচনা করেছিল। পরাধীন ভারতের মুক্তিসংগ্রাম একদিকে যেমন প্রেরণা ও আদর্শস্থল স্থাপন করেছিল, তেমনি বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে কালোবাজারী, আদর্শহীনতা সৃষ্টি করেছিল কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের। রাজনৈতিক কূট চক্রান্তের শিকার হয়েছিল বহু মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় — সেই রক্তপাতের পরিণতিতে হয়েছিল দেশবিভাগ — দেশমাতার শব-ব্যবচ্ছেদ।

বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে সব সমস্যা চরমে পৌঁছেছিল। ১৯৪১ সালে কলকাতা মহানগরীতে 'ব্ল্যাক আউট' (জাপানী বোমার আক্রমণ-আশঙ্কায় অন্ধকারে জনহীন নীরবতা) ১৯৪২ - এর আগস্ট আন্দোলন, মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও একই যুগের সূত্রে গাঁথা। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক অস্থিরতাতো আছেই। কংগ্রেসের ব্যর্থতা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও স্বল্পায়ু সরকারের খামখেয়ালীপনা এবং খাদ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এ যুগে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপে ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল উদ্বেগ, অশান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা। অর্থনীতি যেমন বিপর্যস্ত, প্রশাসনও তেমনি সন্ত্রস্ত হয়েছিল। দ্বিধা, সংশয় ও বিভ্রান্তির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল রাজনীতি। সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছিল, বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল - আর বিশ্বাসহীনতার অন্ধকারে পুরনো মূল্যবোধ অচল মুদ্রার মত মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস ঘূণপোকার মত কুরে কুরে খেয়েছিল এই রাজনৈতিক মলাটকে। মহাযুদ্ধের সুযোগে বিত্ত-স্ফীত অসংখ্য মানুষ - মজুতদার ও কালোবাজারীর দল পরস্পর হাত মিলিয়ে বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ফলে দেখা দিয়েছিল তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মহামারী। মহানগরী কলকাতায় দু'মুঠো খাবারের আশায় গ্রাম ছেড়ে আসা বাস্তুচ্যুত মানুষের ভীড় জমেছিল — জৈবিক ক্ষুধার তাগিদে ডাষ্টবিনের ফেলে-দেওয়া খাবার নিয়ে মানুষ আর কুকুর কাড়াকাড়ি করেছিল। এই রাজনৈতিক সংকটাবর্তের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কেবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সেই সঙ্গে সাহিত্য - সংস্কৃতির জগতেও এই অর্থনৈতিক মন্দা, হতাশা ও অবক্ষয়ের ছাপ পড়েছিল। বস্তুত, "মন্বন্তর, অভাব, অবসাদ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মানুষের নৈতিক অধঃপতন সব মিলিয়ে এক পর্যুদস্ত সময়কাল।"[২] এ সময়ে বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক পট পরিবর্তিত হলে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কৌশলগত রূপান্তর ঘটেছিল এবং ভারতের কম্যুনিস্টদের কাছে বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বদলে গিয়েছিল। ফলে এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে জনযুদ্ধের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। পরাধীন ভারতের এই রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রাম নারায়ণবাবুকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর নিজের ভাষায় - " ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ। ......সেদিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সঙ্কল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কখনো কলম ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য।"[৩]

সামাজিক —

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সাহিত্যক্ষেত্রে যখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব তখন মহাযুদ্ধের ত্রাস, অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা, সংশয়, ভঙ্গুরতা, শঠতা, নিরাশা ও জটিলতা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে সমাজকে। সমাজে তখন আশাভঙ্গের আক্ষেপ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের অন্তর্জ্বালা, অস্থির নিরাশ্রয় হৃদয়ে অপরিসীম যুগযন্ত্রণা হাহাকার, শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা ও ক্লান্তিতে আকীর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ যখন ধ্বংসমুখী এবং জীবন-সংগ্রামে পরাজিত মানুষের স্থান যখন গ্রহণ করেছে চলিষ্ণু নতুন যুগের স্বার্থপর মানুষের দল, সেই নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বে ফাটল-ধরা সমাজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পদক্ষেপ।

তখন পরিস্ফীত অর্থনীতির দৌলতে সমাজের পুরোনো মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। স্খলিত গোত্র মানুষ ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রানুগ সমাজশক্তির বৃত্ত থেকে। দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসঙ্কট, চোরাকারবার, বেকারত্ব সমাজকে ঠেলে দিয়েছে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় ও সঙ্কটের মুখে। ফলে মরীয়া সমাজ হয়ে উঠেছে উদ্ধত, দুর্বিনীত এবং অভিনবতার পূজারী। স্বাভাবিক জীবনধারা ও চিন্তাধারা হয়ে গেছে বিপর্যস্ত। বিশ্বযুদ্ধের উৎকট প্রতিক্রিয়ায় মানব-মনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অশান্তি, দুর্নীতি সমাজকে করেছে ব্যাধিগ্রস্ত এবং মেরুদণ্ডহীন। সুযোগ বুঝে চোরাকারবারীর দল জাল বিস্তার করেছে এবং স্বার্থগৃধ্নু নেতৃত্বের চাপে সমাজ হয়েছে আদর্শচ্যুত। সরকারী মদতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দেশে দুর্ভিক্ষ তৈরী করেছে স্বার্থান্বেষী মানুষ। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা কাটতে না কাটতেই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলশ্রুতি স্বরূপ দুই জাতিতত্ত্বের স্বীকৃতির চূড়ান্ত পরিণাম দেশবিভাগ — ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতবর্ষ রাষ্ট্র এবং ইস্‌লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টি। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের এই দেশবিভাগ ভারতবর্ষে — বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলা ও পাঞ্জাবে, বাস্তুহারা মানুষদের এক ভয়াবহ সমস্যার জন্ম দিল। পরবর্তী কয়েক বৎসরে আমরা দেখলাম পশ্চিম বাংলায় ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষদের ভীড় । লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন অবক্ষয়ের পথে, অপচয়ের পথে ক্রমাগত নেমে যেতে লাগলো — সরকার কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে উদ্বাস্তু সমস্যা মেটাতে পারলো না। নৈতিক মানের বিশেষ অবনতি ঘটলো। তাছাড়া সুযোগ বুঝে দেশীয় শিল্পপতিগণ নিজেদের মুনাফার লোভে শ্রমিকদের উপর নানা জুলুম অত্যাচার শুরু করলো। ফলে শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ধর্মঘট ও নানা আন্দোলনের পথে গেল। দেশে ক্রমাগত বেকার মানুষের ভীড় বাড়তে লাগলো।

এরই পাশে অভিজাত সম্প্রদায় ও যুদ্ধের সুযোগে হঠাৎ বড়লোকদের জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল জীবনযাত্রা চরম বৈপরীত্যের সৃষ্টি করলো। সামগ্রিকভাবে সমাজের নীচুতলার মানুষের নিরানন্দময় নৈরাশ্যপীড়িত জীবনচর্যা, রাজনৈতিক অসাধুতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে এক দুঃসহ অবর্ণনীয় শোচনীয় পরিস্থিতিতে পৌঁছে দিয়েছিল। সুতরাং মানুষ মানবিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুর রক্তাক্ত রূপ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ আর সমাজের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারেনি। বরং সঙ্কটময় পরিস্থিতির চাপে পড়ে তারা প্রতিবাদ করতে শিখেছে। সমাজে সভ্যতার নামে যে বর্বরতার কারবার চলেছে, তা মানুষকে তীক্ষ্ণ বাস্তববাদী করে তুলেছে। মানুষ একাধারে ভীত, বিস্মিত, জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছে মহাযুদ্ধের তরঙ্গাভিঘাতে। ডারউইনের বিবর্তনবাদকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাণীর আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে মানব-সমাজে কেবলমাত্র জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার প্রচেষ্টায় । ফলে স্বার্থে স্বার্থে লেগেছে সংঘাত; হিংসা - কলহ - হত্যায় কলঙ্কিত হয়েছে মানব সমাজ ও সভ্যতা। জীবনের প্রতি মানুষের সরল সহজ দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়েছে ব্যঙ্গ - কুটিল কটাক্ষে। দিশাহারা মানুষের আদিম স্বার্থপরতা সমাজের সুশৃঙ্খল, শোভন, মার্জিত রূপকে করেছে বিপর্যস্ত। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় তখন ''একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাগজি মুদ্রায় ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার - সারা বাংলা জুড়ে নিরন্ন বিবস্ত্র নরনারীর গগনভেদী হাহাকার, আর তারই বুকে বসে মুনাফা-শিকারী মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টাহসি''।[৪] ফলে সমাজে ফুটে উঠেছে সুস্পষ্ট দুটি শ্রেণী –

১) শোষক ও অত্যাচারী এবং ২) শোষিত ও অত্যাচারিত। একশ্রেণী ক্ষমতালোভী, অর্থশালী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভেকধারী; অপর শ্রেণী দরিদ্র , দিশাহারা, সংশয়ী ও অসহায়। এই স্পষ্ট ভেদরেখাই কার্ল মার্কস্ – কথিত সাম্যবাদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলেছে। ফলে জন্ম নিয়েছে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ। ভাববাদী মানুষ বস্তুবাদী ও বুদ্ধিবাদী হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন মননের চর্চা বেড়েছে, তেমনি অপরদিকে মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে অস্বীকার করতে চেয়েছে – দেখা দিয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

দেশে ক্রমাগত উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকায় বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনযুদ্ধ প্রবলতর হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে নানা ধরণের সামাজিক সমস্যা। জনজীবনে দেখা দিয়েছে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, নিষ্ঠুরতা ও পলায়নী মনোবৃত্তি। অর্থের প্রয়োজনে মানুষ গ্রাম, ভূ-সম্পত্তি, যৌথ-পরিবার ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হতে চেয়েছে। তাই গড়ে উঠেছে শহরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা, গতিময় জীবনপ্রবাহ ও নতুন ধরণের সমস্যার শরিক হয়েছে গ্রাম - ছেড়ে আসা মানুষ।

নতুন এই সমাজে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা যৌন কৌতুহলকে বিজ্ঞান-সম্মত আশ্রয় দান করায় সমাজে নিষিদ্ধচারণা বেড়েছে। এভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুকে বড় আঘাত লাগায় আশঙ্কা-কাতর জনগণের একটি বড় অংশ ইতিহাস আশ্রয়ী হয়েছে - - ধ্বংসমুখী সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। স্খলন-পতন, গ্লানি, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণায় আকীর্ণ সমাজে জন্ম নিয়েছে জড়বাদী ও ক্ষণবাদী জীবন-দর্শন। আহত মানুষ স্থিতিশীলতায় আস্থা হারিয়েছে; প্রেমের শান্তি ও চিরন্তনতায় বিশ্বাস রাখতে না পেরে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ক্ষণিক সুখ পেতে চেষ্টা করেছে। ফলে সমাজে শালীনতাহীনতা এসেছে।

বস্তুত, এই সময়ের পৃথিবীর চেহারাটাই হয়ে উঠেছে ব্যবসায়িক। মানুষই মানুষকে শোষণ করছে – প্রকৃতি বা পশু নয়, মানুষই মানুষের শত্রু। আদিম জীবনের সত্যবোধ ও সরলতা এখানে অনুপস্থিত – চারদিকে কেবল অন্ধকার, বিবর্ণতা ও জটিলতা।

বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার শক্তি জনগণকে কেবলই দুর্বল ও অসহায় করেছে – তারই ছায়া পড়েছে সমাজে। এ যুগের ব্যবসায়িক প্রবৃত্তি পৃথিবীকে চুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে। শোষক গোষ্ঠী অন্যের নির্বুদ্ধিতাকে নিজেদের নগ্ন স্বার্থের কাজে লাগিয়েছে; নিঃশেষিত ভঙ্গুর সমাজে এই অত্যাচার ও ধ্বংসের অংশীদার হয়েছে সকলে। বিশ শতকের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি ক্রোধ, বিদ্রূপ ও ঘৃণার সঞ্চার করেছে জন-মানসে।

উগ্র আধুনিকতার মোহে একদল মানুষ প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবহেলা ও অস্বীকার করতে চেয়েছে। তাদের এই প্রচেষ্টাকে সহ্য করতে না পেরে এবং প্রগতির নামে ঐতিহ্য - বিমুখতা, মনুষ্যত্বের অবমাননাকে দেখতে না পেরে আর একদল মানুষ পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য ও রক্ষণশীলতার অচলায়তনকে আঁকড়ে ধরেছে। অর্থাৎ দু'দলই নতুন ও পুরাতনের মূল্যবোধের মধ্যে সেতু-বন্ধন না করে নিজেদের বিশ্বাসের জগতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে। তাই এই যুগ ও সমাজকে বিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণ বলা চলে।

দু'টি মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি মানুষের মনে মৃত্যু-সম্পর্কিত ধারণাকেও বদলে দিয়েছে। পিষ্ট, ক্লিষ্ট, যন্ত্রণা-জর্জরিত মানুষ বীভৎস, বিকৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে এবং পরলোকে বিশ্বাস হারিয়েছে। ফলে ক্ষণিক জীবনের ইন্দ্রিয়বেদ্য উপভোগের ঝোঁক দেখা দিয়েছে। জীবনের প্রতি স্বাভাবিক সহজ দৃষ্টিভঙ্গি আর বজায় থাকেনি - তা হয়ে উঠেছে বক্র ও নেতিবাচক।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই সময় "জীবন হয়েছে তুবড়ির আগুনের ফোয়ারার মুখে ফুলকির মত। মুহূর্তের জন্য ঝকমকিয়ে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে।"[৫]

কিন্তু এ যুগের সব কিছুই খারাপ নয়। নতুন জোয়ারের সবটুকুই কখনো ভালো না হলেও, এই জোয়ারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। মহাযুদ্ধের এই প্রচণ্ড আঘাত যেমন মানুষকে সংশয়ী, অবিশ্বাসী, অভাবী ও যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে, তেমনি তার ফলে মানুষ জড়বৎ অবস্থা থেকে জেগে উঠেছে। তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদ। ক্রমাগত সমাজের অশুভ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তারা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে — এসেছে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী, এসেছে সংস্কারমুক্ত মনের উদার প্রসারতা — বদ্ধ সমাজের দরজা গেছে খুলে। ময়লা ঢুকেছে যত, আলোও ঢুকেছে তত। সমস্যাকীর্ণ মানুষ সমস্যার মোকাবিলা করতে করতে ভয় কাটিয়ে উঠেছে — জেগে উঠেছে পুরুষকার।

সমকালীন বিশ্বের সঙ্কটময় পরিবেশে একা কোনও দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, — এই বোধ সমাজের মানুষের মনে এনেছে আন্তর্জাতিক চেতনা। ঈশ্বরের বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে আত্মশক্তি পরীক্ষায় আগ্রহী হয়েছে। এতদিন ধর্ম ও ঈশ্বরের নাম করে ভণ্ড, সুযোগ-সন্ধানী মানুষের দল যেসব সুবিধা নিচ্ছিল, মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। যোগ্যতার দ্বারাই যে পুরুষকার অর্জিত হয়, — এ সত্য তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। মার্কসবাদের প্রভাবে তারা আপন অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। তাদের জীবন থেকে অলৌকিকতা এবং অন্ধ কুসংস্কার অনেকটা বর্জিত হয়েছে। ফ্রয়েডীয় চেতনার আলোকে যৌন-কামনা পাপবোধ মুক্ত হয়ে একটি সুস্থ প্রাকৃতিক সত্য হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে যৌন - কৌতুহল বাড়লেও যৌন-বিকৃতি ও গোপন যৌন-কামনা কমেছে। অকারণ সঙ্কোচ ঝরে গিয়ে জীবন হয়েছে সহজ।

আমাদের দেশে বর্তমানের যুগ-সঙ্কটকে ভুলতে মানুষ আশ্রয় করেছে ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যকে। তাই পুরাণ ও প্রাচীন সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে সমাজে। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দীপ্ত ভাষণ, স্বদেশী আন্দোলন অনুপ্রাণিত করেছে সমাজকে। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ বাস্তব-সচেতন হয়ে বৃটিশ শাসনের নাগপাশ মুক্ত হওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে — স্বাদেশিক চেতনা ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ তাদের দাবী আদায়ের জন্য লড়তে শিখেয়েছে। তাছাড়া জাতিভেদ ও বর্ণভেদে কন্টকিত সমাজ ব্যবস্থায় নানা অত্যাচারের শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ অন্যায়কে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেনি। এই অমানবিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তারা এগিয়ে এসেছে। সর্বোপরি, বিশ্বব্যাপী শোষণের অংশীদার হয়ে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় সমাজ তার গণ্ডী ছাড়িয়ে হয়েছে সুদূর প্রসারিত। প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতিকে ভাঙ্গবার মত মানসিক শক্তিও এ যুগের নতুন মানুষের দল আহরণ করেছে; তারা ভাঙ্গতে পেরেছে বলেই গড়ার ক্ষেত্র তৈরী করতে পেরেছে।

অর্থনৈতিক —

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার তার প্রধান উপনিবেশ ভারতের উপর অধিকাংশ সামরিক ব্যয়ভার চাপানোর ফলে এ দেশের অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বস্তুত, বৃটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়। যুদ্ধকালীন বিশ্ব - অর্থনীতির অব্যবস্থার জন্য ভারতবর্ষের পাট, তুলা, তৈলবীজ ও অন্যান্য শিল্পলগ্ন ফসল রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষকগণ। তার উপর জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কৃষকদের তীব্র শোষণ করে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। ফলে কৃষির উপর চাপ বাড়ে ; জমির উপর মানুষের নির্ভরতা যেমন বাড়ে, জমি খণ্ডীকরণের মাত্রাও তত বাড়ে। ফলে চাষযোগ্য জমির আকৃতি ক্রমশ হ্রাস পায়। তাতে উৎপাদনের পরিমাণ কমে। এদিকে জমির করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তারই ফলস্বরূপ নানা স্থানে কৃষক আন্দোলন দেখা দেয় — বারদৌলিতে কৃষক আন্দোলনের ফলে খাজনার হার হ্রাস পায়।

কিন্তু এই সময়ে মহাজনদের শোষণ তীব্রতর হয়। গ্রামীণ ঋণের হার অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯১১ থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাজনদের কাছে কৃষকদের ঋণ দ্বিগুণিত হয়ে ৬০০ কেটি টাকায় পৌছয়। বন্ধক বা বিক্রয়ের ফলে বহু কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। অপরদিকে জমিদার ও মহাজনেরা ফুলে ফেঁপে ওঠে — ভূমিহীন কৃষকের দল ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়।

১৯১৮ - ১৯১৯ এবং ১৯২০ - ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দু'বার ফসল হানির ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এদিকে উৎপাদনে ঘাটতি হলেও শস্য রপ্তানি পূর্ববৎ থাকায় দেশে ব্যাপক অভাব - অনটন ও দুর্মূল্য দেখা দেয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতির ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে প্রবল সঙ্কট নেমে আসে। ঋণভারে জর্জরিত কৃষকরা জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এরই ফলশ্রুতি দেখা যায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের বাংলার দুর্ভিক্ষে। কৃষকরাই মূলত এই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নারায়ণবাবু বলেছেন — "বাবা গ্রামাঞ্চলে খাজনা আদায়

করতে গেছেন, আমিও সঙ্গে গেছি, দেখেছি, খাজনা আদায় দূরে থাক বুভুক্ষু কৃষককে শেষে চাল দিয়ে বিদায় করতে হয়েছে। .....নিজের চোখে না দেখলে জানতেও পারতাম না সোনার বাংলার আসল চেহারাটা কি।'[৬]

কৃষকদের পরই কারিগর সম্প্রদায় মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছু কারুকর্ম ও কুটীর শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় লক্ষ লক্ষ কারিগর, ক্ষুদ্র উৎপাদক ও সাধারণ ব্যবসায়ীর আয় অনেক কমে গিয়েছিল। "শ্রমবাজারে লক্ষ লক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত কারিগরদের আবির্ভাব শিল্প-প্রলেতারিয়েতের অবস্থার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, ক্রমাগত দরবৃদ্ধির ফলে তাদের মজুরির মূল্যহানি ঘটেছিল।"[৭]

আসলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে প্রকৃত শিল্পায়ণের পক্ষপাতী ছিল না। ভারতের শিল্পায়ণ বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকাতে এই শিল্পায়ণের গতি ছিল ধীর এবং তুলা, পাট, কয়লা, চা — এই চারটি ক্ষেত্রেই বস্তুত শিল্পের বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আমদানি হ্রাস পায়, এদিকে যুদ্ধের চাহিদা পূর্ণ করতে গিয়ে এই শিল্পায়ণের গতি আরও মন্দীভূত হয়। বৃটেনের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের অসম প্রতিযোগিতায় ভারত সহজেই পরাজিত হয়। শুল্কনীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্পপতিরা বঞ্চিত হয়। এছাড়া ১৯২৯ থেকে ৩৩ খৃঃ পর্যন্ত অর্থনৈতিক মন্দার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়, জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ফলে ভারতীয় বাজারে মন্দা দেখা দেয় ও দেশী শিল্পের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ক্রমে ভারতের মজুত স্বর্ণভাণ্ডারে টান পড়ে এবং শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়।

অবশ্য বড় বড় প্রধান শিল্পগুলির অগ্রগতির ধারা প্রথম থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ভারত স্বনির্ভরতা অর্জন করে। এই সময় ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রচুর প্রসারিত হয়।

১৯৪৪ খৃঃ নাগাদ ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলির অধিকাংশ ভারতীয় পুঁজির আওতায় আসে। ছোট শিল্পাসংস্থাগুলিতে ভারতীয় পুঁজির প্রাধান্য হয় সর্বাত্মক। ফলে ভারতের অর্থনীতিতে পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের প্রয়োজনে নতুন শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যুদ্ধ – সরবরাহের চাহিদা পূরণের জন্য শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমান শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হওয়ায় মুনাফার পরিমাণও বেড়ে যায়।

দেশের স্বাধীনতার ঠিক আগেই ভারতের শিল্পপতিগণ বৃটিশ কোম্পানিগুলিকে অনেকাংশে নিজেদের আয়ত্তে আনেন এবং বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগস্থাপন করেন। বৃটিশ ও ভারতের শিল্পপতিদের পুঁজি লগ্নির পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে ওঠায়, ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দ্রুত প্রসারিত হয়। দেশীয় পুঁজির বিকাশ ঘটার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতের ক্ষেত্রেও লগ্নীকৃত ভারতীয় অর্থের পরিমাণ ১৯৪৩ খৃঃ বৃটিশ আমানতকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতে শিল্পের প্রসার হলেও ভারতীয় অর্থনীতির মূল কাঠামোগত পরিবর্তন হয় নি। কারণ, চাহিদার তুলনায় শিল্পের বিকাশ ছিল নগণ্য এবং ভারতীয় জনগণের মাত্র দুই শতাংশ শিল্প অর্থনীতির আওতার মধ্যে ছিল। বস্তুত, সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি, কৃষকদের অপরিসীম দারিদ্র্য, ভারতের পুঁজিপতিদের মূলধনের অভাব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের শিল্পোন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করে।

এই সময়ে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খুব করুণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সামান্য মজুরিতে তাদের কাজ করতে হয়েছে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিরাপত্তাহীনভাবে বাস করতে হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও তাদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটেনি; ফলে তারা কৃষকদের মত ঋণভারে জর্জরিত হয়েছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের কারখানা আইন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের খনি আইন ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মজুরি আইন ইত্যাদির দ্বারা শ্রমিকদের কষ্ট লাঘবের সরকারী প্রয়াস চালানো হলেও তা বাস্তবে তেমন কার্যকরী হয়নি। ফলে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকগণ প্রচুর ধর্মঘটের মাধ্যমে আন্দোলনে নেমেছে। এইভাবে ভারতীয় অর্থনীতিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময় কৃষক, কারিগর - সকলেই অভাবে ও কষ্টে দিন কাটিয়েছে। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কালোবাজারী অসৎ ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে উঠেছে ও কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছে। পরের দিকে ভারতের পুঁজিপতিরা সাফল্যের মুখ দেখলেও তা সমগ্র ভারত ও ভারতবাসীর তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বস্তুত, ভারতের অর্থনীতির মূল কাঠামোর কোনও পরিবর্তনই হয়নি। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে সুস্পষ্ট দু'টি শ্রেণী দেখা গেল — শোষক ও শোষিত। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিজীবী, শ্রমিক ও কারিগর। ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের সংখ্যা নগণ্য। এছাড়া বৃটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তো ছিলই। সুতরাং ভারতের খুব কম মানুষের হাতেই অর্থপ্রাচুর্য ছিল। মূলত জনগণের সুবৃহৎ অংশ ছিল শোষণ ও বঞ্চনার শিকার।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতার দিকে পদক্ষেপকারী ভারতবর্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে অর্থনীতিতে প্রথম সাফল্যের

মুখ দেখেছিল এবং দেশীয় পুঁজিপতিগণ ক্রমশ বৃটিশ পুঁজিপতিদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছিল। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এইসময়ে অর্থনীতির মূল কাঠামো পরিবর্তিত না হলেও, অর্থনীতির গতি - প্রকৃতি যে পরিবর্তিত হয়েছিল তা স্বীকার করতেই হবে।

ধর্মীয় —

সত্যকে ধারণ করাই ধর্ম এবং ভারতের ধর্মের মূল কথা হলো সংযম। বিংশ শতকের মানুষ ধর্মের এই দু'টি মূল কথা ভুলে মিথ্যে নকল-নবিশীতে ধর্মকে চাপা দিয়েছিল, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার বস্তু-চাহিদার অনুকরণে মেতে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিল। এযুগের ধর্ম ছিল সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ। তাই ধর্মরক্ষার অর্থ গিয়ে ঠেকেছিল গণ্ডী রক্ষায়। প্রাচীনকালে ধর্ম ছিল জীবনের অঙ্গ, কিন্তু এ সময়ে ধর্মকে স্থাপন করা হয়েছিল জীবন থেকে অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, আমাদের দেশে এই সময়ে যে ধর্মের বাঁধাবাঁধি মেনে চলতে হয়েছে, তা কেবল ফাঁকি। তাই এতে আমাদের দেশের ধর্মের মুক্তির আদর্শ তো গেছেই, য়ুরোপের স্বাধীনতার আদর্শেও বাধা পড়েছে। এতে সাত্ত্বিকতার পূর্ণতা নেই, আছে কেবল তামসিকতার বোঝা। তাই এই ধর্ম, "মানুষকে কেবল আচার-বিচারে আটে-ঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ"।[৮]

বস্তুত, এ যুগে সমাজনীতি যত কঠিন হয়েছে, ধর্মনীতি তত শিথিল হয়েছে এবং ধর্মের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর যত বেড়েছে, ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতাও তত বেড়েছে। প্রত্যহ রাগ-দ্বেষ, লোভ-মোহ ও মিথ্যাচারণের দ্বারা ধর্মের ভিতকে দুর্বল করা হয়েছে। ক্ষমতালোভী ও সুযোগসন্ধানী বৃটিশ শাসকও আপন অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এ ব্যাপারে মদত যুগিয়েছে। ভারতের অতীত ঐতিহ্য — সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা ভুলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়ে দেশকে দুর্বল করে তোলে।

হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনকে যুক্ত করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অনেকটা ফলবতী হলেও মালাবার অঞ্চলে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। সর্বোপরি, তুরস্কে খলিফাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের অবসান ঘটায় আন্দোলনটির সাম্প্রদায়িক চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। বস্তুত এই খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল সাম্প্রদায়িক তথা ধর্মীয় কারণে।

অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের প্রত্যাহারে দেশে আকস্মিক নৈরাশ্য ও শূন্যতার সৃষ্টি হলে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দেয় — ধর্মে ধর্মে লাগে সংঘাত। ক্রমে আর্যদের 'শুদ্ধি', 'সংগঠন' আন্দোলন ও মুসলমানদের 'তাঞ্জিম', 'তবলিস' আন্দোলন পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। ফলে ১৯২৩ - ১৯২৬ সালের মধ্যে ভারতে ৭২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।

'বাংলা চুক্তি'তে মুসলমানদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলে, 'কর্মী' নামক হিন্দু সন্ত্রাস গোষ্ঠী চাপ সৃষ্টি করে ঐ চুক্তিটি বাতিল করে। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ মুসলিমদের স্বার্থে 'চোদ্দ দফা দাবি' পেশ করেন ও মহম্মদ ইকবাল প্রথম ইসলাম ভিত্তিক নতুন পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনকে 'হিন্দু আন্দোলন' আখ্যা দিয়ে মুসলমানরা বর্জন করে। ১৯৩২ সালে আইন সভায় মুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার তাদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিলে এই বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ আরও প্রশস্ত হয় এবং এই ধর্মীয় ভেদ-নীতির সুযোগে বৃটিশ সরকার পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ভারতকে ঠেলে দেয়।

অবশ্য গান্ধীজী, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখরা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের যে প্রয়াস চালান, তা চির-স্মরণীয়।

সাহিত্যিক পটভূমি —

এই শতকের আগে অবধি সাহিত্য ছিল জীবনের প্রতি সদর্থক দৃষ্টি সম্পন্ন। এর প্রধান তিনটি উপকরণ -- মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর ছিল পরস্পরের সহায়ক সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু বিংশ শতকে এসে মানুষের এই সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যের উপকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক গেছে বদলে। ঈশ্বর ও শুভবুদ্ধির উপর আস্থা গেছে টলে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের থেকে দৃষ্টি সরে এসেছে প্রকৃতির আদিম হিংস্রতায়।

বস্তুত, মহাযুদ্ধের বীভৎসতা এ সময় মানুষকে সচেতন করেছে জীবনের অসুন্দর দিকটি সম্পর্কে। যুক্তিবাদী মন হয়ে উঠেছে অনুসন্ধিৎসু। সমাজের ক্লেদাক্ত জটিলতা আরোপিত হয়েছে চরিত্রে। শোষণের সমমর্মিতায় এসেছে আন্তর্জাতিকতা ও সাম্যবাদের প্রেরণা। আধুনিক মনন ও জীবন জন্ম দিয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের। আর এ সবেরই ছায়া পড়েছে সাহিত্যে। ক্রমে রবীন্দ্র-ভাবধারা থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়েছে সাহিত্য-চেতনা। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হয়ে পরবর্তী সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছেন নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এসময়কার সাহিত্যতে পরাধীন ভারতের দেশপ্রেমই মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। এই প্রসঙ্গে নারায়ণবাবু বলেছেন - 'আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ..... পড়ছি

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', নজরুলের কবিতা, বাজেয়াপ্ত 'দেশের ডাক', 'ফাঁসির সত্যেন', আমাদের হাতে ঘুরছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সব হারাদের গান', বিমল সেনের 'ফুলঝুরি', প্রেরণা দিচ্ছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'বেণু' পত্রিকা, কানে বাজছে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আশ্চর্য পংক্তিগুলো ঃ

দারুণ দেবতার ডাক যে পেলো তার
আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।' '[৯]

এতদিন সাহিত্যে মৃত্যু ও দুঃখকে গভীর, সুন্দর এবং মানুষের উত্তরণের পর্যায় বলে মনে করা হত। আধুনিক সাহিত্যিকরা এই দুঃখবাদী দর্শনকে বর্জন করলেন। ক্ষণিক সুখের মোহে, ভঙ্গুর জীবন-ধারণের তীব্র বাসনায় ভরে উঠল সাহিত্য-রসের পেয়ালা। বস্তুবাদী সাহিত্যিকরা নিতান্ত আটপৌরে, সাধারণ তুচ্ছতাকে সাহিত্যের বিষয়ে পরিণত করলেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের চেতনা সাহিত্যে ব্যক্তিগত আশা-আকঙ্খাকে প্রতিফলিত করল দৈনন্দিন জীবনের সামান্যতায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিন্দুতে সিন্ধু নয়, ছোটকে তার নিজস্ব ক্ষুদ্র রূপে দেখেই তার মূল্য দিলেন সাহিত্যিকরা।

এতকাল সাহিত্যে প্রচলিত অমার্জিত শব্দের ব্যবহার হত না। এবার শোভন, কোমল, মার্জিত শব্দের স্থান গ্রহণ করল এইসব জীবন-ঘনিষ্ঠ শব্দ। 'পচা', 'বেড়াল', 'শকুন', 'ঠ্যাং', ইত্যাদি অকুলীন শব্দকে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, জীবনানন্দ দাস 'ভূত', 'ইঁদুর', 'পেঁচা', 'ব্যাং', 'মশা', 'মাছি', 'বুড়ি',[১০] 'শুয়োরের মাংস',[১১] 'নষ্ট', 'পচা'[১২] ইত্যাদি যেসব শব্দের ব্যবহার করেছেন, তার উল্লেখ করা চলে।

আধুনিক সাহিত্যের রচনা-রীতির অভিনবত্ব মূলত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে কেন্দ্র করেই এল। রবীন্দ্র-বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক সাহিত্যিকরা সাহিত্যের আবেদন জানালেন পাঠকের হৃদয়ের প্রতি নয়, বুদ্ধি-বৃত্তির প্রতি। তাই আধুনিক সাহিত্য হয়ে উঠল কিছুটা দুরূহ ও দুর্বোধ্য। এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের নাম স্মরণীয়।

বিংশ শতকের সংশয়, সমস্যা, জটিলতা স্থান পেল ছোটগল্পে। অর্থনৈতিক মন্দার স্বরূপ হল উদ্ঘাটিত। দিশাহারা মানুষের ক্রন্দন সাহিত্যের মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করল। এ যুগের জীবনের দ্বিধা, সংশয়, স্ববিরোধ, সংঘাত সঞ্চারিত হল সাহিত্যে। কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী চেতনায় সাড়া দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ। শোষিত পৃথিবীর সাম্যবাদী চেতনা আধুনিক সাহিত্যে আনল আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি। ফ্রয়েডের যৌন-চেতনা তুফান তুলল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সন্তোষ কুমার ঘোষ প্রমুখের লেখায়। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা', সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা', মহেন্দ্র রায়ের 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' প্রভৃতি লেখাগুলি উল্লেখযোগ্য।

অনুষঙ্গ প্রয়োগে আধুনিক সাহিত্যিকরা দক্ষতা দেখিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনুষঙ্গ এনেছেন ইতিহাস থেকে, বিষ্ণুদে এনেছেন সঙ্গীত-জগত থেকে। আবার আধুনিক কবিরা অন্বয়কে অস্বীকার করে বাক্যরচনা করেছেন। যেমন, জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন 'হে নীল কস্তুরী আভা চাঁদ'[১৩] এরকম দূরান্বয় বিষ্ণুদে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও পাওয়া যায়। সিদ্ধরসকে চূর্ণ করার প্রবণতাও দেখা যায় এই সময়ের সাহিত্যকর্মে। 'হেথা নয়, হেথা নয়, - অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র এই পংক্তিটিকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক কবিতাতে ভিন্ন তাৎপর্যে বাবহার করেছেন।[১৪] উপমা ও চিত্রকল্প এবং প্রতীকের ব্যবহার এই সময় এনেছে ইন্দ্রিয় ঘনত্ব ও সুদূর প্রসারী ব্যঞ্জনা। এসবক্ষেত্রে আকারগত সাদৃশ্যের পরিবর্তে মনোগত ও ভাবগত সাদৃশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ' পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'[১৫]। এমনকি সাহিত্যের কাঠামোর ওপর আকারগত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে এ যুগে। ঘটনা-বিহীন গল্পেরও নজির মেলে তাই এ সময়। প্রসঙ্গত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বন্ধন', বুদ্ধদেব বসুর 'রোদ' প্রভৃতির কথা বলা চলে।

পূর্বপুরুষ ও পূর্ব ঐতিহ্য সম্বন্ধে নূতনদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা, এবং নূতনদের সম্পর্কে পুরাতনদের হৃদয়ের দ্বিধা, ভীতি ও দুর্বোধ্যতা এ সবই স্থান করে নিয়েছে এ কালের ছোটগল্পগুলিতে। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব জীবন্ত রূপ ধরেছে সাহিত্যের পাতায়।

এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং বলেছেন 'Traditional অতীত এবং Radical বর্তমানের মধ্যে যে মার্জনাহীন নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলেছে, তার মধ্যে যেমন কোনো মধ্যপন্থা অচল, তেমনি কোনো মধ্যপন্থী মনোবৃত্তিও সমান নিন্দিত। এই দুটি বস্তু এখন এমন একটি ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে যে এদের আভ্যান্তরীণ বিরোধটুকু কোনোক্রমেই ভরাট করা চলেনা। .... তাই একদল মানুষ যখন প্রভাবজাত রক্ষণশীলতা ও যুগধর্মের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে চিরদিনের সঞ্চয়কে দুর্বল বাহুপাশে মরণ আলিঙ্গনে-আঁকড়ে ধরতে চায়, আর একদল তখন যুগান্তরের পিরামিডকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার যুগার্জিত শীতল অন্ধকারের মাঝখানে

বয়ে আনতে চায় নবীন সূর্যের আলো'।'[১৬] ফলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাহিত্যে ব্যক্তি বিশেষের নয়, এসেছে গোষ্ঠীবদ্ধতার যুগ; 'প্রগতি' (১৯২৭), 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালি - কলম' (১৯২৬), 'সংহতি' (১৯২৪), 'উত্তরা' (১৯২৫), 'বিচিত্রা' (১৯২৭), প্রভৃতি পত্র - পত্রিকার যুগ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই যুগের নাম দিয়েছেন 'কল্লোলযুগ'।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপায়ণে এসেছে নতুনত্ব, বিদেশের নব-সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাবে সাহিত্যে জন্ম নিয়েছে অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন বাচনভঙ্গি। বক্র চারুত্ব এসেছে ভাষায়। উদ্ধত যৌবনের সফেন উদ্দামতা ঢেউ তুলেছে 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে। শৈলজানন্দের ভাষায় 'আজকের দিনে যত নতুন লেখক স্তব্ধ হয়ে আছে সবাইর ভাষা ঐ কল্লোল'[১৭]। কিন্তু কল্লোল - যুগের সাহিত্যে আছে কেবল ভাঙার কথা, — গড়ার কথা নেই। দ্বিমুখী মানসিকতা আছে এ যুগের সাহিত্যে — আশা ও নিরাশা এবং বিদ্রোহী যুক্তিবাদ ও ভাবালুতা, কল্লোলীয় লেখকদের বয়সোচিত চাপল্যের সঙ্গে মিশে আছে দুঃসাহসিকতা ও খাম-খেয়ালীপণা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা 'কল্লোলে' লিখেছেন। 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'র বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছে সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'। 'কল্লোলে'র চিরযৌবন অবশ্য স্থায়ী হয়েছে মাত্র সাতবছর। 'কালিকলম', 'প্রগতি'ও স্বল্পায়ু। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই পত্র-পত্রিকাগুলি ঘটিয়ে গেছে বিপ্লব। তারই প্রভাব দেখা যায় পরবর্তী সাহিত্যক্ষেত্রে।

পরিশেষে এ যুগের সাহিত্য সম্পর্কে নারায়ণবাবুর অভিমত জানাই। তিনি বলেছেন, 'বাংলা ছোটগল্পে আজ বিশ্ব সাহিত্যের সব লক্ষণগুলিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহতী বিনষ্টের পাশে পাশে মহতী প্রাণের উদ্বোধন বাংলা গল্পে আজকে সমানেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধির নৈরাজ্যে পাক খেয়ে বেড়ানো আজ্যো অনেকের কাছে লোভনীয়। ফ্রয়েডের চোরা লণ্ঠন হাতে মনের অলিগলিতে সাপের গর্ত্ত খুঁজে ফেরা আজো অনেকের বিলাস .... কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতেই পারেনা। ছোট বড়ো লেখকদের সমাজ-সচেতন জীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টি প্রতিদিন প্রমাণ করছে যে কঙ্কালের মালা গাঁথা আমাদের নয় নতুন সমাজের পলিমাটিতে নবতর প্রাণের ফসল কাটাবার জন্যেই আমরা এগিয়ে চলেছি।'[১৮]

উৎসপঞ্জী

১। স্ট্যাটুটরি কমিশনের রিপোর্ট, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ১০৬ ঃ (প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ 'আধুনিক ভারত' ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৮৪, থেকে সংগৃহীত)

২। সুচিত্রা সেনচন্দ্র ঃ 'সময়ের দর্পণ' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি (মাঘ চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৮)

৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ঃ 'দেশ' (২০শে পৌষ, ১৯৬৯) পৃঃ ৮৯৫

৪। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর মুখবন্ধ, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১; পৃঃ ৭

৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'নিশিপদ্ম' দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রাবণ, ১৮৯, পৃঃ ২

৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ঃ 'দেশ' (২০শে পৌষ, ১৯৬৯) পৃঃ ৮৯৫

৭। আন্তোনোভা, বোন্‌গার্দ লেভিন, কতোভ্‌স্কি ঃ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রঃ প্রঃ ১৯৮২, পৃঃ ৫৩০

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'প্রাচীন ভারতের এক' ঃ রবীন্দ্র রচনাবলী ৭ম খণ্ড (বিশ্বভারতী, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৫) পৃঃ ৫০৭

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ঃ 'দেশ' (২০শে পৌষ, ১৯৬৯) পৃঃ ৮৯৫

১০। জীবনানন্দ দাশ ঃ 'আট বছর আগে একদিন' ঃ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা' প্রঃ প্রঃ ১৩৪৬, পৃঃ ৭৬

১১। জীবনানন্দ দাশ ঃ 'আদিম দেবতারা' ঃ ঐ পৃঃ ৮০

১২। জীবনানন্দ দাশ ঃ 'বোধ' ঃ ঐ পৃঃ ৭২

১৩। জীবনানন্দ দাশ ঃ 'অন্ধকার' ('বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)

১৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ 'রবীন্দ্রনাথ' ঃ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা' প্রঃ প্রঃ ১৩৪৬, পৃঃ ১৩৩

১৫। জীবনানন্দ দাস ঃ 'বনলতা সেন' ঐ

১৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্য ও আদর্শ' ঃ (প্রবন্ধটি কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপির আকারে প্রাপ্ত; রচনাকাল অজানা)

১৭। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ 'কল্লোল যুগ' প্রঃ প্রঃ ১৩৫৭, পৃঃ ৩৭

১৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ছোটগল্প এবং এ যুগ' ঃ তাপসরঞ্জন পাল সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'দাগ' (৮ম প্রকাশ, মহালয়া ১৩৭৩) পৃঃ ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সম - সাময়িক বাংলা ছোটগল্পকার

সাহিত্য কালের দর্পণ। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সম-সাময়িক ছোটগল্পকাররা একই যুগ-মানসের অধিকারী হওয়ায় তাঁদের লেখায় অনেক সময় একই সমস্যা-চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। তাছাড়া এ যুগ একক সাহিত্য প্রতিভার যুগ নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও গোষ্ঠীবদ্ধতার যুগ। তাই এ যুগের সাহিত্যিকরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং স্বভাবতই একে অন্যের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। তাই এ যুগের অন্যতম সাহিত্য প্রতিভা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে জানতে হলে তাঁর সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া এই আলোচনা থেকে সম-কালীন লেখকদের তুলায় নারায়ণবাবুর স্বাতন্ত্র্যও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম-সাময়িক লেখকদের মধ্যে আমি তাঁর অগ্রজ কিছু ছোটগল্পকারদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছি। কেননা, একই সময়ে গল্প লেখা শুরু না করলেও নারায়ণবাবু যখন গল্প লিখেছেন, তখনও এইসব অগ্রজ সাহিত্যিকরা গল্প রচনা করেছেন এবং সেইসূত্রে এঁদের সমকালীন গল্পকারদের আওতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, মন্বন্তর, বস্ত্র-সংকট, নারী-নির্যাতন, কালোবাজারী, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, পুরাতন ও নূতন ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব, সাম্যবাদ, ফ্রয়েড-সিগমণ্ড নির্দেশিত জটিল মনস্তত্ত্ব — এসবকে কেন্দ্র করে তৎকালীন লেখকদের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও গল্প লিখেছেন। মন্বন্তরের পটভূমিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'ভীড়', 'চাউল', প্রভৃতি গল্প, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'বোবা কান্না', 'পৌষ লক্ষ্মী', মনোজ বসু লিখেছেন 'মন্বন্তর', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন 'কালনাগ', 'হাড়', 'কাক', 'বস্ত্র'; প্রবোধ সান্যাল লিখেছেন 'অঙ্গার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা', 'নেড়ী', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন'; নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন 'আবরণ', 'রসাভাস', 'রূপান্তর', 'পুনশ্চ'; সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন 'ক্ষুধা' 'দুর্বোধ্য'; আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'হাড়','দুঃশাসন', 'কবর', 'নক্র চরিত' প্রভৃতি গল্প। মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত এসব গল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে কালোবাজারীর অন্ধকার, বস্ত্রসঙ্কট। আর কখনোবা সাম্যবাদের চেতনাও জেগে উঠেছে এসব গল্পের ছত্রে ছত্রে। জটিল মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে এ যুগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'ভূমিকম্প', 'সরীসৃপ', 'টিকটিকি'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'নারী ও নাগিনী', 'ডাইনী'; সুবোধ ঘোষ লিখেছেন 'গরল অমিয় ভেল', এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'জাগ্রতা', 'অমনোনীতা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'দুর্ঘটনা' প্রভৃতি গল্প।

পুরাতন ও নূতন যুগের ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'পিতা-পুত্র', 'জলসাঘর'; প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'অফুরন্ত', সুবোধ ঘোষ লিখেছেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ', পরশুরাম লিখেছেন 'রাতারাতি', 'বরনারী বরণ', 'আনন্দ বাঈ'; আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'মমি', ' সৈনিক', 'ভাঙা বন্দর'। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি দেখে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন 'মাষ্টারমশাই', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'ভাঙা চশমা'।

সমাজে নারী-নির্যাতন দেখে ব্যথিত হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'দিদি', সুবোধ ঘোষ লিখেছেন 'বারবধূ', 'পরশুরামের কুঠার'; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন 'কেয়ার কাঁটা', 'ইতি'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'এক্‌জিবিশন্‌', 'তিমিরাভিসার', 'কালো জল', ' শৈব্যা' প্রভৃতি গল্প।

সমাজে কেরানীদের করুণ অবস্থা দেখে চেকভ ও মোপাসাঁর মতো প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'শুধু কেরাণী', বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন 'একা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'হলদে খাম'।

কেবল বিষয়গত দিক দিয়েই নয়, সেকালে ছোটগল্পের রূপ-রীতি-আঙ্গিকের ওপর যেসব নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতেও নারায়ণবাবু যোগ দিয়েছেন। লাগেরভিস্ট, ওয়াইড্‌ম্যানের অনুসরণে শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বন্ধন' এবং বুদ্ধদেব বসু 'রোদ', 'জ্বর' প্রভৃতি ঘটনা-বিহীন গল্প লিখেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও 'কালপুরুষ', 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' 'তিতির' প্রভৃতি গল্পকে ঘটনা-বিহীনভাবে গড়ে তুলেছেন।

তবু যুগ-প্রভাবিত হয়েও তিনি যুগাতিক্রমী। কেননা, সমকালীন লেখকদের মতো নেতিবাচক নয়, তিনি ছিলেন জীবনের প্রতি ইতিবাচক প্রসন্ন দৃষ্টির অধিকারী। তাঁর আশাবাদী, স্বপ্নদর্শী মন ছিল সৌন্দর্যের পূজারী। সমকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে কুশ্রীতা ও নগ্নতার দিকে যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, তার থেকে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ মুক্ত। তদানীন্তন লেখকদের মতো তিনি দুঃখ বিমুখও নন। সুখ-দুঃখ সবকিছুকেই তিনি জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে মেনে নিয়েছেন। আসলে কল্লোলীয়দের মতো তিনি চরমপন্থী নন, মধ্যমপন্থী। তাই তাঁর সাহিত্য ক্ষণিকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়। বিশেষত, সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবকে জোর করে অস্বীকার করবার যে প্রবণতা ছিল, তার থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বরং রবি-প্রভাবকে সসম্মানে স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন - 'বহু ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম নিতে পেরেছি। তাঁর জীবন সাধনা আমার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে থাকুক।' [১]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনভাবেই তাঁর সম-সাময়িক না হলেও, তাঁর চিন্তায়-মননে-সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাব কিরূপে, কতখানি ছায়া বিস্তার করেছিল, তা অনুসন্ধান করে দেখলেই মনে হয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক সত্তার পূর্ণায়ত রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও মার্জিত রুচি, রোমান্টিক স্বপ্নময়তা ও মানব প্রীতির সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির মেলবন্ধন ঘটেছে। সমরেশ মজুমদারের ভাষায় 'শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি, রবীন্দ্রনাথের মার্জিত জীবনচর্যা, তারাশঙ্করের অলৌকিকতা নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব।'[২] তাই কল্লোলীয় অশ্লীলতা ও কুশ্রীতা নারায়ণবাবুর লেখনীকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই নেতিবাচক আত্মঘাতী সাহিত্যের যুগেও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিধর্মী। কেবল সাহিত্য-চেতনায় নয়, ভাষাতেও তাঁর রবীন্দ্র প্রভাব ছায়া বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই তাঁর ভাষা লাবণ্যময়, কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী। সমরেশ মজুমদারের মতে - 'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গদ্য ভাষাকে বিগলিত করে স্বকীয়তার শীলমোহর অঙ্কিত এক অনবদ্য সুন্দর ভাষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আয়ত্ত করেছিলেন।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের মতোই নারায়ণবাবুর সৌন্দর্য-চেতনা ও প্রকৃতি-চেতনা গল্পের পরিধিকে বহুদূর প্রসারিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো সুগভীর এবং অসীম ব্যঞ্জনাবাহী না হলেও এই দু'টি লক্ষণ-গভীরতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও আবিষ্কার – করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর গল্প ইঙ্গিতগর্ভ ও ব্যঞ্জনার অনুরণনে সমৃদ্ধ।

এছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর 'সাহিত্য-বিচিত্রা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথেরই একটি গল্পকে ('একরাত্রি') প্রামাণ্য উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং গল্পের কায়া-গঠনেও তাঁর রবীন্দ্র-প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

কিছু গল্প আলোচনা করলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের পরিচয় মিলবে বলে আশা করা যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে বংশ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। আবার অভিজাত বংশের ভাঙ্গনের ট্রাজেডি ও তার মিথ্যা অহমিকার কথা আছে তাঁর 'রাসমণির ছেলে', 'ঠার্কুদা', 'হৈমন্তী' প্রভৃতি গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে এই পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। এ বিষয়ে পূর্বেই গল্পগুলির নামোল্লেখ করে জানিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নামঞ্জুর' গল্পের অনিল অমিয়াকে বিবাহ করতে কৃতসঙ্কল্প। 'কিন্তু যেমন সে অমিয়ার হীন জন্মের ইতিহাস জানিল, – শুকাইয়া গেল তাহার প্রেম, সংস্কার ও রুচিতে বাধিল'।[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিমিরাভিসার' গল্পেও ডাক্তার রোগিনীর প্রেমমুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করার স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু তার প্রণয়িনীর হীন গণিকা বৃত্তির কথা জানতে পেরে এমনি করেই তারও প্রেম শুকিয়ে গেছে। উপরন্তু ঐ সমাজের শিকার অসহায়া মেয়েটিকে ভোগ করার বাসনা তার সংস্কার ও রুচির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি। এখানে পুরুষশাসিত সমাজের প্রতি নারায়ণবাবুর লেখনীর আঘাত তীব্রতর।

ভীতি, আর্কষণ ও রোমাঞ্চের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়ের লেখাতেই। উদাহরণ স্বরূপ রবি ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্পের; এবং নারায়ণবাবুর 'আলেয়ার রাত', 'হাড়', 'টোপ', 'জাগ্রতা' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা যায়। অবশ্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এইধরণের গল্পে বীভৎস রসই প্রধান হয়ে উঠেছে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ জাতীয় গল্পে ব্যঞ্জনার মূর্চ্ছনাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি রচনার পেছনে হামারগ্রেন নামক ভারতসেবী ইংরেজের কথা আছে, যার হিন্দুর মতো দাহ হবার অন্তিম ইচ্ছা ভারতবাসীর বিরোধিতায় পূর্ণ হয়নি।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি শত্রুর কাহিনী' নামক গল্পটির কথা। এ গল্পেও ভারতপ্রেমী বিদেশী যুবক হ্যান্‌সের বিরোধিতা করেছে ভারতবাসীই। তারা তাকে 'ভারতের শত্রু' বলে চিহ্নিত করেছে।

প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় 'ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস বা সন্ন্যাসীকে লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রুপই করিয়াছেন'।[৫] এ বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়', 'উদ্ধার', 'তপস্বিনী' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা যেতে পারে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছলনাময়ী' গল্পে এহেন হাস্যলঘু ব্যঙ্গের কৌতুকময় স্পর্শ থাকলেও তাঁর অধিকাংশ গল্পে ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি বিদ্রূপ নির্মম ও সুতীব্র। উদাহরণ স্বরূপ 'বীতংস' গল্পের সুন্দরলাল, 'নক্রচরিত'-এর বৈষ্ণবী তিলক কাটা নিশিকান্ত ইত্যাদি চরিত্রের উল্লেখ করা যায়।

এভাবে বিভিন্ন গল্প আলোচনা করে রবীন্দ্র-প্রভাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় যে ব্যাপকভাবে পড়েছে, সেকথা স্বীকার করে নিতে হয়। তবে সেই সঙ্গে একথাও মেনে নিতে হয় যে, নারায়ণবাবুর ছোটগল্পে সমকালের বোধ ও বিশ্লেষণ প্রচুর, যা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ততটা প্রকটিত নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে সমকালের বোধ প্রচুর থাকলেও তা বিশ্লেষিত হয়নি এবং গল্পগুলি সমকালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মহাকালের অসীমতায় পৌঁছেছে।

স্বদেশপ্রেম ও আদর্শবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নারায়ণবাবু লেখাতেও আছে, কিন্তু তা মার্কসবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি গল্পে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই পাখিটা', 'অমনোনীতা' প্রভৃতি গল্পেও এরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু এ মনস্তত্ত্ব অনেক জটিল এবং ফ্রয়েডিয় চিন্তাধারায় পুষ্ট। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নারায়ণবাবু ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় তাই তার্কিকতা আছে, বুদ্ধিমার্গের প্রয়োগ আছে। উপরন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর ক্ষণিকত্বের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় আছে, তাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকার করেছিলেন। বিশেষত সে যুগের ছোটগল্প সম্বন্ধে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। এ প্রসঙ্গে 'ছোটগল্প এবং এ যুগ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন 'বাংলা ছোটগল্পে বিশ্বসাহিত্যের সব লক্ষণগুলিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহতী বিনষ্টের পাশে পাশে মহতী প্রাণের উদ্বোধন বাংলা গল্পে আজকে সমানেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।'[৬]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঐ যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন 'আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়েনা। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল কোরনা'।[৭] তিনি আরও বলেছেন 'সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায়, যখন দেখি বিষয় অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ...বিষয় প্রধান সাহিত্যই যদি এযুগের সাহিত্য হয়, তাহলে বলতে হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।'[৮] আমরা জানি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বিষয়-কেন্দ্রিক এবং তাঁর ছোটগল্পে বিষয়-বৈচিত্র্যও সুপ্রচুর। তাছাড়া কল্লোলীয়দের মতো তিনিও ছোটগল্পের গঠনশৈলীর ওপরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছেন। কিন্তু একটি কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, এঁরা দুজনে ভিন্ন দুটি যুগের লেখক। সুতবাং সাহিত্যের বহিরঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক, তবু সাহিত্যের অন্তরঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় রবীন্দ্র-প্রভাব উজ্জ্বল। 'সুনন্দর জার্নাল'-এর একটি প্রবন্ধে এই উক্তির সমর্থন মেলে। সেখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন 'আমরা অগ্রসর হতে পারি, বিকশিত বিবর্তিত হতে পারি, সাহিত্যের আদর্শে জীবনের বিচিত্র মূল্যবোধে রবীন্দ্র কালীনতা থেকে দূর দুরান্তেও সরে যে পারি; কিন্তু ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে লক্ষ্যহীন শূন্যতায় ঘুরপাক খেতে পারি না। জাতীয় অগ্রগতি আত্মবিস্মৃতিকে আশ্রয় করে ঘটে না, তার জন্যে দরকার আত্মবিস্তৃতি। রবীন্দ্রনাথের মৃৎভূমিতেই আমরা শাখার পল্লবে পুষ্পমঞ্জরীতে বিকীর্ণ হতে পারি।'[৯]

কেবল রবীন্দ্র-প্রভাবই নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে সম-সাময়িক চারজন লেখকের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'আমার কথা'য় বলেছেন 'ছোটগল্প লেখার প্রেরণা পাই বিভিন্ন লেখকের গল্প পড়ে। অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপ্যাধ্যায় ও মনোজ বসু তাদের মধ্যে প্রধান।'[১০]

নারায়ণবাবুর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই চারজন লেখকের সঙ্গে এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা করছি।

প্রথমেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম-সাময়িক গল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসছি। সাহিত্যক্ষেত্রে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর লেখনী যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি ধারালো। তাঁর মতে, বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য হয়না। তাই তাঁর লেখায় ভাবালুতা-রোমান্টিকতা প্রায় নেই, আছে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তবনিষ্ঠ মন ও নেতিবাদ। এই নেতিবাদী চিন্তাধারার জন্যই মাণিকবাবুর সাহিত্যিক সত্তা শেষ অবধি বেঁচে থাকতে পারেনি। শেষদিকে উৎকট উৎকেন্দ্রিক লেখা লিখে মাণিকবাবু যেন অদৃশ্য বিধাতার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। অপরদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুক্তিবাদী হলেও রোমান্টিক, এবং বাস্তববাদী হলেও ইতিবাদী। তাই তাঁর সাহিত্য-সম্ভার দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়েছে।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকলেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন ও সাহিত্য রচনার লক্ষ্য প্রায় একই। এঁরা দুজনেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসঙ্কট, কালোবাজারি, দুর্নীতি-জনিত চরম অবক্ষয় ইত্যাদিকে গল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং উভয়েই এই সঙ্কটের সময়ে মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। তাঁদের গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে অনেক সময় দেখা যাবে, একই ঘটনা একইভাবে তাঁদের শিল্পী মনকে নাড়া দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' (১৩৫৩ খৃঃ) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' (১৯৫২ খৃঃ) গল্প দুটি যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই গল্পদুটির নামকরণেই কেবল সাদৃশ্য নেই, গল্পদুটি একই বিষয় বস্ত্র-সঙ্কটকে কেন্দ্র করে রচিত এবং গল্পদুটি রচনার উদ্দেশ্যও অভিন্ন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে অভিমানিনী রাবেয়ার 'আত্মহত্যার মতো মহাপাপ এখানে যেন কুসুম দাম সজ্জিত চাবুকে পরিণত হয়ে এ যুগের দুঃশাসনদের ভাবী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছে।'[১১] এ প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখক গল্পের শুরুতে বলেছেন '...কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।[১২] এদিকে 'দুঃশাসন' গল্পটির মুখবন্ধে নারায়ণবাবুর স্ত্রী আশাদেবী যে কবিতাটি সংযোজন করেছেন, তা মাণিকবাবুর এই কথাগুলিকেই স্মরণ করায়। ফলে দু'টি গল্প রচনার উদ্দেশ্য যে এক, তাতে আর কোন সন্দেহ থাকেনা। আশাদেবীর কবিতাটির এই দু'টি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতব্য

– 'আজ এক নয় শত কৃষ্ণার লাজ রাখ নারায়ণ

সহস্র হাতে হরিছে বসন যুগের দুঃশাসন।'[১৩]

এই গল্পদু'টির মধ্যে পার্থক্য প্রধানত এইযে, 'দুঃশাসনীয়'তে আছে শুধু বস্ত্রসঙ্কট, আর 'দুঃশাসন'গল্পে প্রধানত বস্ত্রসঙ্কট থাকলেও সেইসঙ্গে আছে কেরোসিন সঙ্কটের নির্মম চিত্র। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে প্রতিবাদ আছে, প্রতিরোধ নেই। আর 'দুঃশাসন'গল্পে আছে আসন্ন বিপ্লবের আভাস।

রবিন পালের ভাষায় – 'মাণিকবাবু যেখানে মূলত বিবরণধর্মী, নারায়ণবাবু সেখানে গল্পের গল্পত্বকে হরণ করেননি। প্রথমজনের লেখা নাটকীয়তা বর্জিত, দ্বিতীয়জনের নাট্যগুণান্বিত। প্রথমজন চরম নৈরাশ্যে গল্প শেষ করেছেন, দ্বিতীয়জন সেখানে শোষক শ্রেণীসমূহের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহাকে সংহত ভঙ্গিতে অপূর্ব রূপদান করেছেন।'[১৪]

বস্তুত, মাণিকবাবুর উত্তরকালের সাহিত্য রচনায় যেমন বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট প্রতিফলন আছে, তেমনি সাম্যবাদী মনোভাব আছে নারায়ণবাবুর সাহিত্য রচনায়। সমাজে শোষণের বিরুদ্ধে এই দুই লেখকই লেখনীকে তরবারিতে পরিণত করেছেন। তবে 'পেট ব্যথা', 'রাঘব মালাকার' প্রভৃতি গল্পে মাণিকবাবু যেমন প্রকাশ্য বিদ্রোহের কুঠারঘাত করেছেন, তেমনি বিদ্রোহ নারায়ণবাবুর লেখায় কম। তাঁর লেখায় বিদ্রোহের চেয়ে বিপ্লবের মন্ত্রধ্বনি বেশি উচ্চারিত; তাঁর লেখায় ঘোষণার চেয়ে ইঙ্গিত বেশি। প্রসঙ্গত নারায়ণবাবুর 'হাড়', 'কবর', 'নীলা' প্রভৃতি গল্পগুলি স্মর্তব্য।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা বিরাট সাদৃশ্য এই যে, 'কল্লোল', 'কালি-কলম' প্রভাবিত যুগের লেখক হয়ে ও তাঁরা অগ্রজ সাহিত্য প্রতিভাকে আক্রমণ করেননি। অবশ্য কল্লোল গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত এঁরা কেউই নন। স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'কল্লোলের সঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য আছে তিক্ততায়, মানস গহনের অনুসন্ধানে এবং যুগোচিত সমাজ জিজ্ঞাসায়।'[১৫] কেবল তিক্ততার কথাটি বাদ দিলে এই উক্তিটি নারায়ণবাবু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে মনে হয়। বিশেষত, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এঁরা দুজনেই কল্লোলের প্রভাবকে স্বীয় বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন; নূতনের ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যের মোহ বা উন্মাদনা তাঁদের আবিষ্ট করতে পারেনি।

ফ্রয়েডের প্রভাবে মানসিক সর্পিলতার পথে জীবন-রহস্যের কেন্দ্র অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সরীসৃপ', 'সিঁড়ি', 'ভূমিকম্প', 'টিকটিকি' প্রভৃতি গল্পে। 'সরীসৃপ গল্পটি সম্বন্ধে নারায়ণবাবু বলেছেন 'অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত যৌন চেতনা নরনারীকে বিকৃতির কোন রসাতলে নিয়ে যায়, চারু - পরী ও বনমালীর চরিত্র তার নিখুঁত মনস্তত্ত্ব-সম্মত আলেখ্য।'[১৬] মাণিক বাবুর মতো নারায়ণবাবু অবচেতনার গহনে অবগাহন করেছেন তাঁর 'লাল ঘোড়া', 'শেষচূড়া' প্রভৃতি গল্পে। কিন্তু তাঁর গল্পগুলি মাণিকবাবুর মতো অত জটিল বা দুর্বোধ্য নয়। মাণিকবাবুর মতো উদ্ভট সমস্যাও সাধারণত তাঁর গল্পের বিষয় নয়। নারায়ণবাবুর এধরনের ব্যতিক্রমী গল্প হল 'অমনোনীতা', 'আত্মহত্যা' ইত্যাদি।

ফ্রয়েডিয় যৌন-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে মাণিকবাবু অনেক সময় তাঁর গল্পকে মনোবিকলনের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং এই অসুস্থ, বিকৃতরূপে জীবনকে গ্রহণ করে নিজের লেখাকেই বিকৃত করে ফেলেছেন। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ফ্রয়েডের যৌন-চেতনাকে সুস্থ জীবনেরই একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং জীবনের এ সব কুশ্রীতাকে অতি প্রাধান্য দিতে গিয়ে কখনোই লেখাকে বিকৃত করে তোলেননি। তিনি সুস্থ উজ্জ্বল জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় মাণিকবাবু 'গল্প উপন্যাসের শরীরে যৌন মনস্তত্ত্ব এবং নারী প্রকৃতি চিত্রণের অপরিহার্য উপকরণ বিন্যাসেও স্তিমিত দীপ্তি শিল্পী ভাবনার অন্তর্দৃষ্টি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসরণের জ্যামিতিক রেখা অনুসরণ করে চলেছে।'[১৭] আমরা জানি,নারায়ণ বাবুর লেখা তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সজীবতা হারায়নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প রচনার ক্ষেত্রে মানসিকতার একটা বিরাট পার্থক্য হল এই যে, স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় – 'বিচারকের শান্ত নিরাসক্তির সঙ্গে বিরূপ বক্রতার মিলনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্পর্কে অসাধারণ নির্মম।'[১৮] অপরপক্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যবিত্তের প্রতি সহৃদয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ। এইজন্য আবেগ কখনো কখনো তাঁর গল্পের নৈর্ব্যক্তিক রূপকে বিনষ্ট করেছে। আবার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সহমর্মিতার অভাব কখনোবা গল্পগুলিকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে মাণিকবাবুর লেখায় বলিষ্ঠ জীবনরস বেশি এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে নারায়ণ বাবুর লেখায় কোমল সাহিত্যরস বেশি। আর এই দুই লেখকেরই লেখায় বুদ্ধিদীপ্ত ইঙ্গিতময়তা, সাঙ্কেতিকতা বারবার ঝলসে উঠেছে চকিত বিদ্যুতের মতো। সেই আলোয় জীবনের গভীরতর রূপ মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ে।

মাণিকবাবুর লেখায় দেহের বলিষ্ঠতা – তথা আদিমতা ও মনোবিকারের রুগ্নতা আশ্চর্য কৌশলে সমন্বিত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি। আসলে নিচুতলার জীবনে মাণিক বন্দ্যোপ্যাধ্যায় এমন এক বলিষ্ঠতার সন্ধান পেয়েছিলেন, নারায়ণবাবুর মতে - 'যা আত্মবঞ্চনার মর্ফিয়া দিয়ে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করে না।'[১৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই আদিম বলিষ্ঠতা সাঁওতালদের মধ্যে

দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি মাণিকবাবুর মতন সেই বন্য আদিমতায় ফিরে যেতে চাননি, যেখানে - 'মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা আশ্রয় লইয়াছে।'[২০] বস্তুত নারায়ণবাবু মধ্যবিত্তের উপর আস্থা রেখে উন্নততর যুগের স্বপ্ন দেখেছেন, আদিম অসভ্যতার 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগে ফিরে যাবার মানসিকতা তাঁর ছিল না।

উত্তরকালে মার্কস্‌বাদে নিজের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে যে দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পেও তার পরিচয় মেলে। প্রসঙ্গত, মাণিক বন্দ্যোপধ্যায়ের 'বিবেক', 'চিকিৎসক', 'রক্ত নোন্‌তা', 'শিল্পী' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা চলে। নারায়ণবাবুর এই ধরনের গল্পগুলির পুনরুল্লেখ করলাম না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে মাণিকবাবু তাঁর কিছু গল্পে ফর্মুলায় প্রাধান্য এনে ফেলেছেন। নারায়ণবাবুরও কিছু পরীক্ষামূলক গল্পাঙ্গিক আছে, কিন্তু তা এতটা বৈজ্ঞানিক-পন্থী নয়, প্রাণের উত্তাপে উজ্জ্বল। কারণ, মাণিকবাবু বিশ্লেষণপন্থী আর নারায়ণবাবু আস্বাদনপন্থী।

বাস্তবনিষ্ঠ লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নির্মোহ বুদ্ধির যোগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের দরবারে স্বতন্ত্র আসন অধিকার করেছেন। বলিষ্ঠ জীবনবোধ, মানব-কল্যাণের পূতমন্ত্রে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়ে আছেন। বিশেষত, রবীন্দ্রোত্তর যুগে গল্পের বহিরঙ্গ রচনায় মাণিকবাবু সফলতম শিল্পী। স্বয়ং সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় - 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিউবিস্ট্‌ গোত্রের শিল্পী-যেখানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সমাজসচেতন শিল্পবুদ্ধি জটিল অথচ নির্ভুল যুগমনকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে।'[২১]

এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার তুলনামূলক আলোচনা করছি। সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা ও গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক। 'কল্লোল' যুগের লেখক হয়েও তিনি কল্লোল-গোত্রীয় হতে পারেননি। তিনি এ যুগের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এনেছিলেন এক নতুন স্বাদ-জল, মাটি, মানুষ, পশুর ভালবাসার স্বাদ। এইপ্রসঙ্গে শ্রী ভূদের চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' নামক গ্রন্থে বলেছেন — ''কল্লোল' গোষ্ঠীর শিল্প চিত্ত যেখানে 'উর্মিল উত্তালতার' প্রখর 'অস্বীকৃতি'র তথা একান্তভাবে প্রত্যয়ভঙ্গের আমোদ উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, তারাশঙ্কর তখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন এক কল্যাণ-স্নিগ্ধ সত্য-সুন্দর জীবন পরিণামে।'[২২] এইভাবে মানব-প্রীতি রাজনৈতিক-চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তারাশঙ্করের রচনায় এক বিশেষ জীবন-দর্শনের-ব্যাপ্তি এনেছেন। তাঁর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', প্রভৃতি উপন্যাস তার পরিচায়ক। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, নারায়ণবাবুও বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব-প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গল্পে। তবে তারাশঙ্কর রাজনৈতিক দলগুলির দলাদলি দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষপাতী ছিলেননা। পক্ষান্তরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন। সুস্নাত দাশের ভাষায় 'সর্বজনপ্রিয় এই মানুষটি কখনোই ছিলেননা পার্টি সদস্য বা সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, যেকোনো শোষণ নিপীড়নের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা তাঁকে টেনে এনেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে।'[২৩] তারাশঙ্করের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও কল্যাণ-স্নিগ্ধ ইতিবাদী দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন। ফলে সুস্থ জীবন ও উজ্জ্বল আশাবাদ তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ এবং কালজয়ী করেছে। অবক্ষয়িত বর্তমান এঁদের দুজনকেই জীবন-বিরোধী না করে জীবন-সন্ধানী করেছে। বর্তমান সভ্যতার ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যেও তাঁদের কল্যাণময় অস্ত্যর্থক চেতনা ও ভাবের গভীরতা জীবন-বোধকে পুষ্ট করেছে।

আমরা জানি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা আঞ্চলিক। রাঢ় অঞ্চল-প্রধানত বীরভূম জেলাকে কেন্দ্র করেই এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের প্রকৃতি, কাহিনী-কিংবদন্তী এবং আদিম মানুষের দল তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ভূদেব চৌধুরীর মতে - - 'তারাশঙ্করের প্রখর আঞ্চলিকতারও মূল প্রেরণা' হল 'তুলনাবিহিত পরিবেশ-সচেতনতায়।'[২৪] তাই বৈষ্ণবতা ও তান্ত্রিকতা তাঁর সাহিত্য রচনার মধ্যে জড়িয়ে গেছে। কেননা, বীরভূম কেবল বীরাচারী তান্ত্রিকের দেশই নয়, আউল, বাউল, বৈষ্ণব দরবেশের দেশ। 'রসকলি', 'রাইকমল', 'কবি', 'হারানো সুর' প্রভৃতিতে বৈষ্ণব-রসের মধুর ধারা তারাশঙ্কর প্রবাহিত করেছেন। আবার 'ছলনাময়ী', 'রায়বাড়ি', 'নারী ও নাগিনী', 'বোবা কথা', 'দেবতার ব্যাধি', 'ডাইনী', 'বেদেনী', 'অগ্রদানী' ইত্যাদি গল্পে 'তান্ত্রিক জীবন রসের রৌদ্র বীভৎস ভয়ানক স্বাদুতাই একান্ত হয়ে উঠেছে।'[২৫] রাঢ় অঞ্চলের এই বিশিষ্ট রস পরিবেশন তো তারাশঙ্কর করেছেনই, এছাড়া নিতান্ত ভৌগোলিক অর্থেও তাঁর গল্পগুলি রাঢ়ের পটভূমিতে রচিত তথা আঞ্চলিক।

আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বেশকিছু গল্পে পূর্ববঙ্গও পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাঁকেও আঞ্চলিক বলা চলে। 'টোপ', 'জান্তব', 'বনজ্যোৎস্না', 'বন-বিড়াল', ' ডিম', 'ধস', 'রিবনবাঁধা ভালুক', 'শেষ চূড়া', 'সেই পাখিটা', 'কাণ্ডারী', প্রভৃতি গল্পের পটভূমি হল উত্তরবঙ্গ। নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয় লক্ষ্য করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের যেমন পদ্মা, পরবর্তীকালে কোপাই। তারাশঙ্করও কোপাই নদীকে গ্রহণ করেছেন, বিভূতিভূষণ তেমনি ইছামতীকে। নারায়ণবাবুর অন্তরে যে নদী বারবার তার ছায়া মেলে ধরেছে, সে উত্তর বঙ্গের মহানন্দা নদী।'[২৬] 'তীর্থযাত্রা', 'কালো জল', 'কালাবদর' প্রভৃতি গল্পে আবার দেখি পূর্ববঙ্গের মেঘনার রূপ। আর তারাশঙ্করের মতো তাঁর লেখায় বৈষ্ণবীয় মধুর রসের বন্যাতো নেই-ই, বরং

বৈষ্ণবদের প্রতি কটাক্ষ আছে। 'নক্রচরিত', 'ভাঙ্গা চশমা' প্রভৃতি গল্প এবং 'মহানন্দা' উপন্যাসে এর পরিচয় মেলে। তবে তারাশঙ্করের লেখায় যে রুদ্রতা-অলৌকিকতা আছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও তা আবিষ্কার করা যায়।

তারাশঙ্কর এবং নারায়ণবাবু উভয়েই স্থানীয় ঐতিহ্য, গল্প-কাহিনী-কিংবদন্তীকে গল্পে স্থান দিয়ে অতিলৌকিক ও বীভৎস রস সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'বেদেনী', 'যাদুকরী', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী', প্রভৃতি গল্প এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', 'মর্গ', 'টোপ', 'জাগ্রতা', প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পটি কুসংস্কার-ভিত্তিক হলেও 'অদ্ভুত বলিষ্ঠতায়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় আর পরিবেশের রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।'[২৭] নারায়ণবাবুর 'জাগ্রতা' গল্পটিও কুসংস্কার ভিত্তিক। কিন্তু পরিবেশের ভয়ঙ্করতায়, বর্ণনার রুদ্রতায় ও অনুভূতির সূক্ষ্ম রহস্যময়তায় এই গল্পটিতেও গড়ে উঠেছে অতিলৌকিক পরিবেশ। শ্রী ভূদেব চৌধুরীর মতে 'তারাশঙ্করের গল্প-বিষয়ে তন্ত্রাভিচার-জনিত বীভৎসতা যেমন রূঢ় বর্ণে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছে তন্ত্র সাধকের শক্তি সমুগ্র দৃঢ় কঠিন ব্যক্তিত্বের।'[২৮] জগদীশ ভট্টাচার্যও 'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প' — এর ভূমিকায় বলেছেন 'তারাশঙ্করের আরাধ্যা জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্ত্তি।'[২৯] 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে উজ্জ্বল কুমার মজুমদার বলেছেন 'বীভৎসতা বা ভয়ানক রসের প্রতি তাঁর আর্কষণও লক্ষণীয়।'[৩০]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই দুজনের লেখাই অশ্লীলতা মুক্ত। যৌনতার কদাচার তাঁদের নেই। এক প্রসন্ন কল্যাণময় শিল্প-চেতনা এঁদের রচনার গভীরে কাজ করেছে। তাই বেদেনীর নিবাবরণ নৃত্যও তারাশঙ্করের রচনায় অশ্লীল নয়। আর আদিবাসী রমণীর নৃত্যও নারায়ণবাবুর লেখায় অশ্লীলতামুক্ত।

তারশঙ্করের গল্পে কুৎসিত-কদাকার, বিকলাঙ্গ মানুষ প্রচুর এবং তাদের 'বিশিষ্ট অঙ্গ বিকৃতি এই কথাই প্রমাণ করে যে বহিরঙ্গই মানুষের চরম রূপ নয় — তাদের প্রাণলোকের নেপথ্যে স্নেহ প্রেমের যে ফল্গুধারা বইছে, তার পরিচয়েই তাদের যথার্থ পরিচয়।'[৩১] যেমন 'মতিলাল'গল্পের কদাকার মতিলাল ও তার স্ত্রী, 'তমসা' গল্পের নায়ক পঙ্খী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে কিন্তু এমন বিকৃত চেহারার মানুষ প্রায় নেই। 'দুর্ঘটনা' গল্পে অবশ্য অগ্নিদগ্ধা কুরূপা নারীর কথা আছে, কিন্তু তার অন্তরে স্নেহ-প্রেমের নির্ঝর নেই; বরং আছে অক্ষম ঈর্ষ্যার তীব্র বিষের জ্বালা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যময় ভাবসমৃদ্ধ সাধুভাষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের লেখাকে খুব প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণবাবুর প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' এর উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চলিত ভাষায় গল্প উপন্যাস রচনা করলেও তারাশঙ্করের ভাষার রৌদ্রোজ্জ্বল বলিষ্ঠ পৌরুষের চকিত ঝলক মেলে সেই ভাষায়। তবে তারাশঙ্করের মতো রূঢ়, অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ তিনি প্রায় করেননি, এবং তাঁর ভাষায় যে রোম্যান্টিক স্নিগ্ধতা আছে, তা তারাশঙ্করের লেখায় দুর্লভ। তাছাড়া তারাশঙ্করের ভাষা মহাকাব্যধর্মী; সে ভাষায় বিবরণ বিস্তৃত ও সুন্দর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা কিন্তু মূলত গীতিকাব্যধর্মী — সে ভাষায় বর্ণনা বিস্তৃত নয়, কিন্তু সুন্দর। বস্তুত তাঁর ভাষায় বিবৃতির চেয়ে ইঙ্গিতই বেশি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন - 'অতীত ও উত্তরাধিকারের প্রতি বিশ্বাস তারাশঙ্করের রচনায় নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে কখনো প্রত্যক্ষ, কখনোবা পরোক্ষরূপে বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুনের জয়কে স্বীকার করেও পরাভূত অতীতের জন্য তারাশঙ্কর অকৃত্রিম সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন।'[৩২] — এই নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্ব এবং পূর্বতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নারায়ণবাবুর লেখাতেও আছে। পরাভূত অতীতের জন্য তিনিও অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন, কিন্তু নূতনের জয়কে সর্বদা বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নেননি, অন্তরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। বস্তুত দ্বন্দ্ব যেখানে পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে নূতন যুক্তিবাদের, সেখানে তিনি নূতনের দিকেই ঝুঁকেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'মমি' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। আর দ্বন্দ্ব যেখানে পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে যন্ত্র সভ্যতার, সেখানে নারায়ণবাবুর হৃদয় ইতিহাসাশ্রয়ী, সেখানে অতীতের জন্য সমবেদনা প্রচুর। তাঁর এই ধরণের গল্প 'ভাঙাবন্দর','সৈনিক' প্রভৃতি। তারাশঙ্কর কিন্তু সর্বদাই পুরাতন সভ্যতার প্রতি ঝুঁকেছিলেন। বস্তুত প্রাচীন জমিদারতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর একরকমের মোহ ছিল, যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'জলসাঘর', 'পিতাপুত্র', 'খাজাঞ্চিবাবু', 'ময়দানব' প্রভৃতি গল্পে। এ প্রসঙ্গে রবিন পাল তাঁর 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন — 'তারাশঙ্করের মধ্যে যেমন পুরাতন কালের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিল নারায়ণবাবুর মধ্যে তা নেই। বরং নতুন কাল, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিকেই তিনি বেশি আগ্রহী। তবে তিনি ঐতিহ্যের কাছেও বিনম্র ছাত্রের মত শিক্ষা নিতে চান।'[৩৩] আবার ডঃ সরোজ মোহন মিত্রও পুরাতনের প্রতি তারাশঙ্করের এই সুস্পষ্ট পক্ষপাতের কথা স্বীকার করে বলেছেন - 'বাস্তবে নূতনের নিকট পুরাতনের পরাজয় হইলেও তারাশঙ্করের সাহিত্যে পুরাতন পরাজয় স্বীকার করিয়াও জয়ী হইয়াছে।'[৩৪]

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের মতে 'প্রধানত সাপ, বেদে, তান্ত্রিক, শ্মশান, শিকার প্রভৃতি উপকরণের দিকেই তারাশঙ্করের নজর থাকে।'[৩৫] তাঁর 'নারী ও নাগিনী', 'বোবা কান্না', 'দেবতার ব্যাধি', 'ডাইনী', 'বেদেনী', প্রভৃতি গল্প এর প্রমাণ বহন করে। তাঁর গল্পে 'বেদে'রা জংলি জড়িবুটি দিয়ে জয় করে ঐ নাগিনীর চেয়েও বিষধরী বেদের মেয়েকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পেও এরকম রোমাঞ্চকর উপাদানের সন্ধান মেলে। প্রসঙ্গত 'হাড়', 'টোপ', 'জাগ্রতা' প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। মানব শিশুকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করে বাঘ শিকারের

কাহিনী যেমন বীভৎস, তেমনি রোমাঞ্চকর।

'ছলনাময়ী' নামে তারাশঙ্কর ও নারায়ণবাবু দুজনেই দু'টি গল্প লিখেছিলেন। আর রবিন পালের মতে এ দু'টি গল্পে 'পরিবেশ ও চরিত্রগত পার্থক্য থাকলেও বক্তব্যগত মিল দুর্লক্ষ্য নয়।'[৩৬]

নাট্যকাররূপে তারাশঙ্কর প্রথম বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আসতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর এই নাট্যকার সত্তার প্রভাবে তাঁর গল্পগুলি প্রায়ই নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীভূদেব চৌধুরীর ভাষায় 'তারাশঙ্করের গল্প প্রকরণের মুখ্য আকর্ষণ তার নাটকীয়তার উপাদানে।'[৩৭] পুরাতন ও নূতনের, পশু এবং মানুষের, মানুষে এবং মানুষের প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্বে তাঁর গল্পগুলি পরিপূর্ণ। তাঁর 'রায়বাড়ি, 'নারী ও নাগিনী', 'জলসাঘর' প্রভৃতি এ ধরনের গল্প। তাঁর গল্পের কিছু চরিত্রও অতি নাটকীয়। যেমন 'মতিলালে'র মতিলাল, 'বোবা কান্না'র শশী ডোম, 'ইস্কাপনে'র ইস্কাপন। তাছাড়া চরিত্রোচিত নাটকীয় সংলাপ রচনাতেও তারাশঙ্কর সুদক্ষ। 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্প তাই 'দুই পুরুষ' এর নাট্যশরীরে সার্থক রূপলাভ করেছে। 'বস্তুত এই একই কারণে তাঁর গল্পগুলিতে মঞ্চ অথবা ছায়াচিত্রের প্রয়োজনে নাট্যরূপায়ণের অতুল্য সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত হতে পেরেছে।'[৩৮]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় এত নাটকীয়তা নেই। তবে তাঁর বেশ কিছু গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে নাটকীয় চমক দিয়ে। যেমন 'তৃণ' গল্পের শেষে পাইকার অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে বসিরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। 'লজ্জা' গল্পের উপসংহারে নায়িকা হঠাৎ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তারশঙ্করের মতো তাঁর লেখাতেও নূতন-পুরাতনের, পশু-মানুষের, প্রকৃতি-মানুষের, মানুষে-মানুষে নাটকীয় দ্বন্দ্ব আছে। প্রসঙ্গত, 'মমি', 'সৈনিক', 'বন তুলসী', 'জান্তব' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা চলে। এছাড়া তাঁর কিছু গল্প সংলাপ-প্রধান হওয়য় নাট্য লক্ষনাক্রান্ত হয়েছে। যেমন 'নেতার জন্ম', 'সেই মৃত্যুটা' ইত্যাদি গল্প। নাট্যগুণান্বিত সংলাপ লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলেই বেশকিছু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনায় তাঁকে হাত দিতে হয়েছিল। 'স্বর্ণসীতা', 'সম্পদ', 'সঙ্কেত', 'অঙ্কুশ' 'রূপান্তর', 'সঞ্চারিণী', 'রামমোহন', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', প্রভৃতির উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে।'[৩৯]

প্রকৃতি বর্ণনায় এই দুই লেখকই সুদক্ষ। তারাশঙ্করের লেখায় রুদ্র প্রকৃতির প্রখর রূপ-বর্ণনা ঝলসে ওঠে 'তখন ছাতিফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম ধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ।'[৪০] আর নারায়ণবাবুর লেখায় প্রকৃতির রুদ্র ও মধুর রূপের মিলন হয় বর্ণিত - 'অকৃপণ পূর্নিমা আর অনাবরণ সৌন্দর্যের মধ্যেও আরণ্যক আদিম হিংসা নিজেকে ভুলতে পারেনি হরিয়ালের সুরে আর ময়ূরের ডাকে রুদ্র মধুরের ঐকতান বেজে চলেছে।'[৪১]

আদিমতা তারাশঙ্কর ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এই উভয়ের লেখার মধ্যেই আছে। অবশ্য তারাশঙ্করের গল্পে — আদিমতার রূপ যতটা তীব্র, নারায়ণবাবুর গল্পে ততটা নয়। ভূদেব চৌধুরীর ভাষায়- 'মানুষকে তারাশঙ্কর আদিম মৌলিক প্রকৃতি ধর্মের মধ্যে লালন করেছেন- অতিশয় **Sophistication** এর প্রভাবে তাঁর জীবন-চিন্তা এবং গল্পের পাত্র-পাত্রী তাদের আদিম প্রাকৃতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি।'[৪২] মানব-প্রকৃতি ও জৈব-প্রকৃতির আদিম সংযোগ ভূমিতেই গল্পকে দাঁড় করিয়েছেন তারাশঙ্কর। ''ফলে 'বেদেনী রাধিকার মধ্যে নাগিনীর ক্রুর সর্পিল স্বভাবই যেন মানবায়িত হয়ে উঠেছে, 'তারিণী মাঝি' তে কালাপাহাড়ের ক্ষিপ্ত, আক্রুষ্ট জীবন পিপাসা ধরেছে এক পৌরুষ-দৃপ্ত কঠিন রূপ।'[৪৩] বস্তুত, তারাশঙ্করের 'তারিনী মাঝি' গল্পে তারিণী অন্ধ জৈবসত্তার আদিম তাগিদেই প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে 'জীবন ও মৃত্যুর এক ভয়ঙ্কর সন্ধি-মুহূর্তের পটভূমিতে লেখক প্রেম ও আত্মরক্ষার পারস্পরিক বিরোধের একান্তবাস্তব অথচ নিষ্ঠুর এক চিত্র অঙ্কন করেছেন অকম্পিত রেখায়'[৪৪]। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পেও এই আদিম জৈববৃত্তি বাঁচার তাগিদে মাথা তুলেছে। 'জান্তব' গল্পে পাহাড়ী শীতে আত্মরক্ষার তাগিদে গুম্ফা লামা তার প্রিয় পোষা কুকুরটিকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে। তবে এক্ষেত্রে আদিম রিপুর তাড়না তারাশঙ্করের মতো অত প্রকট নয়। কেননা, এখানে হত্যাকারী ও হত জীবটির মধ্যে দাম্পত্য-প্রেমের অমৃত স্পর্শ নেই। নারায়ণবাবুর 'বনতুলসী' গল্পে প্রকৃতির আদিম হিংস্রতার সর্বগ্রাসী রূপের দেখা মেলে। তাঁর 'তৃণ' গল্পে আদিম জৈবক্ষুধা হত্যার পথ খুলেছে। এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, আদিমতার সত্য রূপকে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই তাঁদের সাহিত্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মানুষের সঙ্গে পশুর ঘনিষ্ঠ যোগ তারাশঙ্কর ও নারায়ণবাবুর লেখায় বিদ্যমান। শ্রীভূদেব চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে বলেছেন- 'মানুষ ও পশু জৈব প্রকৃতির পরস্পর সন্নিহিত এই দুই বিচিত্র প্রাণিজগতকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে একীভূত করে তুলেছেন শিল্পী।'[৪৫] তিনি আরও বলেছেন 'নারীর সঙ্গে নাগিনীর প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক অভিনব বিস্ময়কর ভূমিকা-লিপি চিত্রিত হয়েছে 'নারী ও নাগিনী' গল্পে'[৪৬] এবং কালাপাহাড় গল্পে কালাপাহাড় 'মানুষের কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন এক প্রেমিক অনুচর; অন্যপক্ষে বিরোধিতায় সে ক্ষিপ্ত মানবশক্তির বিদ্রোহী প্রতিস্পর্ধী।'[৪৭]

আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পে হাতি 'নীলবাহাদুর ব্যক্তি সম্পর্ককে অতিক্রম করে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।'[৪৮] 'কালাপাহাড়' গল্পের শেষে আধুনিক যন্ত্রবাহন কালাপাহাড়কে ধ্বংস করেছে। আর 'সৈনিক গল্পের শেষে হাতি নীলবাহাদুরই ধ্বংস করেছে মোটর গাড়িকে, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে। নারায়ণবাবুর 'দোসর' গল্পেতো মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দোসররূপে ঘৃণ্য শূকরকে

দেখানো হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্পগুলিতে অধ্যাত্ম-চেতনার বিকাশ ঘটেছে। তাঁর হৃদয়ের সব জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ পরিণতি ঘটেছে এই অধ্যাত্ম-চেতনায়। তাঁর নিজের ভাষায় 'বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয় -- এরপরও আছে পরম কাম্য; সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবেনা। অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি।'[৪৯] তাই 'মাটি' গল্পে জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়েও মেওয়ালালের ক্ষোভ নেই। 'কামধেনু'র নাথুও এই অধ্যাত্ম-চেতনার স্পর্শে ফাঁসির জন্য অপেক্ষা করতে ভীত হয়নি; বরং এক অপূর্ব প্রশান্তিতে মগ্ন হয়ে গেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রগুলি কিন্তু কখনো সমাজের অন্যায় অবিচারের ক্ষোভ ভুলে উদার শান্তিতে বিকীর্ণ হতে পারেনি, বরং বিদ্রোহ করেছে, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে।

তারাশঙ্করের গল্পাঙ্গিক মহাকাব্যধর্মী। ছোটগল্পের উপকরণ তাতে সামান্য। ছোটগল্পের চকিত ইঙ্গিতময়তার চেয়ে কাহিনীর পরিণামই তাঁর গল্পে প্রধান। তাই বক্তব্য ধীর স্থির, গভীর এবং স্পষ্ট বর্ণনার ভাগও স্বভাবতই বেশি। ভূদেব চৌধুরীর মতে 'বস্তুত তারাশঙ্করের শৈলী তাঁর আশ্রিত বিষয় বস্তুর মতোই 'প্রাকৃত'- অর্থাৎ প্রকৃত সম্ভব,- স্বাভাবিক এই বিশেষার্থেই তাঁর গল্প প্রকরণকে মহাকাব্যধর্মী বলব।'[৫০] আর এই কারণেই তাঁর গল্পের বিষয় বস্তু কখনো জটিল নয়। এদিক থেকে নারায়ণবাবুর গল্পাঙ্গিক কিন্তু একেবারে পৃথক। ছোটগল্পের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সংক্ষিপ্ত গল্পে অনাবশ্যকীয় প্রসঙ্গ বা বর্ণনা তিনি টেনে আনেননি। ইঙ্গিতের চকিত বিদ্যুতালোকে তিনি জীবনের দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছেন। আর তাঁর গল্পের পরিণতি তারাশঙ্করের মতো নিঃসংশয় সমাপ্তি নয়, বরং কবিগুরুর উক্তিকে সার্থক করে 'শেষ হয়ে হইলনা শেষ'।[৫১] তারাশঙ্করের মতো গল্পের বক্তব্য তাঁর অতি স্পষ্টও নয়, বরং নারায়ণবাবুর গল্প যতটা বলে, তার চাইতে অনেক বেশি বলেনা; এবং ঐ নাবলা কথাটুকুই পাঠকের মনের মধ্যে বাজতে থাকে। কিন্তু 'গল্প রচনার কৌশলে এঁরা উভয়ে সিদ্ধহস্ত। অদ্ভুত অজানা চরিত্র, অদ্ভুত অজানা পরিবেশ, অদ্ভুত ঘটনা গল্পের উপাদান; কিন্তু সব মিলাইয়া অতি সহজে গল্পরসের মাদকতা সৃষ্টি হয়।'[৫২] তবু তারাশঙ্করের প্রখর বলিষ্ঠতা, মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা আবার নারায়ণবাবুর লেখায় দুর্লভ। তাই বলা চলে তারাশঙ্করের রচনায় বর্ণনাগতি শিথিলতা থাকলেও জীবনের সামগ্রিক পরিচয় ও আত্মার নিগূঢ় উপলব্ধি আছে, যা তাঁকে কালজয়ী সাহিত্যিকে পরিণত করেছে। তাই তাঁর লেখার প্রভাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর খুব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে। রবিন পালের মতে 'চল্লিশের দশকে দেশজ ঐতিহ্য ও সাধারণ মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠায় আশাবাদিতার দিক থেকে তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,[৫৩] এবং 'তারাশঙ্কর রূপায়িত ব্যাপ্ত বাংলা আর মানিকের সাম্যবাদ প্রভাবিত জীবন অভিজ্ঞতা এ দুইয়ের সমন্বয় হবার সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল একমাত্র যাঁর মধ্যে তাঁর নাম -- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।'[৫৪]

তবু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারাশঙ্করের লেখার প্রধান পার্থক্য এই যে, নারায়ণবাবুর গল্প অনেকাংশে পক্ষপাত-দোষ দুষ্ট। বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ এবং সহানুভূতি তাঁর গল্পের নৈর্ব্যক্তিকতাকে অনেক সময় ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পে 'মানুষ বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে, ক্ষত-বিক্ষত হয়, বেদনায় কাঁদে, ভালবাসে ও ভালবেসে মরে— এ সবের বহু উর্ধে এক অনাসক্ত দ্রষ্টার দুটি চোখ জেগে থাকে।'[৫৫]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে যে, প্রথমে রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হলেও পরে অচিন্ত্যবাবু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই রবীন্দ্রানুরাগী হয়েছেন,- রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাই এঁদের গল্পের ভাষা কবিত্বময়। শ্রীভূদেব চৌধুরী স্পষ্টই বলেছেন 'মূলত অচিন্ত্যকুমার কবি; গদ্যরচনার -- গল্প লেখার ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনীটি চিরকাল আছে কবিতা-শিল্পীর হাতে।'[৫৬] নারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'দশ দিকপাল লেখক' গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁর 'কবিতার মেজাজ গদ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।'[৫৭]

কিন্তু কাব্য-প্রাণতায় উভয়ে একাত্ম হলেও, অচিন্ত্যকুমারের লেখায় যে খামখেয়ালীপণা ও যৌনতার যথেচ্ছচার দেখা যায়, তা নারায়ণবাবুর লেখায় দুর্লভ। ''নরউইজান; নোবেল লরিয়েট্ নুট্ হামসুন্ এর 'প্যান' অনুবাদ করে তিনি গদ্যে কথা-সাহিত্যে হাত পাকিয়েছিলেন'[৫৮] বলে ভূদেব চৌধুরী অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাই অচিন্ত্যবাবুর নায়ক চরিত্রগুলি অধিকাংশই যাযাবর লক্ষণাক্রান্ত ন্যুট-হ্যামসুনের মতো। '' 'বেদে' গল্পে তাই বারবার ঘরের আশ্রয়ের হাতছানি পেয়েও কাঞ্চন চিরপথিক, চিরকালের বেদে।''[৫৯] আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখায় দেহ-ক্ষুধা এত বেশি আছে যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন ---

(৩১ শে আশ্বিন, ১৩৩৫)

'তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখবোধ করেছি যে কোনো কোনো বিষয়ে তোমার পৌনঃপুন্য আছে, বুঝতে পারি সেইখনে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি।'[৬০] অচিন্ত্যবাবুর এই ধরণের কিছু গল্প হল 'আহ্লাদী', 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', 'টুটুফুটা' প্রভৃতি। তাঁর 'বিবাহের চেয়ে বড়' অশ্লীলতার দায়ে

অভিযুক্ত হয়েছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় এই রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'মিথুন প্রবৃত্তি' তো নেই-ই, তাঁর গল্পে ভবঘুরে চরিত্রও তেমন মেলেনা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — উভয়ের লেখাতেই কিন্তু পতিতার করুণ অসহায়তা ও বেদনার কথা আছে। অচিন্ত্যবাবুর 'কেয়ার কাঁটা' গল্পে ধর্ষিতা নারীর সমাজ-চ্যুতির ফলে অসহায় হয়ে গণিকা-জীবন গ্রহণের কথা আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শৈব্যা' গল্পেও পুরুষ-প্রতারিতা নারী বাধ্য হয়ে পণ্যা নারীর জীবনে প্রবেশ করেছে। অচিন্ত্যকুমারের 'ইতি' গল্পে বেশ্যা নারী সরলা নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে এবং নায়ক নিমাইয়ের আচরণে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু মূল অভিনয়ের দিন এই স্বপ্ন তার ভেঙ্গে গেছে। নারায়ণবাবুর 'এক্‌জিবিশন' গল্পেও পতিতা নারীর স্বপ্নভঙ্গের কথা আছে।

অচিন্ত্য কুমারের 'রুদ্রর আবির্ভাব' গল্পে বন্যার প্রাবল্যে স্বামী-স্ত্রী ঘর ছাড়া হয়ে শহরে এসে অনটন, অসুস্থতা, ছাঁটাই প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। নারায়ণবাবুর 'প্রদীপ ও প্রজাপতি', 'কেয়ার কাঁটা' প্রভৃতি বেশ কিছু গল্পে নগর-জীবনের এই সমস্যার কথা আছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'অমর কবিতা' বিকৃত মানসিকতার গল্প। নারায়ণবাবুর 'শেষ চূড়া', 'অমনোনীতা' প্রভৃতি গল্পেও বিকৃত মানসিকতার সূক্ষ্ম দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'ধন্বন্তরি' গল্পের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি মহাপুরুষের জন্ম' গল্পে অর্থলোভী ডাক্তারের বিবেক দংশনের কথা আছে। সম-সাময়িক যুগের নীতি ভ্রষ্টতা এ গল্পগুলিতে প্রকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কৃত্রিম দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে এঁরা উভয়েই গল্প লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকেই আলোচনা করেছি। তাই আর পুনরুল্লেখ করলাম না। আবার বস্ত্র-সঙ্কটকে কেন্দ্র করেও যুগ-সচেতন এই দুই লেখক গল্প রচনা করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে পৌরাণিক যাত্রা পালার রূপকে বস্ত্র-সঙ্কটের ভয়াবহ সমস্যা আসন্ন বিপ্লবের আভাসের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। আর অচিন্ত্যকুমারের 'বস্ত্র' গল্পে এক দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর দান করা বস্ত্র গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরে আত্মহত্যাকারীর বৌ ও পুত্রবধূ সেই মৃতের গলায় জড়ানো বস্ত্রটিকে দুভাগ করে পরেছে। গল্পটির শেষে তাই বাস্তবতার নির্মম আঘাত তীব্রতর।

অচিন্ত্যকুমারের 'হাড়' গল্পে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ও সুযোগে নারীদের অধঃপাতে নিয়ে যাবার চিত্র আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালো জল' গল্পেও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে নারী পাচারের বাস্তব চিত্র মেলে। সর্বোপরি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়েই সাম্যবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'বেদখল', 'দাঙ্গা' প্রভৃতি গল্প এবং নারায়ণ বাবুর 'কবর', 'নীলা', 'খড়্গ', 'ডিম' প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভূদেব চৌধুরী অচিন্ত্যকুমারের গল্পের গঠনশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁর 'প্লটের উন্মোচনে একটা নাটকীয় বহমানতা রয়েছে, আর ভাষায় আছে কাব্যধর্মী এক আবহ ঝঙ্কার'।[৬১] এই উক্তিটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের গঠন-শৈলী সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য বলেই আমার মনে হয়। নাটকীয় কৌতূহল, নাটকীয় রহস্য, নাটকীয় চমক ও কাব্যময় আবেগ সমৃদ্ধ ভাষা নারায়ণ বাবুর গল্প-রচনা-শৈলীর অন্যতম উপাদান।

সুতরাং এভাবে আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে — সামান্যকিছু অ-মিল থাকলেও তাঁদের গল্প রচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য নিতান্ত কম নয়। এর কারণ পূর্বসূরী হিসেবে অচিন্ত্যকুমারের লেখা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন 'তারাশঙ্করের পৌরুষদীপ্তি, অচিন্ত্যকুমারের মাটি আর মানুষের বলিষ্ঠ মিলন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মম জীবনাসক্তি .... নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাসক্তিকে নতুন পথ দেখিয়েছে, নতুন শক্তি দিয়েছে।'[৬২]

সরস, সুমিষ্ট ছোটগল্পকার মনোজ বসুর সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে এবার আসছি। আমরা জানি বাঙালীর জীবনের চিত্র মনোজ বসুর লেখায় উজ্জ্বল। বিশেষত, তিনি 'বাদা অঞ্চলের জলজঙ্গলবাসী মানুষের বাস্তবাশ্রয়ী রোমান্সের গল্পগুলিকে একটা অপরূপ মাধুর্য দান করিয়াছেন।'[৬৩] তাই তাঁর লেখায় পূর্ববঙ্গ এসেছে বারবার। সুন্দরবনের পটভূমিও তাঁর গল্পে বহু-ব্যবহৃত। এ প্রসঙ্গে মনোজ বসু স্বয়ং তাঁর স্মৃতিমূলক রচনা 'ঝিলমিল' এ বলেছেন ('সাহিত্য কথা' ও 'নিশিকুটুম্ব' নিবন্ধে) -- '........ ঠিক বাঘের গল্প নয়- কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস ('জলজঙ্গল' 'বন কেটে বসত') ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি'।[৬৪] সুতরাং দেখা যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোজ বসু উভয়েই বিস্তৃত অর্থে আঞ্চলিক। আমরা জানি, নারায়ণবাবুর লেখাতে উত্তর বঙ্গের পটভূমি বেশি এবং অনেকটা পূর্ববঙ্গের পটভূমিও ব্যবহৃত। এর আগেই বিভিন্ন লেখকের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

তাছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোজ বসু এঁরা দুজনেই রোম্যান্টিক,-প্রকৃতি-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক। মনোজ বসুর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন- 'জমিজিরেত, মানব-মানবী, সমসাময়িক রাজনীতি সর্বত্রই তাঁর কুশলী কলম রোমান্টিকতার যাদু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে ....'[৬৫] আর ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় 'মনোজ বসুর প্রকৃতি চেতনাও একাধারে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা এবং রুক্ষ ভয়ালতার সেবা করেছে যুগপৎ,'[৬৬] দীপক চন্দ্রের মতে, তাঁর হাতে 'প্রকৃতির এই দ্বৈত সত্তার স্বরূপ উন্মোচন

হয়েছে 'পৃথিবী কাদের' গল্পে।'[৬৭] এ গল্পে 'নটবরের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী প্রকৃতির অন্ধ আক্রোশ, যা নিয়তির মত নির্মম ও নিষ্ঠুর।'[৬৮] আর মানব-প্রেমিক মনোজ বসু চেষ্টা করেছেন — 'বারবার মানবিক জগতে ফিরে আসতে; যে মানুষ মাটির মানুষ, মনোজ বসু তাদেরই কাছাকাছি লেখক'[৬৯] বলে ভবানী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন তাঁর 'কাছে বসে শোনা' শীর্ষক প্রবন্ধে। বস্তুত মনোজ বসুর গল্পগুলিতে রোমান্টিকতা, প্রকৃতি-প্রেম ও মানব প্রেম— এই তিনটি বৈশিষ্ট্য মিলে মিশে আছে ত্রিবেণী-সঙ্গমের মতো।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতেও উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ার মতো। তাঁর গল্পের রোম্যান্টিক ভাব ও ভাষা যেন গল্পের আবহ তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকায় লিখেছেন 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যুগপৎ 'ক্লাসিক' ও 'রোমান্টিক', মহৎ শিল্পের এই মিশ্র লক্ষণ তাঁর লেখাতেও পরিদৃশ্যমান।'[৭০] আর বীরেন্দ্র দত্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি 'মানুষকে হৃদয়ের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন।'[৭১] নারায়ণ বাবুর লেখায় সত্যিই মানুষের প্রতি মমতা অপরিসীম। আর এই কারণে তাঁর গল্পগুলি যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। আর তাঁর প্রকৃতি-প্রেম 'ডুয়ার্স টেরাই আরকানের হিংস্র অরণ্যভূমি থেকে নিম্নবঙ্গের নদীমোহানায় সমুদ্রগর্ভ থেকে সদ্যোত্থিত নোনামাটির চরে মানুষের নতুন উপনিবেশ পর্যন্ত .... সমভাবে প্রসারিত।'[৭২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশকিছু গল্পে এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য একইসঙ্গে বিদ্যমান। যেমন 'বনজোৎস্না' গল্পে ডুয়ার্সের ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর প্রকৃতি, বন বালার রোমান্টিক প্রেমোচ্ছ্বাস এবং মানবী শিউকুমারীর ওপর লেখকের মানবিক দরদ গল্পটির ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মনোজ বসু সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন যে, 'তাঁর শিল্পী-আত্মা একটি অম্লান কিশোর ধর্মে লাবণ্যময়।'[৭৩] এই একই কথা বলা চলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পগুলি সম্পর্কে। অবশ্য মনোজ বসুর গল্পে 'বাস্তবিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে'[৭৪] যে 'কিশোর ভাবালুতার-স্বপ্ন সুরভি'[৭৫]র দেখা মেলে, তা নারায়ণবাবুর গল্পে দুর্লভ। নারায়ণ বাবুর গল্পে বাস্তবকে কৈশোর-স্বপ্ন কখনোই আচ্ছন্ন করেনা। আর 'কৈশোর বিষণ্ণতাই মনোজ বসুর গল্প-শিল্পে রোমান্সরসের উৎস'।[৭৬] তাই তাঁর এধরনের গল্প ছোটদের থেকে বড়দেরই বেশি ভাল লাগে। অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে কৈশোর আরোপ করেন তখনই, যখন কিশোরদের জন্য তিনি গল্প লেখেন, তাই তাঁর গল্পগুলি কিশোরদের খুবই আর্কষণ করে; এবং তাঁর এ ধরণের গল্পগুলি কৈশোরের কৌতুকমাখা দুষ্টুমিতে ভরপুর।

রহস্যময়তা, কবিত্ব ও অতিপ্রাকৃতের সমাহারে মনোজ বসু ও নারায়ণবাবু — উভয়ের গল্পই রসোত্তীর্ণ। মনোজ বসু সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপ্যাধ্যায় লিখেছেন ' অতিপ্রাকৃতের খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ জাগাইবার অসাধারণ ক্ষমতা ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।'[৭৭] আবার ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন — ' বনের মর্মরধ্বনির নিগূঢ় অন্তঃপুরে যে আলো-আঁধারের রহস্য নিকেতন আছে, তাকেই তিনি এক কবিত্বময় সংকেতভাষণে রূপ দিয়েছেন।[৭৮] মনোজ বসুর এই ধরনের গল্প হল 'বনর্মমর', 'নরবাঁধ' 'দেবী কিশোরী' প্রভৃতি। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ধরনের কিছু গল্প হল 'হাড়', 'টোপ', 'জাগ্রতা', 'পুষ্করা' ইত্যাদি। প্রকৃতির রহস্যময়তার আধারে কাব্যিক শব্দ কৌশলে অতিপ্রাকৃতের রস জমাট বেঁধেছে তাঁর গল্পে। তাঁর 'পুষ্করা' গল্পটি সম্বন্ধে মানস মজুমদার বলেছেন 'আতঙ্ক উদ্দীপক পরিবেশ-চিত্রণে এবং চমকদীপ্ত নাট্যমুহূর্ত সৃজনে লেখক অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।'[৭৯]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোজ বসু-দুজনেই রাজনীতি-সচেতন। মনোজ বসুর ' পৃথিবী কাদের', 'দিল্লী অনেকদূর', 'ভুলি নাই', 'আগস্ট ১৯৪২', 'সৈনিক' প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। দীপক চন্দ্রের মতে, মনোজ বসু 'সমাজের চিরশোষিত, লাঞ্ছিত মানবাত্মার হৃদয়- বেদনাজাত জীবন জিজ্ঞাসার চির অসমাপ্ত জবাবের বাণীরূপ দিয়েছেন 'পৃথিবী কাদের' গল্পে।'[৮০] তিনি আরও বলেছেন 'কিন্তু অসহায় সর্বহারা শ্রেণীহীন মানুষের বিদ্রোহ ক্ষোভ কিংবা দুঃখ দূর করার কোনো মন্ত্র এতে নেই । দুঃখের কাছে অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করার কাপুরুষতা এবং অক্ষম অসহায় মানুষের মত ভগবানের কাছে নালিশ করার মধ্যে নেই কোনো সমাজ বিপ্লবের বীজ।'[৮১] অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনোজ বসুর মতোই স্বদেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক। এর উপরে ভিত্তি করেই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি অসহায় কিশোরের মতো এ সমস্যা দেখে চোখের জল লুকোননি, বরং বিপ্লবের ইঙ্গিতে ঝলসে উঠেছে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী। মানস মজুমদার তাঁর 'হাড়' গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন 'মন্বন্তরের বলি হয় অসংখ্য মানুষ। .... রায়বাহাদুরের মতো বিত্তবান অভিজাত শ্রেণীর বিবেকের দরজা বন্ধ থাকে। বুভুক্ষু মানুষের অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটবে না? লেখক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন।'[৮২] 'দুঃশাসন' গল্পেও এ যুগের বস্ত্র হরণকারী দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে চাষীদের হাতে কাস্তে আসন্ন বিপ্লবের আভাসে ঝিকিয়ে ওঠে। অবশ্য 'পথ কে রুখবে' গল্পে মনোজ বসু তাঁবেদারদের মুখের ওপর চাবুক মেরে অসম্ভব সাহসের সঙ্গে সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন যে, মনোজ বসুর 'মূল রস জীবন-চেতনা, তা রাজনৈতিক অগ্নিশুদ্ধির পবিত্রতায় স্থির।'[৮৩] নারায়ণ বাবুর জীবন-চেতনাতেও এই রাজনৈতিক পবিত্রতার দেখা মেলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনিও অনড়। 'একটি নেতার জন্ম' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও মনোজ বসুর মতো রাজনৈতিক নেতাদের মুখে ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন।

মনোজ বসু ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই বিভিন্ন বিষয় এবং বিভিন্নরকম চরিত্র নিয়ে গল্প লিখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সঙ্কট, কালোবাজারী, মন্বন্তর তাঁদের গল্পের বিষয় হয়েছে অনিবার্যভাবে। প্রসঙ্গত মনোজ বসুর 'মন্বন্তর', 'ভেজালের উৎপত্তি' প্রভৃতি

গল্প, এবং নারায়ণবাবুর 'নক্রচরিত', 'কবর', 'পুষ্করা' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

গল্প বলার অসাধারণ দুর্লভ যাদুদণ্ডটি এই উভয় লেখকের মূলধন। গল্প বলার বিশেষ আকর্ষণীয় কৌশল এঁদের সহজাত। তাই সামান্য ঘটনাও পরিবেশনের গুণে হয়ে উঠেছে অসামান্য। মনোজ বসুর 'মাথুর' গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন — 'এক নেশা ধরানো আমেজ গল্পটিকে চুম্বকের আকর্ষণীয়তা দিয়েছে। সে রস আসলে ছোট বা বড় গল্পের নয় — বৈঠকী গালগল্পের বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের জীবন আর প্রকৃতি পরিবেশের আন্তরিক উত্তাপে যা একাধারে জীবন্তমদির। মনোজ বসুর গল্পের এই রূপশৈলী এই টেক্‌নিক্ ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল আকারের গল্পেরই সাধারণ লক্ষণ।'[৮৪] অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে গ্রাম্য গালগল্পের বৈঠকী মেজাজ নেই, বরং নাগরিক বুদ্ধিবাদের ঔজ্জ্বল্য আছে। আর সেই সঙ্গে আছে 'যে কোনো পরিবেশে বিচিত্রস্বাদী গল্প রচনার অনায়াস-পটুত্ব।'[৮৫] তাই মনোজ বসু প্রধানত পল্লীপ্রাণ লেখক এবং নারায়ণবাবু নাগরিক-চেতনায় সমৃদ্ধ বিদগ্ধ লেখক হলেও গল্প রচনার অনায়াস ক্ষমতায় তাঁরা একাসনে স্থান পাবার যোগ্য।

এছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একেবারে সমকালে যেসব লেখক ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন, এবার তাঁদের আলোচনায় আসছি। প্রখ্যাত ছোট গল্পকার সুবোধ ঘোষ কাল-সচেতন শিল্পী। তাই তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিকে যন্ত্রযুগ যেন কথা কয়ে উঠল' [৮৬] বলে জগদীশ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। বস্তুত, এ যুগে যন্ত্র ও মানুষের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা এ গল্পে স্পষ্ট, সেই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে যন্ত্রের প্রতি মানুষের অপরিসীম দরদ, মমতা ও ভালবাসার কথা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই যন্ত্রযুগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বৈকি, কিন্তু যন্ত্র ও মানুষের ভালবাসা নয়, পুরাতন ও নূতন যন্ত্রযুগের দ্বন্দ্বই তাঁর গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর 'সৈনিক' গল্পে হাতি প্রাচীন যুগের আভিজাত্যের, আর গাড়ি আধুনিক যন্ত্র-যুগের প্রতীক। অবশ্য সুবোধ ঘোষের গল্পেও পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব আছে; সেইসঙ্গে আছে সাম্যবাদী বৈপ্লবিক চেতনা। প্রসঙ্গত 'ফসিল' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। এ গল্পে ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে স্বর্ণলোভী বণিক সম্প্রদায়ের। তাই নির্যাতিত প্রজাদের বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছে বণিকরা। কিন্তু এই গণ-বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করলে নূতন ও পুরাতন-এই দুই শোষক শ্রেণী হাত মিলিয়েছে, এবং 'খনিগর্ভে ধ্বসে পড়া পীটের তলায় প্রোথিত হয়েছে জনমানবের বিপ্লব প্রচেষ্টা।'[৮৭]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে কিন্তু গণ-বিদ্রোহের এমন নিরাশ পরিসমাপ্তি নেই, বরং সেসব গল্পের শেষে আছে আশাবাদ ও বিপ্লবের স্বপ্ন। 'নীলা গল্পের শেষে তাই ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি ভাস্কর সাম্যবাদের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি কুন্তলার নীলার মতো দুচোখে তাকিয়ে সম্মোহিত হয়ে ভাবে 'নটরাজের তৃতীয় নেত্রে এমনি একখণ্ড হীরা জ্বলছে, উজ্জ্বল, অপরূপ, কিন্তু সে হীরায় তীব্র বিষ সঞ্চারিত, স্পর্শ করলেই অপমৃত্যু।'[৮৮]

বর্তমানকালের হাওয়া বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যারা এগিয়ে যেতে পারেনি, তাদের কথা আছে সুবোধ ঘোষের 'ন তস্থৌ' আর 'ভাট তিলক রায়' গল্পে। এসব গল্পে দুই যুগের মানসিক সংঘাত সুস্পষ্ট।

'ন তস্থৌ' গল্পে পুরাতন যুগের প্রতীক বৃদ্ধ উপাধ্যায়ের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে তাঁরই ছেলে সোমনাথের, পুত্রের মনে তিনি ক্ষণিকের জন্য অতীতের অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু নূতন যুগের প্রতিভূ সোমনাথের যুক্তিবাদী মন শেষ পর্যন্ত এই অলীক স্বপ্নের অতীত ধ্বংসস্তূপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে নূতন জীবনের পথে। ঠিক এমনই নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব ও অলৌকিক বিশ্বাসের মায়াবিভ্রম এবং পরিশেষে নূতন যুগের বিজয়কেতনের কথা আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মমি' গল্পে। লক্ষ্য করবার বিষয় এইযে, এক্ষেত্রেও প্রাচীন যুগের প্রতিনিধি পিতা জমিদার রত্নেশ্বর এবং নতুন যুগের প্রতিনিধি তাঁর পুত্র মণীন্দ্র।

সুবোধ ঘোষের 'ভাট তিলক রায়' কিন্তু এভাবে মাথা নিচু করেননি। তিনি নতুন শিল্পযুগের বিরুদ্ধে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করে গেছেন নারায়ণ বাবুর 'সৈনিক' গল্পের হাতি নীলবাহাদুরের মতো।

সুবোধ ঘোষের 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পে বীর্যহীন পৌরুষহীন যুবক 'কান্তিকুমারের ব্যক্তিগত ক্লীবত্বের ফলেই তার হৃদয়লক্ষ্মী রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় ধরা পড়েছে।'[৮৯] এই গল্পটির সঙ্গে তুলনা করা যায় নারায়ণ বাবুর 'টোপ' গল্পটির। 'টোপ' গল্পেও ধনী রাজাবাহাদুরের বংশবদ একটি টিপিক্যাল ক্লীব চরিত্র আছে, যে কান্তিকুমারের মতোই 'মুগ্ধা বঙ্গজননীর শান্ত শিষ্ট সাধু সাত কোটি সন্তানেরই একজন।'[৯০] এই দু'টি গল্পেই বিত্তের জয়গান, ধনীর অত্যাচার এবং ক্লীব পুরুষের কথা আছে ঠিকই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুবোধ ঘোষের গল্পের ভীরু চরিত্রটি আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধনী অটলনাথের কাছে আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পের চরিত্রটি অভাবে নয়, স্বভাবে রাজাবাহাদুরের কাজে আত্মবিক্রয় করেছে। অবশ্য নারায়ণবাবুর বেশ কিছু গল্পে ধনীর চক্রান্তের শিকার হয়ে অসহায়ভাবে আত্মবিক্রয়ের কথা আছে। প্রসঙ্গত তাঁর 'কেয়া', 'খড়্গ' ইত্যাদি গল্পের কথা বলা চলে।

সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পে স্বার্থান্বেষী, আত্মসর্বস্ব, স্খলিতগোত্র যুবক সঞ্জয় গোত্রহীন শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মালিক পক্ষের দিকে ঝুঁকে। এ যুগের অর্থগৃধ্নুমানুষের এমন অধঃপতনের চিত্র মেলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস',

'নক্রচরিত', 'ভাঙ্গা চশমা' প্রভৃতি গল্পে।

সুবোধ ঘোষের 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে কুরূপা মালা বিশ্বাস নিজের নামে গোপন প্রণয়ের মিথ্যা কুৎসা রটনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, নারী হিসাবে সেও পুরুষের কাঙ্ক্ষিতা। গল্পটিতে শ্রীহীনা নারীর মনস্তত্ত্ব সার্থকভাবে প্রকাশিত। এমনই কুরূপা নারীর মনস্তত্ত্বের সার্থক ছবি মেলে নারায়ণবাবুর 'দুর্ঘটনা'গল্পে। এ গল্পের নায়িকা তার অগ্নিদগ্ধ বিকৃত মুখশ্রীর জ্বালা কুড়োতে অন্যের সুখের সংসার ভাঙতে, মিথ্যা গল্প ফেঁদে জ্বালিয়েছে ঈর্ষ্যার আগুন। ঘটনা ভিন্ন, কিন্তু মানসিকতা মালা বিশ্বাস ও ইন্দিরার একই। এরা দুজনেই রূপহীনতার জন্য হীনমন্যতায় ভুগেছে, পুরুষ-বাঞ্ছিতা হতে না পেরে অপমানেও অতৃপ্ত কামনায় জ্বলেছে; কিন্তু হার মানে নি। প্রভেদ কেবল এই যে, মালা বিশ্বাসের হৃদয়ের আগুন আত্মদহন করেছে, আর মিস্ট্রেস ইন্দিরার হৃদয়ের আগুন অন্যের সুখ গ্রাস করতে চেয়েছে এক অদ্ভুত হিংসার লেলিহান শিখায়।

'বারবধূ' গল্পটি সুবোধ ঘোষের একটি সার্থক ছোটগল্প। এ গল্পে বারবধূর সত্যিকারের বধূ হবার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় '.......... মানুষের নীড় ভাঙ্গার কাজে অসংবৃতকামা কুললননার বিরুদ্ধে অনাভিজাত বারবধূর .... অভিযোগ ক্ষমাহীন ধিক্কারে ভদ্রসমাজকে ব্যঙ্গ করে উঠেছে।'[৯১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একজিবিশন' গল্পেও পতিতা নারীর বেদনার কথা আছে। সেও বারবার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে প্রতারিত হয়েছে। কিন্তু এ গল্পে ভদ্র সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ নেই, বরং সমাজ-সচেতন পুরুষের আত্ম সমালোচনা আছে।

সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে 'স্তন্যপীযূষদায়িনী জননীকে সমাজের অনুশাসন-কুঠারে হত্য করে তাকে মার্কা-মারা বারবনিতার দলে ঠেলে দেওয়ার মর্মান্তিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে।'[৯২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শৈব্যা' গল্পে চরিত্রহীন পুরুষ-সমাজও এমনিকরে নীরদাকে পতিতাতে পরিণত করেছে। কিন্তু এখানে 'পরশুরামের কুঠার'-এর মতো মাতৃহত্যার নির্মম বীভৎসতা নেই; স্তন্যদায়িনী জননীর প্রতি সন্তানের ভোগস্পৃহা নেই। সুতরাং বিভিন্ন গল্প আলোচনা করে একথা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিযে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে সুবোধ ঘোষের গল্পের তীব্রতা, আঘাত অনেক বেশি।

সুবোধ ঘোষের 'কালাগুরু' গল্পে সাহেব অফিসার টেনব্রুকের মিথ্যা ভারত-প্রেমের মুখোস খুলে দিয়ে ধূর্ত শাসকের স্বরূপ দেখানো হয়েছে। প্রাচ্য সৌগন্ধ তাঁর চরিত্রের প্রসাধন মাত্র; জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় 'স্বরূপলক্ষণে তিনিও ঝানু সাম্রাজ্যবাদীদেরই একজন।'[৯৩] ঠিক এমনই ধূর্ত, নকল প্রেমিক সাহেবের সন্ধান মেলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালনেমি' গল্পে। অবশ্য এই গল্পদু'টির পরিণতি ভিন্ন। 'কালাগুরু' গল্পটি শেষ হয়েছে সাহেবের দমন নীতির মধ্য দিয়ে। আর 'কালনেমি' গল্পের শেষে নেপালী নেতা ধনরাজ গুরুংই সাহেবকে জব্দ করেছে বিদ্রূপবাণ ছুঁড়ে। এভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, সুবোধ ঘোষের চেয়ে নারায়ণবাবুর লেখাতে আশাবাদ বেশি। অন্য দিকে সুবোধ ঘোষের লেখা বেশি বাস্তবনিষ্ঠ।

সুবোধ ঘোষের 'বৈরি নির্যাতন' গল্পে 'ভারত সম্পর্কে আমাদের শত্রু-মিত্র নিরূপণের জটিল মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের কাহিনী আছে।'[৯৪] এই গল্পে মারাঠাদের শাস্তি দিতে গেছে বাঙালী সন্তান দিলীপ। কিন্তু গল্পের শেষে দিলীপ বুঝেছে, ভারতের প্রতিবেশী ভারতের শত্রু হতে পারেনা। নারায়াণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি শত্রুর কাহিনী' গল্পেও আছে ভারতের শত্রু-মিত্র নিরূপণে আমাদের জটিল মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ। এ গল্পে বিদেশী যুবক হ্যান্স্ ভারতকে ভালবেসেছে — ভারতের মানুষ ও সংস্কৃতিকে ভালবেসেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তাকে ভারতের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গল্পের শেষে হ্যানস্ এই অদ্ভুত বিচারকে বিদ্রূপ করেছে কাচের বোতল ঠাকুরের মূর্তির গায়ে ছুঁড়ে ফেলে। এ ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের গল্পটির পরিণাম কল্যাণময়। আর নারায়ণবাবুর গল্পের শেষে হ্যান্সের বিদ্রুপ এক ধারালো চাবুকের মতো পাঠকের হৃদয়ে আঘাত করে।

জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে, সুবোধ ঘোষের গল্প 'ক্লাসিক-পন্থী, এপিক ধর্মী।'[৯৫] তাই তাঁর লেখায় টাইপ চরিত্র বেশি এবং তাঁর লেখা 'অতিমাত্রায় অসাধারণ'।[৯৬] সেই কারণে জীবনের সহজ রূপ তাঁর লেখায় দুর্লভ। অন্যদিকে নারায়ণ বাবু সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের সহজ কথাই লিখেছেন। অবশ্য বিদগ্ধতা ও মননশীলতা এবং রুচিবোধের গুণে কখনো কখনো তা সাধারণের মাত্রা অতিক্রম করেছে। তাছাড়া নারায়ণবাবুর লেখায় গীতিধর্মিতা বিদ্যমান। আর সুবোধ ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের উভয়েরই সাফল্যের চাবিকাঠি তাঁদের অসাধারণ ভাষাশিল্পে। কাব্যিকতা, ভাব-গভীরতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও উপযোগী অলঙ্কার প্রয়োগে এঁরা উভয়েই সিদ্ধকাম শিল্পী।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই জানাই, তাঁরা যে কেবল সমকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাই নয়; তাঁরা পরস্পর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বয়ং এ প্রসঙ্গে তাঁর 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন 'নারায়ণ ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা একসঙ্গে লেখালেখি আরম্ভ করেছিলাম।'[৯৭] সুতরাং তাঁদের লেখা নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়।

কুরূপা নারীর মনস্তত্ত্ব নারায়ণবাবু ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র উভয়ের লেখাতেই স্থান পেয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কুমার সম্ভব' গল্পে

কুৎসিত, এক চোখ কানা ধাত্রী সারদা তার রূপহীনতার জন্য তার পুত্র-সম স্নেহের পাত্র অমলের কাছে ভৎর্সিতা হয়ে অক্ষম ক্রোধে নিজের ভাবী সন্তানকে অন্ধ করে দিতে চেয়েছে। বলেছে- আমার পেটের ছেলে আমাকে ঘেন্না করবে, আর আমি তা সহ্য করব? ...... সে জানবে মেয়েমানুষ এইরকমই হয়। সব মেয়েমানুষের রূপই আমার মত, হওয়ামাত্র তার দু'চোখই আমি কানা করে দেব, বুঝলে?'[৯৮] বুকের মধ্যে কতখানি যন্ত্রণা জমা হয়ে থাকলে এমন নির্মম হওয়া যায়, তা ভেবে পাঠক যতটা মমতাবোধ করে, তার চেয়েও বেশি শিউরে ওঠে। কুরূপা নারীর বেদনাজাত ক্রোধ এখানে পৈশাচিক হিংস্রতায় ফণা তুলেছে। এর তুলনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুর্ঘটনা' গল্পের মিস ইন্দিরার বেদনার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম। তাই সে অন্যের ঘর ভাঙবার ষড়যন্ত্র করেই খুশি। তার এ কাজে কুৎসিত রমনীর ক্ষোভ ঈর্ষানলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু 'কুমার সম্ভব' গল্পের বীভৎস রস এতে নেই। অচেনা মানুষকে মানসিক কষ্ট দেওয়া আর আপন সন্তানকে পঙ্গু করে দেবার পরিকল্পনায় প্রভেদ অনেক। পুত্র-সম বালকের কাছে উপহাসাস্পাদ হয়ে সারদা আপন পুত্রের উপর প্রতিশোধ নিয়ে চেয়েছে। এতে কুৎসিত রমণীর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-হৃদয়ের মনস্তত্বও মিশে আছে। আর 'দুর্ঘটনা' গল্পে আছে কেবল কুৎসিত রমণীর হীনমন্যতাজাত মনস্তত্ত্ব।

নরেন্দ্রনাথের 'রসাভাস' গল্পে পুলিশী দুর্নীতির ছবি আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইদু মিঞার মোরগ' গল্পটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথের গল্পটিতে পুলিশের নারী ভোগের আকাঙ্খা, আর নারায়ণবাবুর গল্পটিতে পুলিশের লালায়িত রসনার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রভেদ এই যে, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পটি সিরিয়াস্ভাবে লেখা; আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটি কৌতুকচ্ছলে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে রচিত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মদন ভস্ম' গল্পে মন্বন্তরের চিত্র মেলে। নারী-পুরুষের মধুর সম্পর্ক ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে বদলে যায়, তার সত্য রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই গল্পে। একমুঠো ভাতের জন্য হাতাহাতি করতেও মাণিক আর মালতীর বাধেনি। এ গল্পে তাই ক্ষুধা নামক জৈব প্রবৃত্তির সামনে প্রেম শুকিয়ে গেছে। নারায়ণ বাবুর গল্পেও মন্বন্তরের চিত্র মেলে এবং আদিম জৈব প্রবৃত্তির দেখাও মেলে বেশ কিছু গল্পে। প্রসঙ্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লুচির উপাখ্যান', 'খড়্গ','নীলা' প্রভৃতি গল্পে মন্বন্তর চিত্রের কথা বলা যায়। আবার তাঁর ঐ 'খড়্গ' গল্পেই অভাবের তাড়নায় বন্ধুর সর্বনাশ করতে বন্ধুর বাধেনা। এখানেও সেই জৈব প্রবৃত্তির জয়জয়কার --'ক্ষুধা।'

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোরাবালি' গল্পে দুর্নীতির চোরাবালি কিভাবে এযুগে মানুষকে গ্রাস করছে, তারই বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনা আছে। এ গল্পে চাকরিতে ইন্ক্রিমেন্টের আশায় বাপ তার মেয়েকে জেনেশুনে অসৎ চরিত্রের পুরুষের হাতে সম্প্রদান করেছে। আবার সেই স্বামী ঘুষ নেবার অপরাধে জেলে যাবার হাত থেকে বাঁচতে, তার থেকে উচ্চপদস্থ অফিসার গোয়েন সাহেবের হাতে নিজের স্ত্রীকে তুলে দিয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাঙা চশমা', 'তীর্থযাত্রা', 'কালো মোটর', প্রভৃতি গল্পে মানুষের নৈতিক অধঃপতন ও দুর্নীতির দেখা মেলে। প্রথমোক্ত গল্পটিতে শিক্ষক-জীবনের দুর্নীতি ও পরের দুটি গল্পে সমাজের নারী-সংক্রান্ত দুর্নীতির কথা আছে। অবশ্য নারায়ণ বাবুর 'সঞ্চার', 'লজ্জা' প্রভৃতি গল্পে নৈতিক অবনমন থেকে উঠে আসার আশাবাদী চিত্রও আছে, যা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পেও দেখা যায়। প্রসঙ্গত নরেন্দ্রনাথের 'সহযাত্রিনী' 'আবিষ্কার' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা যায়। নারী-সঙ্গ-লোভী সতীশের পশুত্ব ও প্রতিশোধস্পৃহা মানবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে 'সহযাত্রিনী' গল্পে অপ্রত্যাশিত স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শে। আর 'আবিষ্কার' গল্পে গুণ্ডা হীরালালও শেষে মায়া-দয়ার কাছে হার মেনে সানন্দে আবিষ্কার করেছে 'দেখলাম আমি মানুষটা নেহাত খারাপ নই।'[৯৯]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পলাতক' গল্পে শ্রীপতি বারবার আত্মহত্যা করতে যায় অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হয়ে। তার জটিল মনস্তত্ত্বে ভয়ানক রস ও অলৌকিকতার বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে। নারায়ণবাবুর 'আত্মহত্যা' গল্পে এমন আত্মহত্যা করার প্রবণতা জেগেছে গল্পের নায়কের। এছাড়া মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে তাঁর 'অপঘাত', 'রিবন বাঁধা ভালুক', 'লাল ঘোড়া' প্রভৃতি গল্পে। আর ভয়ানক রস ও অলৌকিকতার মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর 'পুষ্করা', 'জাগ্রতা' প্রভৃতি গল্পে।

কিন্তু পুত্র কৈশোরে উপনীত হলে পিতা পুত্রের যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তার ছবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মেলে না। অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বন্ধুসঙ্গ', 'গোঁফ' প্রভৃতি গল্পে কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে কিশোর ছেলের কথা বলা, গোঁফ কামানো ইত্যাদি সামান্য ব্যাপার নিয়ে পিতা-পুত্রের মানসিক সংঘাত বেধেছে। পুত্রের বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন পিতার মনোজগতে যে তরঙ্গ তোলে, তার পরিচয় এসব গল্পে আছে। প্রসঙ্গত, একটি কথা উল্লেখ্য যে, এসব গল্পে কিশোর চরিত্র থাকলেও গল্পগুলি কিন্তু কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে রচিত নয়। আর নারায়ণ গঙ্গ্যেপাধ্যায়ের কিশোর গল্প বিশেষভাবে কিশোরদের জন্যই রচিত। সুদীপ বসুর ভাষায়-'বাংলার কিশোর কিশোরীদের মনের আধ কপাটকে পুরোপুরি হাট করে দিলেন তিনি।'[১০০] বয়ঃসন্ধির মানসিক জটিলতা নয়, কৈশোরের দুষ্টুমি, অজানাকে জয় করবার ইচ্ছা তাঁর কলমের ডগায় উঠে এসেছে সহজ সরল কৌতুকের স্পর্শে। তাঁর এই কিশোর গল্পে লেখক হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রভাব কম নয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাষায় 'দুষ্টুমি বুদ্ধি ছিল তার যথেষ্ট। বন্ধুদের নামে সে মজার মজার গল্প বানাত। আমিও বাদ যাইনি আমাকে নিয়েও সে দুটি একটি মিথ্যা মজার গল্প বানিয়ে ছেড়েছে।'[১০১]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের একটি বড় প্রভেদ এইযে - 'নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে জীবন চেতনা ও সংগ্রামের যে তীব্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব।'[১০২] বাস্তবিক, নরেন্দ্রনাথ

মিত্র মনুষ্য-সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে 'মদন ভস্ম' লিখেছেন। কিন্তু এতে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দূরের কথা, নালিশ অবধি নেই; কেবল মন্বন্তরের দরুণ মানুষের সম্পর্ক পশুর সম্পর্কে বদলে যাবার কথা আছে। সংগ্রাম নয়, তাঁর গল্পে জীবনের সুখ - দুঃখ হাসি কান্না ছোট ছোট ব্যথা ক্ষণিকের অনুভবই বড় হয়ে উঠেছে। বর্হিজগতের চেয়ে মনোজগতের বিস্তারই তাঁর গল্পে বেশি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজে গল্প সম্বন্ধে বলেছেন- '.....কয়েকটি নরনারীর ক্ষণিকের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নায় গড়া একেকটি গল্প যেন একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।'[১০৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে কিন্তু জীবন চেতনা ও সংগ্রামের তীব্রতা একই সূত্রে গ্রথিত। তাই 'দুঃশাসন' গল্পে শ্রমিকদের হাতে ধারালো হেঁসো ঝিকিয়ে ওঠে সূর্যের আলোয়, 'হাড়' গল্পে কলকাতার 'কালো আকাশের রঙ আগুনের মতো লাল'[১০৪] হয়ে উঠতে চায়। আসলে জীবনের একটা দিক নরেন্দ্রনাথ প্রায় দেখেনইনি। তাঁর নিজের ভাষায়- 'জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই।'[১০৫] নারায়ণবাবুর মুখে এর একেবারে বিপরীত কথা শোনা যায়। তিনি বলেছেন ' নিজের চোখে না দেখলে জানতেও পারতাম না — সোনার বাংলার আসল চেহারাটা কী।'[১০৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখার মধ্যে এ ধরণের কিছু প্রভেদ থাকলেও, এঁরা দুজনেই কিন্তু রোম্যান্টিক। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্পষ্টই বলেছেন 'আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়।'[১০৭] আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার জোর দিয়ে বলেছেন '......... তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ রোমান্টিক। রোমান্টিক বিষাদ, রোমান্টিক প্রকৃতি দৃষ্টি, রোমান্টিক আদর্শ ও ব্যর্থতার প্রতি তাঁর ঝোঁক স্পষ্ট।'[১০৮] প্রসঙ্গত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রূপ', 'প্রিয়তম', 'অদ্বিতীয়া', প্রভৃতি গল্পের এবং নারায়ণবাবুর 'বন-জ্যোৎস্না', 'হরিণের রঙ', 'শুভক্ষণ' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা যায়। সৌন্দর্য-চেতনা, অনুভবের আবেশে, স্বপ্ন-স্নিগ্ধ মাধুর্যে এঁরা দুজনেই বিশুদ্ধ রোমান্টিক।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম-সাময়িক গল্পকার হলেও তাঁদের জীবন-দর্শন, গল্পের ভাব-এমনকি বিষয় বস্তুতেও চোখে পড়ার মতো স্বাতন্ত্র্য আছে। নির্জনতা-প্রিয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আসলে স্বভাব-শিল্পী ছিলেন। তিনি 'প্রকৃতির রূপ-রস-সুধা আকণ্ঠ পান করতেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।'[১০৯] ক্রমশ রঙ তুলির জগত থেকে সরে এসে তিনি প্রকৃতিকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে। তাই তাঁর 'বনের রাজা' গল্পে মতির দাদু যখন জল থেকে উঠে আসেন তখন তাঁর 'উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হচ্ছিল একটা পুরনো গাছ। ...... দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের গায়ের শ্যাওলা। শ্যাওলা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে।'[১১০] শুধু তাই নয়, দাদু যখন মতির কাঁধের উপর হাত রাখে, দাদুর গায়ের গন্ধ মতির নাকে লাগে। সে ভাবে 'মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম-জামরুলের গন্ধ না, জলের গন্ধ ? শ্যাওলার গন্ধ ? তা-ও না, কোমল মিষ্টি ঠ্যাণ্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা।'[১১১] তাঁর গল্পে প্রকৃতি যেমন ইন্দ্রিয়বেদ্য, তেমনই সংবেদনশীল। তাই, নিতাই বসু যথার্থই বলেছেন 'বাংলা সাহিত্যে একমাত্র জ্যেতিরিন্দ্রই লিখতে পারেন সেকথা, আঁকতে পারেন সেই ছবি ঃ 'গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমাতে পারেনি। অথবা যেন ইচ্ছে করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হলনা।'[১১২] প্রকৃতির সর্বগ্রাসী অনন্ত বিস্তার দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর 'সমুদ্র' গল্পে। এ গল্পে হেনার স্বামীর 'সমগ্র চেতনা জুড়ে সমুদ্র তার রহস্যময় ভয়ঙ্কর বিশালতা নিয়ে উপস্থিত থাকে, হেনা ক্রমশ হারিয়ে যায়।'[১১৩] এমনকি সমুদ্রের পাশে হেনার তুচ্ছতার কথা ভেবে 'একদা সমুদ্রের উন্মত্ত উত্তালতায় বিধ্বস্ত হয়ে হেনাকে তার স্বামী সমুদ্রের কাছে উপহার দিতে উদ্যত হয়।'[১১৪] প্রকৃতির প্রভাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও আছে। কিন্তু তার এমন চরম অনুভববেদ্য সম্মোহনী শক্তি নেই। অবশ্য তাঁর 'বন-তুলসী' গল্পে প্রকৃতির এরকম সর্বগ্রাসী, সম্মোহনী শক্তির অনেকটা দেখা মেলে। এ গল্পে প্রকৃতির যাদু-স্পর্শে মুগ্ধ নায়ক বন-তুলসীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আবিষ্কার করেছে — ' এ বনের যেন শেষ নেই। মনে হতে লাগল এই বন-তুলসীর ঝাড় আদিঅন্তহীন, — যেন কার একটা বিচিত্র যাদুমন্ত্রে এত বড় পৃথিবীটার পাহাড় - সমুদ্র - নগর - গ্রাম সব বন-তুলসীর জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার অতীত জীবন, আমার সভ্যতা, আমার আত্মীয়স্বজন, সব মায়া, সব মিথ্যে। এই জঙ্গল থেকে আমি আর কোনোদিন বেরুতে পারবনা।'[১১৫]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রকৃতি নির্ভর গল্পগুলির শিল্পনৈপুণ্য নির্ণয় করতে গিয়ে নিতাই বসু বলেছেন — ' তাঁর প্রকৃতি-বিষয়ক গল্পগুলোর ভাষা কিঞ্চিৎ কাব্য-অনুসারী, কাঠামো মনস্তত্ত্বমূলক এবং চরিত্রগুলো একটা প্রচণ্ড অসহায়তায় ভোগে।'[১১৬] এই উক্তিটির যথার্থ্য প্রমাণ করতে 'সমুদ্র' গল্পটির কথা বলা যায়। এ গল্পে বর্ণনার ভাষা 'কিঞ্চিৎ' নয়, বেশ কাব্যময় — 'এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছোপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটি যে রং ধরে, আর কাছের জল গৈরিক। উত্তাল অশান্তি ক্ষিপ্ত প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির উপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।[১১৭] আর এ গল্পের কাঠামো অবশ্যই মনস্তত্ত্বমূলক। তাই সমুদ্রের ফেনায় বৌয়ের পা দেখে ঘৃণায় গল্পের নায়কের মনে হয় যেন ' ফুলের গায়ে মাছি।'[১১৮] আর এ গল্পের নায়ক চরিত্র—প্রকৃতির সমুদ্রের দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তির কাছে অসহায় বৈকি । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনতুলসী' গল্পেও নায়কের মনস্তত্ত্ব প্রকৃতির নিষ্ঠুর অথচ দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তির কথা স্বীকার করে। আর এই স্বীকারোক্তির মধ্যেই তার অসহায়তা ধরা পড়ে। আর ভাষাও কাব্যময়তায় নিবিড় — ' কোনদিকে কিছু দেখবার নেই - শুধু উপরে নীল-নিবিড় আকাশ আর তার কোলে শ্বেতপদ্মের উড়ন্ত পাপড়ির মতো ছেঁড়া মেঘের টুকরো।'[১১৯]

কিন্তু ফ্রয়েডিয় যৌন-চেতনার যে প্রকাশ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখায় দেখা যায়, নারায়ণগঙ্গোপাধ্যায়ে তা দুর্লভ। প্রসঙ্গত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গিরগিটি', 'পতঙ্গ' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা চলে। 'গিরগিটি' গল্পে তরুণী মায়ার বৃদ্ধের সঙ্গে 'সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল সংগুপ্ত যৌনকাঙ্ক্ষার উপর।'[১২০] আর 'যৌন-উত্তেজনা একজন নিরীহ সরল তরুণকে কী ভয়ানক হিংস্র করে তুলতে পারে 'পতঙ্গ' গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র একটা অদ্ভুত মুন্‌শিয়ানায় তা বিশ্লেষণ করেছেন।'[১২১] এই দুটি গল্পেই দুশ্চরিত্রা বিবাহিতা রমণীর চিত্র আছে। অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তমস্বিনী' গল্পে যৌন-জটিলতার সূক্ষ্ম চিত্রায়ণ থাকলেও বিবাহিতা রমণীর স্বেচ্ছারিতা নেই, বরং তাদের প্রতি লেখকের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও মমতাই আছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা বা বৈপ্লবিক চেতনা তেমন নেই। প্রকৃতি মনোজগত ও যৌনজগতের মধ্যেই তিনি সাধারণত যাতায়াত করেছেন। ব্যতিক্রম হিসেবে তাঁর 'পার্বতী পুরের বিকেল' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। এ গল্পে কালোবাজারীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে এক যুবক। আর তার শোকাতুর বৃদ্ধ পিতা উন্মাদের মতো তার সমাধিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থেকেছে। এ গল্পটির মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পেও কালোবাজারী ও তার বিরুদ্ধে জেগে ওঠার চিত্র আছে। কালোবাজারীর মর্মান্তিক চিত্র দেখে 'লুচির উপাখ্যান' গল্পে মধ্যবিত্ত যুবকের গলা ঠেলে উঠে আসতে চায় শোষকের ঘরে ঘিয়ে ভাজা লুচির ভার। 'কবর' গল্পে কালোবাজারী করে ফেঁপে ওঠা যুবক ভয় পায় কবরে শায়িত মানুষদের মৃত্যুর কারণ হিসাবে নিজেকে দায়ী বুঝে। আর 'ইতিহাস' গল্পের মতো 'পার্বতীপুরের বিকেল' গল্পটিও ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত; এবং এই দুটি গল্পেও পুত্রশোকগ্রস্ত পিতার কথা আছে। প্রভেদ এই যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পটিতে পিতার শোক প্রবলতর এবং করুণরস সৃষ্টিকারী। অন্যপক্ষে, নারায়ণবাবুর 'ইতিহাস' গল্পে পিতা অমরেশের শোক রাজনৈতিক আর্দশের স্পর্শে ইতিহাসের অগ্নিশুদ্ধি চেতনায় লীন হয়েছে। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পে যে ব্যপ্তি ও গভীরতা আছে, তা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পটিতে দুর্লভ। তাই 'পার্বতী পুরের বিকেল' গল্পটি সম্বন্ধে নিতাই বসু যথার্থই বলেছেন - 'এই গল্পটি একটি রাজনৈতিক গল্প হয়ে উঠতে পারত কিন্তু সময়ের কিছু বিবর্ণ দাগ রেখে যাওয়া ছাড়া তাঁর গল্পে রাজনীতি বা ইতিহাস কখনও সচেতনভাবে উত্থাপিত হয়না।'[১২২] সবশেষে বলি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সাহিত্যের ভূগোল খুবইসঙ্কীর্ণ, রচনায় আঞ্চলিকতার স্বাদ নেই।'[১২৩] আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় উত্তরবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃতি মাটির গন্ধ নিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু চিত্রধর্মিতায়, অনুভবের সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতায় শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁকে অতিক্রম করেছেন।

এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে তাঁর সম-সাময়িক বাংলা ছোটগল্প ও ছোটগল্পকারদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেছেন তা জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি। তিনি বলেছেন. -- 'বাংলা ছোটগল্প তার সমৃদ্ধিতে আজ আন্তর্জাতিক গৌরবের অধিকারী।'[১২৪] তিনি আরও বলেছেন -'ছোট বড়ো লেখকের সমাজ-সচেতন জীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টি প্রতিদিন প্রমাণ করছে যে কঙ্কালের মালা গাঁথা আমাদের নয় -- নতুন সমাজের পলিমাটিতে নবতর প্রাণের ফসল কাটবার জন্যেই আমরা এগিয়ে চলেছি।'[১২৫] সম-সাময়িক কিশোর ছোটগল্পকারদের প্রতিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কিশোর গল্পে কল্লোলোত্তর যুগের কিশোর-গল্পকারদের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সুদীপ বসুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যায়, ...' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সচেতন লেখকের পক্ষে কখনোই প্রভাবের অধীনে থাকা সম্ভব নয়। এমন সৃষ্টিশীল মানুষ শূন্যে ব্যবিলন উদ্যান নির্মাণ করতে পারেন একথা আমাদের মনে রাখতে হবে।'[১২৬] তাই আমরা দেখি কল্লোলোত্তর যুগে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমল দত্তের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর-সাহিত্য একাসনে বসার যোগ্য। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, হেমেন্দ্র কুমারের জয়ন্ত, শিবরামের হর্ষবর্ধন, বিমল দত্তের সিংখুড়ো, বিভূতি মুখুজ্জ্যের গণ্‌শা ও নারায়ণ বাবুর টেনিদা কিশোরদের অতি পরিচিত আপনজন। 'ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ' নামক গল্পে টেনিদার জবানীতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, হেমেন্দ্র কুমার রায়ের জয়ন্ত ও শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধনের প্রভাব সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে। টেনিদাকে তুষ্ট করার জন্য এ গল্পে ঘুঁটেপাড়ার লোকরা যখন তার সঙ্গে প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, হেমেন্দ্র কুমারের জয়ন্ত ও শিবরামের হর্ষবর্ধনের তুলনা করেছে, তখন টেনিদা বলেছে, -- 'ঘনাদা, জয়ন্ত, হর্ষবর্ধনের কথা বলবেন না -- ওঁরা দেবতা -- আমিতো স্রেফ নস্যি। ওঁরা যদি গরুড় পাখি হন, আমি স্রেফ চড়ুই।'[১২৭]

বস্তুত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর-সাহিত্যে কেবল চরিত্রগতই নয়, ঘটনাগত, আঙ্গিকগত ও ভাষাগত প্রভাব পড়েছে এইসব লেখকদের। সমরেশ মজুমদারের মতে, -- 'ঘনাদার মতো অত সাবলাইম না হলেও, টেনিদা ঘনাদারই গোত্রের।'[১২৮] টেনিদা গুলপট্টির রাজা, বাক্‌পটুতায় তুখোড়, সত্যি-মিথ্যে বলে কোন কথা তার ডিক্‌শনারিতে নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার মতোই ইতিহাস - ভূগোল - বিজ্ঞান মিশিয়ে আজগুবী গপ্‌পো বানাতে টেনিদারও জুড়ি মেলা ভার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা' গল্পে মোঙ্গলদের, দাড়ি গোঁফ না থাকার চমৎকার ঐতিহাসিক গল্প খাড়া করেছে টেনিদা। 'টেনিদা আর ইয়েতি' গল্পে টেনিদার কালিম্পং-এ ইয়েতি দেখার গপ্পো -- ইয়েতির অদৃশ্য থাকার রহস্য, বিজ্ঞান - ভূগোল - সবকিছুকে গুলে খেয়েছে। এছাড়া জাপানী,চীনা -- সব ভাষায় টেনিদার জ্ঞান ঘনাদার মতোই প্রখর। এমনকি, তার নিজস্ব কিছু পরিভাষাও আছে। তাছাড়া ঘনাদার তিনটি চ্যালা --- গৌর, শিশির, শিবুর মতন টেনিদার তিনটি সাঙ্গোপাঙ্গো - প্যালা, ক্যাবলা ও হাবুল। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব শিবুর মতোই বুদ্ধিমান নারায়ণবাবুর

ক্যাবলা। আবার ঘনাদার গল্পের কথক ঘনাদার এই সঙ্গীদেরই একজন— শিবু। এদিকে টেনিদার গল্পের কথকও টেনিদারই সাঙ্গো-পাঙ্গোদের একজন— প্যালারাম। সুতরাং কেবল চরিত্রগত নয়, গল্প বলার কৌশলেও এই দুই লেখকের মিল আছে। এমনকি আঙ্গিকগত, ভাবগত ও ঘটনাগত মিলও এঁদের লেখায় আবিষ্কার করা যায়। যেমন 'ঘনাদা নিরুদ্দেশ' গল্পে ঘনাদাকে ধাঁধাঁর সাহায্যে খুঁজে বার কার হয়েছে। আবার 'কম্বল নিরুদ্দেশ' গল্পে টেনিদা ও তার দলবল ধাঁধাঁর সাহায্যে কম্বলকে খুঁজে বের করেছে। স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় - 'রোম্যান্টিকতার মধ্যে দূরাভিসারের যে উদ্দাম একটি আকুলতা আছে - প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা ও কিশোর-সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রয়েছে।'[১২৯] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পগুলিতেও এরকম সুদূরচারী স্বপ্নাকুল রোমাঞ্চ আছে। পটলডাঙা স্ট্রীট থেকে নারায়ণবাবুর মন ছুটে বেড়িয়েছে চীন-জাপানথেকে শুরু করে হনোলুলু পর্যন্ত টেনিদার মারফৎ। বিংশ শতাব্দী থেকে নবাবী যুগে, এমনকি হ্যামলিনের বাঁশিওলার রূপকথার জগতেটেনিদার কল্পনা যাতায়াত করেছে অনায়াসে। আর নারায়ণবাবুর টেনিদাতো ঘনাদাকে সসম্ভ্রমে উচ্চাসণে ছেড়ে দিয়ে বলেছে, - ' কী বললি, প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা? কীযে বলিস। তার পায়ের ধুলো একটু মাথায় নিতে পারলে বর্তে যেতুম রে।'[১৩০]

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কিশোর-গল্পের রোমাঞ্চও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মেলে। চারমূর্তি তাই বারবার এ্যাডভেঞ্চারের পথে পা বাড়ায়। আর জয়ন্তর মতোই টেনিদা বিপদের সময় ভয়-ভাবনা ভুলে দুঃসাহসী হয়ে উঠে নেতার আসন গ্রহণ করে। প্রসঙ্গ ত 'চারমূর্তি উপন্যাসের কথা বলা চলে। এ গল্পে ঘচাংফুর পাল্লায় পড়ে টেনিদা বাঘের মতো গর্জন করে বলে — 'হয় হাবুল সেনকে উদ্ধার করে ফিরে যাব -- নইলে এ পোড়া প্রাণ রাখবনা।'[১৩১]

চেহারাতেও টেনিদা এবং জয়ন্তর সাদৃশ্য প্রচুর। জয়ন্তর মতোই টেনিদার লম্বা-চওড়া, পেশীবহুল চেহারা। আর গায়ের জোরেও সে জয়ন্তর চেয়ে কম যায় না। 'গড়ের মাঠে গোরা ঠ্যাঙানোর'[১৩২] জন্যে টেনিদা বিখ্যাত। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, টেনিদার অ্যাডভেঞ্চারে ভয় নেই, রোমাঞ্চ আর হাস্যরস দিব্যি মিলেমিশে আছে। তাই বন্দী অবস্থাতেও চারমূর্তি নিশ্চিন্তে রসগোল্লার হাঁড়ি সাফ্ করে। আর হেমেন্দ্র কুমারের গল্পে ভীতি উৎকণ্ঠা জড়িয়ে থাকে ছত্রে ছত্রে।

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পে শিবরাম চক্রবর্তীর প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, শিবরাম চক্কোত্তির মতোই ভাষার প্যাঁচে, শব্দ প্রয়োগের কৌশলে কিশোর সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা বইয়েছেন নারায়ণবাবু। বিশেষত শব্দালঙ্কারের ক্ষেত্রে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতির রসাত্মক ব্যবহারে এঁরা উভয়েই সিদ্ধহস্ত।

তবে শিবরামের লেখায় পান্ করবার প্রবণতা এত বেশি যে, নারায়ণবাবুর শব্দচাতুর্যের পাশে এই 'শিব্রামী পান্ অনেক সময়েই কুস্তির প্যাঁচ টোকা কসরৎ মনে হয়'[১৩৩] বলে সুদীপ বসু জানিয়েছেন।

আবার সমরেশ মজুমদার বলেছেন 'নারায়ণবাবুর এ সব গল্পে চরিত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় চ্যাংড়ামো ও ফাজলামিতে শিবরামকে মনে আসতে পারে। এমনকি, হাল্কা রসের পরিবেশন ভঙ্গিতে পি. জি. উডহাউস, মার্কটোয়েন বা জেরোম কে জোরোমের কথাও মনে আসতে পারে।'[১৩৪] শিবরামের কিশোর গল্পগুলিতে কাহিনী তেমন জোরালো নয়, বাক্চাতুর্যই প্রধান। অন্যপক্ষে নারায়ণবাবুর লেখায় কিন্তু কাহিনীকে রসালো করতেই বাক্চাতুর্যের খেলা। স্বয়ং শিবরাম চক্তবর্তী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের সঙ্গে নিজের লেখার তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন 'ছোটদের জন্যে আমিও কমবেশি হাসির লেখা লিখেছি বটে কিন্তু সেসব নারাণবাবুর লেখায় কাছে দাঁড়াতেই পারেনা --- একথা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে। তাঁর লেখা শুরু হত কোনো মার প্যাঁচ না কষেই, কথার কোনো পাঁয়তারা না ভেঁজেই বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা ছিলনা সেসব লেখায়, কায়দা কেরামতি কসরৎ দেখানোর কোনো প্রয়াস নয়। আর কত সহজে কেমন অবলীলাক্রমে শেষ হয়ে যেত, আর কীরকম মজা লাগত যে পড়তে, কী বলব। অত সহজে অত মজার লেখা আমি লিখতে পারিনা।'[১৩৫] তিনি আরও বলেছেন— 'আমার ভাগনে ভাগনীদের মুখে শুনতে হয় টেনিদার মতন তুমি লিখতে পারোনা, মামা। আর তাঁদের সঙ্গে আমি একেবারে একমত। পারিনা আমি সত্যিই। কারণ আর কিছুই নয়, তিনি লিখতেন প্রাণ দিয়ে আর আমি লিখি প্রাণের দায়ে।'[১৩৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পের সঙ্গে প্রেমেন মিত্র ও শিবরামের তুলনা করতে গিয়ে ধীরেন্দ্রলাল ধর যে উক্তিটি করেছেন, তার যথার্থ্য তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। তিনি বলেছেন- 'শিবরামবাবুর হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন হালকা হাসির ব্যাপার এবং প্রেমেন্দ্র বাবুর ঘনাদা গম্ভীর হাসির ব্যাপার। আর নারায়ণবাবুর টেনিদা এই দুইয়ের মাঝামাঝি, চপল হাসির ব্যাপার।'[১৩৭]

পরশুরামের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর কিছু কিশোর গল্পে দলে দলে গজিয়ে ওঠা নব্য লেখক সম্প্রদায়ের প্রতি হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল, বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ করেছেন। প্রসঙ্গত পরশুরামের 'কচি-সংসদ, 'রামধনের বৈরাগ্য', 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' এবং নারায়ণবাবুর 'কবিতার জন্ম', 'ভজরামের প্রতিশোধ', 'হারপুন', 'দুরন্ত নৌকাভ্রমণ' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা বলা চলে। তবে একটা কথা অবশ্য মনে রাখা কর্তব্য যে, পরশুরামের মতো ব্যঙ্গের তীব্র ধার নারায়ণবাবুর এসব গল্পে নেই, বরং নির্মল কৌতুকরসই এতে প্রধান হয়ে উঠেছে। পরশুরামের লেখা যদি কুঠার হয়, তবে এযেন ক্লাসের নির্বোধ একগুঁয়ে ছাত্রকে দুষ্টু ছেলের আঙুলের খোঁচা দিয়ে বিরক্ত করে রাগাবার ছেলেমানুষী আনন্দ।

উৎসপঞ্জী

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ঃ 'দেশ' সাহিত্য পত্রিকা ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃঃ ৮৯৫

২। সমরেশ মজুমদার ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' প্রঃ প্রঃ ১৯৮৬, পৃঃ ২৯০

৩। ঐ পৃঃ ১৮৭

৪। প্রমথনাথ বিশী ঃ 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' প্রঃ প্রঃ ১৩৬১, পৃঃ ৫৭

৫। ঐ পৃঃ ৭

৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ছোটগল্প এবং এ যুগ'ঃ তাপসরঞ্জন পাল সম্পাদিত 'দাগ' পত্রিকা, ৮ম সংখ্যা ১৩৭৩, পৃঃ ২৫

৭। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ 'কল্লোল যুগ' প্রঃ প্রঃ ১৩৫৭, পৃঃ ২৯০ থেকে সংগৃহীত

৮। ঐ পৃঃ ঐ

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'রবীন্দ্রোত্তর'ঃ 'সুনন্দর জার্নাল' প্রঃ প্রঃ ১৩৪৮ পৃঃ ২৮

১০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আমার কথা' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬

১১। ডঃ শিখা ঘোষ সম্পাদিত 'সেরা মাণিক' এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৯

১২। মাণিক বন্দোপাধ্যায় ঃ 'দুঃশাসনীয়' ঃ ডঃ শিখা ঘোষ সম্পাদিত 'সেরা মাণিক' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৯

১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পের মুখবন্ধে আশা দেবীর রচিত কবিতা; রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬

১৪। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ঃ ছোটগল্প, প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৯৩।

১৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' ঃ রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২ পৃঃ ৩৬৩

১৬। ডঃ গোপিকা রায়চৌধুরী ঃ 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য' প্রঃ প্রঃ ১৩৮০, পৃঃ ৩৪৬

১৭। ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৮৪

১৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' ঃ রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২, পৃঃ ৩৬৯

১৯। ঐ পৃঃ ৩৭৫

২০। মাণিক বন্দোপাধ্যায় ঃ 'সরীসৃপ' ঃ শিখা ঘোষ সম্পাদিত 'সেরা মাণিক' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৯

২১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' ঃ রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২, পৃঃ ৩৭৩

২২। ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫০৩

২৩। সুস্নাত দাশ ঃ 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৯২, পৃঃ ৭২

২৪। ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫২৪

২৫। ঐ পৃঃ ৫৩৪

২৬। নির্মলেন্দু ভৌমিক ঃ ' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গ' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ১৩১

২৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা গল্পবিচিত্রা' ঃ রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ১৩৯২,পৃঃ ৩৫৪

২৮। ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৩৩

২৯। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'তারাশঙ্করের ছোটগল্প'-এর ভূমিকা

৩০। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭, পৃঃ ২৬০

৩১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' ঃ রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২, পৃঃ ৩৪৯।

৩২। ঐ পৃঃ ৩৪৯

৩৩। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩; পৃঃ ২১

৩৪। ডঃ সরোজমোহন মিত্রঃ 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা' প্রঃ প্রঃ ১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ পৃঃ ২২৪

৩৫। শ্রী ভূদেব চৌধুরী ঃ ' বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৩৩ থেকে সংগৃহীত

৩৬। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩ পৃঃ ২২

৩৭। ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৩৩

৩৮। ঐ পৃঃ ৫৩৯

৩৯। সূত্র — অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নিজের দিকে ফিরে' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৯৯২; পৃঃ ২৩

৪০। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ঃ 'ডাইনী'ঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'গল্পপঞ্চাসৎ' প্রঃ প্রঃ ১৯৬৩, পৃঃ ৩৬৫

৪১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বনজ্যোৎস্না' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ১৩৮৭, পৃঃ ৪৯৭

৪২। শ্রীভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ৫৩৮

৪৩। ঐ পৃঃ ৫৩৮

৪৪। ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য' প্রঃ প্রঃ ১৩৮৩, পৃঃ ৩৬৪

৪৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী ঃ ' বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৩৭

৪৬। ঐ পৃঃ ৫৩৭

৪৭। ঐ পৃঃ ৫৩৭

৪৮। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা; প্রঃ প্রঃ ১৩৬১, পৃঃ ১৩

৪৯। ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা' প্রঃ প্রঃ ১৯৬৪, পৃঃ ২২৫ থেকে সংগৃহীত

৫০। ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৩৮

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'বর্ষাযাপন' ঃ 'সঞ্চয়িতা' প্রঃ প্রঃ ১৩৩৮

৫২। ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা', প্রঃ প্রঃ ১৯৬৪, পৃঃ ২৬২

৫৩। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩; পৃঃ ১৭

৫৪। ঐ পৃঃ ১৯

৫৫। রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত তারাশঙ্করের-'গল্পপঞ্চাশৎ' এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৯৬৩, পৃঃ ৫৬

৫৬। শ্রীভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৪৩১

৫৭। প্রণব মিত্র ঃ 'কবিতার ভাবনা ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ১৩৯৮, পৃঃ ৩৬৮

৫৮। শ্রীভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৪৩১

৫৯। ঐ পৃঃ ৪৩২

৬০। ঐ পৃঃ ৪৩০ থেকে সংগৃহীত

৬১। ঐ পৃঃ ৪৪৩

৬২। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭, পৃঃ ২৬২

৬৩। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' প্রঃ প্রঃ১৩৬৭, পৃঃ ৩১৬

৬৪। বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 'মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠগল্প' এর 'সম্পাদকীয়' অংশের তিন নং অধ্যায় থেকে সংগৃহীত, প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৭৮ পৃঃ ৩

৬৫। ঐ পৃঃ ৪

৬৬। শ্রীভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ওগল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৭০৬

৬৭। দীপক চন্দ্র ঃ 'মনোজ বসু ও বাংলা সাহিত্য ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শ্রাবন-আশ্বিণ ১৩৭৭, পৃঃ ২৬৬

৬৮। ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ৭০৬ থেকে সংগৃহীত

৬৯। ভবানী মুখোপাধ্যায় ঃ 'কাছে বসে শোনা' ঃ 'অমৃত' পত্রিকা ১৯শে কার্তিক, ১৩৭২

৭০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১, পৃঃ ১৮

৭১। বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ৮৪

৭২। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৩৬১, পৃঃ ৫

৭৩। ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৭০৬

৭৪। ঐ পৃঃ ৭০৬

৭৫। ঐ পৃঃ ৭০৮

৭৬। ঐ পৃঃ ৭১১

৭৭। ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সংস্করণ ১৩৬৯,

৭৮। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'মনোজ বসুর গল্প সংগ্রহ'-এর ভূমিকা থেকে সংগৃহীত

৭৯। মানস মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর চিত্র' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত ' সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৪২১

৮০। দীপক চন্দ্র ঃ 'মনোজ বসু ও বাংলা সাহিত্য' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ১৩৭৭ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃঃ ২৬৬

৮১। ঐ পৃঃ ২৬৬

৮২। মানস মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর চিত্র' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা, মাঘ - চৈত্র ১৩৯৮

৮৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ 'মনোজ বসু - কথকতা ও শিল্প' ঃ 'শনিবারের চিঠি' সারস্বত সংখ্যা ৪২শ বর্ষ পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭৬

৮৪। ভূদেব চৌধুরী ' বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৭১৫

৮৫। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১, পৃঃ ৬

৮৬। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প' এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৩৫৬, পৃঃ ২

৮৭। ঐ পৃঃ ৪

৮৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নীলা' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫৩৮

৮৯। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প' এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৩৫৬, পৃঃ ৬

৯০। ঐ পৃঃ ৬

৯১। ঐ পৃঃ ১০

৯২। ঐ পৃঃ ১১

৯৩। ঐ পৃঃ ১৩

৯৪। ঐ পৃঃ ১৪

৯৫। ঐ পৃঃ ১৬

৯৬। ঐ পৃঃ ১৭

৯৭। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়'ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা অগ্রহায়ণ পৌষ ১৩৭৭, পৃঃ ২১৬

৯৮। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ ' কুমার সম্ভব' ঃ অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত 'গল্পমালা ৪' প্রঃ প্রঃ ১৯৯৪, পৃঃ ২০

৯৯। ঐ পৃঃ ১৭২

১০০। সুদীপ বসু ঃ 'টেনিদা - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং' ঃ তাপস ভৌমিক প্রমুখ সম্পাদিত 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা ১৯৯২, পৃঃ ৭৩

১০১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭ পৃঃ ২১৬

১০২। ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা' প্রঃ প্রঃ১৯৬৪, পৃঃ ২৫৭

১০৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'গল্পমালা ৪' ঃ 'নিবেদন' অংশ থেকে গৃহীত; প্রঃ প্রঃ ১৯৯৪

১০৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হাড়' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ রথযাত্রা ১৩৮৬ পৃঃ ৫২৭

১০৫। ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা' প্রঃ প্রঃ ১৯৬৪, পৃঃ ২৫৪ থেকে সংগৃহীত

১০৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ঃ 'দেশ' সাহিত্যপত্রিকা ২০ শে পৌষ, ১৯৬৯ পৃঃ ৮৯৫

১০৭। ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা' প্রঃ প্রঃ ১৯৬৪, পৃঃ ২৫৪ থেকে সংগৃহীত

১০৮। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ১৩৭৭ শ্রাবণ-অশ্বিন, পৃঃ ২৫৪

১০৯। নিতাই বসু সম্পাদিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৯৮৯ পৃঃ ৭

১১০। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ঃ 'বনের রাজা' ঃ নিতাই বসু সম্পাদিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' প্রঃ প্রঃ ১৯৮৯, পৃঃ ৭৬

১১১। ঐ পৃ-ঃ ৭৭

১১২। ঐ ভূমিকা পৃঃ ২৫

১১৩। ঐ পৃঃ ২৬

১১৪। ঐ পৃঃ ২৬

১১৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ 'বনতুলসী' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খন্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭, পৃঃ ৫২০

১১৬। নিতাই বসু সম্পাদিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৯৮৯, পৃঃ ২২

১১৭। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীঃ 'সমুদ্র'ঃ নিতাই বসু সম্পাদিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' প্রঃ প্রঃ ১৯৮৯, পৃঃ ২৪

১১৮। ঐ পৃঃ ৩১

১১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়. ঃ 'বনতুলসী' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খন্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭, পৃঃ ৫২০

১২০। নিতাই বসু সম্পাদিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প'-এর ভূমিকা প্রঃ প্রঃ ১৯৮৯, পৃঃ ২১

১২১। ঐ পৃঃ ১৯

১২২। ঐ পৃঃ ১৬

১২৩। ঐ পৃঃ ২৭

১২৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়.ঃ 'ছোটগল্প এবং এযুগ' ঃ তাপসরঞ্জন পাল সম্পাদিত 'দাগ' সাহিত্য সিনেমার সচিত্র মাসিক পত্রিকা, ৮ম প্রকাশ ১৩৭৩, পৃঃ ২৬

১২৫। ঐ পৃঃ ২৫

১২৬। সুদীপ বসু ঃ 'টেনিদা-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং' ঃ সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত 'কোরক' পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ৭৫

১২৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ 'ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ'ঃ সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ২য় খন্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৮১, পৃঃ ৩৬

১২৮। সমরেশ মজুমদার ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' প্রঃ প্রঃ ১৯৮৬, পৃঃ ১৭

১২৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা গল্প বিচিত্রা'ঃ রচনাবলী ৯ম খন্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২, পৃঃ ৩৪১

১৩০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা' ঃ সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ২য় খন্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৮৪, পৃঃ ২৯

১৩১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'চারমূর্তি' ঃ 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খন্ড প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮, পৃঃ ২৩২

১৩২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়.ঃ 'মৎস্যপুরাণ' ঃ 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খন্ড, ১৯৭৮, পৃঃ ৯

১৩৩। সুদীপ বসু ঃ 'টেনিদা-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ৭৯

১৩৪। সমরেশ মজুমদাব.ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' প্রঃ প্রঃ ১৯৮৬ পৃঃ ১৭

১৩৫। শিবরাম চক্রবর্তী ঃ 'লেখক মানুষদের মধ্যে এক মানুষ লেখক'ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ পৌষ ১৩৭৭ পৃঃ ২১৩

১৩৬। ঐ পৃঃ ২১৩

১৩৭। ধীরেন্দ্রলাল ধর ঃ 'নারায়ণবাবু' ঃ ঐ পৃঃ ২৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ঃ বিষয় অনুযায়ী ছোটগল্পের বিভাগ ঃ আলোচনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়কর। কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমকালের বিষয়গুলি নয়, যুগ-নিরপেক্ষ যেকোন তুচ্ছ বিষয়ও তাঁর ছোটগল্পে অনায়াসে স্থান পেয়েছে। ছোটগল্পের চিরন্তন বিষয়বস্তুকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে উপযুক্ত মর্যাদা দান করেছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন মন্বন্তরের 'হাড়' চোষার বুভুক্ষুতা থেকে 'ট্যাক্সিওয়ালা'র সামান্য সাধ, 'বনজ্যোৎস্না'য় ভেসে যাওয়া বন-বালার প্রেম তার চিরন্তন সাহিত্য-মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কখনো ক্লেদাক্ত সমাজের 'বীতংস'তে নারীর 'ইজ্জৎ' বাঁধা পড়েছে, কখনো রায়-বাহাদুরের 'টোপ'-এ বিকৃত উচ্চবিত্তের বীভৎস শখের উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, আবার নীতিচ্যুত মানবের চেতনায় হয়েছে আদর্শবাদিতার 'সঞ্চার', কখনোবা মানসিক জটিলতা 'সেই পাখিটা'র রূপকে উড়ে গিয়ে বসেছে 'শেষচূড়া'য়। এককথায় বলা চলে, সমকালীন সমাজ-সমস্যা, রাজনৈতিক-চেতনা, দার্শনিকতা, বাস্তবতা, রোম্যান্টিকতা, ইতিহাসবোধ, মানসিক জটিলতা প্রেম, প্রকৃতি--সবই তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। 'দুঃশাসন' গল্পে বস্ত্রসঙ্কট, 'হাড়' গল্পে মন্বন্তর, 'কালো জল' গল্পে নারী পাচারের সামাজিক চক্রান্ত, 'নীলা' গল্পে শ্রমিক-বিপ্লবের রাজনৈতিক আভাস, 'ভাঙা-চশমা' গল্পে শিক্ষা-জগতের আদর্শচ্যুতি, 'খড়্গ' গল্পে শোষক-শ্রেণীর হাতে উদ্যত খড়োর রক্ততৃষ্ণা, 'ইতিহাস' গল্পের ইতিহাস-চেতনা, 'ভাঙাবন্দর' গল্পে নূতন ও পুরাতন যুগের টানা-পোড়েন, 'অমনোনীতা' গল্পের মনতাত্ত্বিক জটিলতা --- এসব বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্প সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের এই বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুস্নাত দাশ বলেছেন 'নিম্নমধ্যবিত্ত, দাঙ্গা দেশবিভাগের বলি লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, ছিন্ন মানুষ, গ্রামবাংলার ক্ষেতমজুর, তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু কৃষক, চটকলের শ্রমিক কিছুই নারায়ণবাবুর সাহিত্য সৃষ্টির বাইরে নেই।'[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে এত বিষয়-বৈচিত্র্য থাকলেও, তাঁর গল্প কিন্তু কখনো বিষয়-সর্বস্ব এবং পরস্পর ভাবের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এইযে, দার্শনিকতা, বাস্তবতা, রোম্যান্টিকতা, ঐতিহ্য-প্রীতি, ব্যঙ্গপ্রিয়তা, সাঙ্কেতিকতা তাঁর গল্পগুলিতে রচনার স্বধর্ম বজায় রেখেও আশর্চ্য নিপুণতায় মিশে গেছে। রাজনীতির কূটকৌশল, বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র, মনস্তত্ত্বের জটিল রূপরেখা --অর্থাৎ বাস্তব জগত ও মনোজগতের বিচিত্রগতি, কখনোই একটি আর একটির পথ রুদ্ধ করেনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের পটভূমিই বা কত বিচিত্র। তাঁর 'হাড়', একটি শত্রুর কাহিনী', 'কবর' প্রভৃতি গল্পের পটভূমি হল যুদ্ধ। 'বনজ্যোৎস্না, 'বনতুলসী' প্রভৃতি গল্পে আবার প্রকৃতিই পটভূমি রচনা করেছে। ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক বৈষম্যের পটভূমিতে তিনি 'খড়গ', ডিম' 'হাড়' প্রভৃতি গল্পকে দাঁড় করিয়েছেন। 'বীতংস', পুস্করা' 'হাড়' প্রভৃতি গল্পের পেছনে আবিস্কার করা যায় অশিক্ষিত মানুষের কুসংস্কারের পটভূমি। কখনোবা নারী-লোলুপতার পটভূমিতে তিনি লিখেছেন 'তীর্থযাত্রা' ছলনাময়ী', 'খড়্গ', 'বনজ্যোৎস্না' প্রভৃতি গল্প। আবার বিপ্লবের পটভূমিতে রচনা করেছেন 'ইতিহাস' (৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন), 'বন-জ্যোৎস্না' (৪২-এর বিপ্লব), 'নিশাচর' (স্বদেশী, কম্যুনিজম) প্রভৃতি গল্প। তাঁর 'একটি চিঠি', 'বনজ্যোৎস্না', 'লক্ষ্মীর পা' প্রভৃতি গল্পের পটভূমি রচনা করেছে রোম্যন্টিসিজম্ প্রেম। আবার ইতিহাসের পটে তিনি লিখেছেন 'ইতিহাস', 'ভাঙা বন্দর' প্রভৃতি গল্প। তাঁর গল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য বা গুণ এইযে, রচনাগুলি অশ্লীলতা দোষ মুক্ত। সংযত শালীন ভাষায় তিনি মানব-জীবনের বিচিত্র দিকগুলি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সৃষ্ট সমাজ-বিকৃতি, মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার অবক্ষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতো তাঁর কলমের মুখে যেমন এসেছে, তেমনি এই বাস্তব পঙ্গুতার পাশে তিনি আশ্চর্যভাবে রোম্যান্টিকতাকে স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর লেখা এক অনন্য বিশিষ্টতা নিয়ে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তাঁর গল্পের গঠন-শৈলীতে সমারসেট মম ও ও. হেনরির প্রভাব দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে অলোক রায় বলেছেন -- 'বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এঁদের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো মিল নেই। কিন্তু তিনিও মনে হয় 'চাবুক হাঁকড়ানো' সমাপ্তির পক্ষপাতী।'[২] প্রসঙ্গত 'তৃণ' গল্পের শেষে অকস্মাৎ পাইকার কিভাবে তার স্বাথসিদ্ধি করতে বসিরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, তা মনে পড়ে। 'টোপ' গল্পের শেষে আচমকা মানব-শিশুরূপী টোপের স্বরূপ দেখে শিউরে উঠতে হয়।

আজীবন অধ্যাপনায় রত থাকায় শিক্ষকদের জীবনকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। তাই শিক্ষক-সম্প্রদায়ের জীবন-কথাকে পরম শ্রদ্ধায় ও মমতায় তাঁর গল্পে উপন্যাসে নানাভাবে স্থান দিয়েছেন। তাঁর আত্ম অভিজ্ঞতা - প্রসূত এইসব লেখা থেকে তদানীন্তন শিক্ষকদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার গভীরে প্রবেশ করা যায়। যেমন 'ভাঙা চশমা' গল্পে গরিব স্কুল-মাস্টারের হাকিমির মোহ, আবার ঐ গল্পেই আদর্শ স্কুল-মাষ্টারের স্বপ্নভঙ্গে উন্মাদে পরিণত হওয়া। এই দুই শ্রেণীর শিক্ষককেই তিনি দেখিয়েছেন — এক শ্রেণী নীতিচ্যুত, ব্রতচ্যুত এবং তৎজনিত কারণে বিবেক পীড়িত শিক্ষক, অন্য শ্রেণী আদর্শনিষ্ঠ, ছাত্র-প্রেমিক শিক্ষক। নারায়ণবাবুর 'সঞ্চার' গল্পে আমাদের অতি-পরিচিত আদর্শবান, দরিদ্র, স্কুল-মাষ্টারের চিত্র মেলে। এই ধরনের শিক্ষকরা পড়ায় ফাঁকি দিতে শেখেননি, মূল্যবোধের দাম — নীতির দাম আজও তাঁদের কাছে অর্থের চেয়ে বেশি; অথচ দারিদ্র্যহেতু অর্থলাভের সম্ভাবনায় তাঁরা

পুলকিত হন। ছাত্রদের গৌরবেই তাঁরা গৌরবান্বিত এবং ছাত্রদের বিশ্বাস করতে তঁদের মত ভালমানুষদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়না। এইসব সৎ, সহজ-সরল শিক্ষকদের প্রলোভিত ও প্রবঞ্চিত করা তাই খুব সহজ। এভাবে বিভিন্ন গল্পে দরিদ্র, নিরীহ, সৎ শিক্ষকের ছবি এঁকেছেন নারায়ণবাবু। তাঁর লেখার আরেকটি বিশিষ্টতা হল এইযে, তাঁর গল্পে বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে উত্তরবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের পটভূমি। এই পটভূমির আঞ্চলিকতা তাঁর গল্পে এক আঞ্চলিক স্বাদ এনেছে। প্রসঙ্গত 'তৃণ', 'জন্মভূমিশ্চ', 'কালো জল', 'তীর্থযাত্রা' প্রভৃতি গল্পে পূর্ববঙ্গের মেঘনা নদীর পটভূমি এবং 'বনজ্যোৎস্না' 'টোপ', 'ডিম', 'সেই পাখিটা', 'জান্তব', 'কুয়াশা', 'কাণ্ডারী' প্রভৃতি গল্পে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী পটভূমির কথা উল্লেখ করা যায়। তবে এ প্রসঙ্গে একথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, সঙ্কীর্ণ অর্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আঞ্চলিক বলা যায়না।

প্রকৃতি তার নিজস্বতা নিয়ে নারায়ণবাবুর লেখায় গভীরতা, ব্যাপ্তি ও লাবণ্য দান করেছে। মহানন্দার উদার বিস্তৃতি, কৃষ্ণচূড়ার আরক্তিম আনন্দোচ্ছ্বাস কেয়াকুলের গন্ধের মাদকতা, বন-তুলসীর আদিম আচ্ছন্নতা তাঁর লেখায় এক অন্য মাত্রা সংযোজিত করেছে। তাঁর রচনায় সঙ্গীত, প্রকৃতি, মানবাত্মা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর সুরের পরিবেশের এক অপূর্ব মায়ালোক সৃষ্টি করে তিনি গল্পের পরিধিকে বহুদূর প্রসারিত করে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন।

চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর অভিনবত্ব লক্ষনীয়। প্রবঞ্চক, শঠ, লোভী মানুষের চরিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি নিরীহ সৎ মানুষের অসহায় চিত্রকেও জীবন্ত করে তুলেছেন। নারীর কোমল হৃদয়বত্তা, হীনতাবোধ ও বঞ্চনা-জনিত প্রতিহিংসার নিষ্ঠুরতা — সবকিছুকেই তিনি উপযুক্ত চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। 'বীতংস' গল্পের প্রবঞ্চক সাধু সুন্দরলাল, 'হাড়' গল্পের শখের ধনী রায়বাহাদুর, 'টোপ' গল্পের বিকৃত ধনতান্তিক সমাজের শখের শিকারী নিষ্ঠুর রাজাবাহাদুর, 'নক্রচরিত'-এর কালোবাজারী নিশিকান্ত, এ যুগের 'দুঃশাসন' দেবীদাস, 'একটি শত্রুর কাহিনী'তে ভারতপ্রেমিক হ্যানস্, মিঞাকি টোড়ির সুরে দিবানা 'উস্তাদজী', 'পুষ্করা' গল্পে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দক্ষিণালোভী পুরোহিত তর্করত্ন, 'দুর্ঘটনা' গল্পে প্রতিহিংসাময়ী নারী মিস্ ইন্দিরা, 'ভাঙা চশমা' গল্পে আদর্শচ্যুত শিক্ষক, 'ইতিহাস' গল্পে ইতিহাসবোধ-দীপ্ত, পুত্রকে হারিয়েও নীলকণ্ঠের মতো নিরাসক্ত অমরেশ — ইত্যাদি বিচিত্র চরিত্রকে নারায়ণবাবু তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীমুখে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মতাদর্শ, চিন্তা-ভাবনা এবং রোমান্টিকতার ছাপ ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্পগুলিতে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নারায়ণবাবু বলেছেন, - 'প্রত্যেক লেখকের প্রতিটি গল্পই কোনো না কোনো দিক থেকে তার আত্ম-আরোপ।'[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পই মধ্যবিত্তকে নিয়ে রচিত। মধ্যবিত্ত-জীবনের সংকট, আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ তাঁর গল্পের সিংহভাগ জুড়ে আছে। ইতিহাস', 'বাইশে শ্রাবণ', 'ভাঙা চশমা', 'অপঘাত', 'ধস', 'তাস', হরিণের রঙ', 'নতুন গান', 'কেয়া', একটি চিঠি', 'রেকর্ড', 'শুভক্ষণ', 'কালো মোটর', 'হলদে চিঠি', ইত্যাদি অসংখ্য গল্পে তিনি মধ্যবিত্তের জীবনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং বলেছেন তাঁর 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' প্রবন্ধে - 'লেখকরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবেনা।'[৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সীমাবদ্ধতা কেবল এই যে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সময় গল্প রচনা করেছেন, এবং সেক্ষেত্রে কখনো কখনো গল্প-রস অপেক্ষা আদর্শের প্রচারধর্মিতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবু তাঁর অধিকাংশ গল্পই রসবোধে গভীর এবং একইসঙ্গে আদর্শে অটল।

বীরেন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, নারায়ণবাবুর অল্প বয়সের লেখায় মোপাসাঁ ও চেকভের প্রভাব আছে এবং 'ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথ, গোর্কি, টলষ্টয় তাঁকে মুগ্ধ করেছে, বিশেষ করে আকর্ষণবোধ করেছেন লরেন্সের রচনায়, গ্রাহাম গ্রীণ, মম, বেটস্, ক্যাথারিন,ম্যানসিফিউড তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন তখন। বেশী বয়সে হেমিংওয়ে, ফক্‌নার তাঁকেবেশ কিছু সময় ধরে রাখে।'[৫] তবু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু সচেতনভাবে এঁদের কারোর দ্বারা প্রভাবিত হননি। নিজের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও কল্পনা-শক্তি নিয়ে তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর গল্প-রচনার মূলে তিনটি সূত্র কাজ করেছে সবসময় - মানবপ্রেম, আশাবাদ ও কাল-চেতনা। বস্তুত শোষিত মানবের বেদনা দেখেই তাঁর লেখনীতে সাম্যবাদী বিপ্লবের আশা ধ্বনিত হয়েছে। আর সুচিত্রা সেনচন্দ্রের ভাষায় — 'মানবিক সংবেদনশীলতায় সান্দ্র তাঁর ছোটগল্প হয়ে উঠেছে সময়ের বিশ্বস্ত দলিল।'[৬] তাঁর এই কাল-চেতনা কেবল সম-সাময়িক যুগের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, ইতিহাসবোধে দীপ্ত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় — 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সদা-প্রবুদ্ধ ঐতিহাসিক চেতনা এই সুদূর মহিমান্বিত অতীতকে বাঁচাইয়া তুলিয়া আধুনিক জীবনে ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অথচ নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল প্রভাবটি পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছে।'[৭]

সমালোচক নৃপেন্দ্র গোস্বামী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার সমালোচনা করে বলেছেন '..... নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও রোমন্টিক বাধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, বোধহয় পারবেননা যদিনা কাব্য ঘেঁষা আঙ্গিক, ভঙ্গী এবং দৃষ্টিকোণকে তাড়াতাড়ি সময় থাকতে বদলে ফেলেন,'[৮]

একথা সত্য যে, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মতো নৈর্ব্যক্তিক বলিষ্ঠ বাস্তববতা নারায়ণবাবুর লেখায় তেমন নেই, রোম্যান্টিক আবেগ অনেক সময় এর পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গোপাল হালদার যথার্থই বলেছেন — 'এ লেখকের মনের একটা ধর্ম আছে।

তা রোমান্টিক, কিন্তু সে আকাশচারী বা বাতাসবাহী সাহিত্য বিলাস মাত্র নয়।'[৯] তাই 'দক্ষিণান্ত' গল্পে কৈশোর-প্রেমের স্মৃতি-মথিত আবেগ বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যের তলায় চাপা পড়ে যায়, আবার 'কেয়া' গল্পে নিষ্ঠুর বাস্তব চক্রান্তের শিকার হয়েও নায়ক কেয়াফুলের মদির ঘ্রণে রোমান্টিক স্বপ্ন দেখে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য এইযে, 'জীবন ও জগৎকে দেখবার মত অতন্দ্র-জাগ্রত দুটি চোখ আছে লেখকের, আর আছে খাপ-খোলা তলোয়ারের মত ঝকঝকে গল্প বলার ভাষা। চরিত্র ও বিষয়বস্তুর বিস্ময়কর বৈচিত্র্য, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে উপলব্ধি করার আশ্চর্য দক্ষতা, যেকোনো পরিবেশে বিচিত্রস্বাদী গল্পরচনায় আনায়াস পটুত্ব; সবকিছু মিলিয়ে বিরাট সম্ভাবনাময় কবি-মানস।'[১০]

কিশোরদের জন্য গল্প রচনাতেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতার পরিচয় মেলে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার, সহজ সরলভাবে অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতা। গল্পগুলির হাস্যরসে কোন জ্বালা বা বিদ্রুপ নেই, আছে কেবল স্বতস্ফূর্ত উচ্ছলিত হাস্যরসের নির্মল স্বচ্ছতা – যা এই জটিল যুগযন্ত্রণায় এক ঝলক মুক্ত বাতাসের মতো। নারায়ণ বাবুর কিশোর গল্প সম্পর্কে শিবরাম চক্রবর্তীর রসালো মন্তব্য এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য– 'যা পড়তে দেখলে গুরুজনেরা ভাবেন – আমার কচি ছেলেটা গোল্লায় যাচ্ছে, তার মধ্যে যদি রস থাকে, তাহলে সেটি রসোগোল্লা।'[১১]

এই গল্পগুলির প্রধান বিশিষ্টতা এইযে, আজকের কিশোর গল্পে যে ভায়োলেন্সের দেখা মেলে, তার থেকে গল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' যেমন শ্বাসরুদ্ধকারী অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হয়, চারমূর্তি কখনো তেমন পরিস্থিতিতে পড়েনা। তাদের অ্যাডভেঞ্চারে রোমাঞ্চ থাকে, কিন্তু শ্বাসরুদ্ধকারী সাসপেন্স থাকেনা। হাস্যরস অ্যাডভেঞ্চারেও তাদের সঙ্গী। এইসব গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্যও কম। কিশোর বয়সের নির্দোষ দুষ্টুমি এবং মজার ব্যাপার-স্যাপার এইসব গল্পের বিষয়। আর হাস্যরসই গল্পগুলির প্রধান অবলম্বন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন '...... বিষয় প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয়, তাহলে বলতেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।'[১২] রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের আলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলির প্রধানত বিষয়গতভাবেই শ্রেণীবিন্যাস করা হল নিচে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বয়ং নারায়ণ বাবু তাঁর 'সাহিত্য ছোটগল্প' প্রবন্ধে যেভাবে গল্পের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তা এখানে কিছুটা অনুসৃত হয়েছে। কেননা, লেখকের এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন স্বীয় গল্প রচনার ক্ষেত্রে চেতনে ও অবচেতনে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়।

গল্পের শ্রেণীবিভাগ ঃ –

১। রোমান্টিক

২। মনস্তাত্ত্বিক

৩। রূপক-সাঙ্কেতিক

৪। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব

৫। অতিপ্রাকৃত ও বীভৎস রসের গল্প

৬। সমাজ-সমস্যামূলক গল্প

৭। রাজনৈতিক

৮। আদর্শাত্মক

৯। বিদ্রুপাত্মক

১০। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ক গল্প।

উপরোক্ত গল্পের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে একথা বলা প্রয়োজন যে, পৃথকভাবে গল্পগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হলেও, একাধিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কখনো কখনো একই গল্পের মধ্যে মিলে মিশে থাকে। স্বয়ং নারায়ণবাবুর মতেও 'কাব্যধর্মী গল্প রোম্যান্টিক হতে পারে, সমাজজিজ্ঞাসামুখ্য গল্পের চরিত্রাত্মক হতে বাধা নেই, আবার আদর্শাত্মক গল্প দার্শনিক হয়ে উঠতে পারে।'[১৩] তাই মিশ্র হলেও যে গল্পে যে বিষয় প্রধান হয়ে উঠেছে, তাকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা হল। নিচে প্রতিটি শ্রেণীভুক্ত কিছুগল্প আলোচনা করে ছোটগল্প হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখানো হল।

রোম্যান্টিক গল্প — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের ভাষায় - 'রোম্যান্টিক মননের আলোয় প্রকৃতি এক অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয় – কামনা প্রেমের জ্যোতির্ময় মুক্তি লাভ করে, দেহ পায় দেহাতীতের বর্ণালী, জীবনের মুহূর্তগুলি সুরভিতে মন্থর হয়ে ওঠে।'[১৪] বস্তুত, জীবন-মরুতে রোম্যান্টিক ছোটগল্পগুলি যেন স্নিগ্ধ ওয়েসিস। স্বপ্নাবেশ, বিস্ময়মুগ্ধতা, কল্পনার বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য, গভীর ভাবাবেগ, নিবিড় সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষা, পরম অতৃপ্তি, দূরাভিসারী হৃদয় ও বিষাদময়তা রোম্যান্টিকতার লক্ষণ। রোম্যান্টিক অনুভূতি ও কল্পনা এমন একটি বস্তু, যা হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা করে জীবনের ভিত্তিভূমিতে, কিন্তু ঔৎসুক্য জাগায় জীবনাতীতের জন্য এবং বন্ধনের মধ্যে এনে দেয় অবন্ধনের জন্য ব্যাকুলতা। যিনি রোম্যান্টিক, তিনি দৈনন্দিন জীবন যাত্রার যা তুচ্ছ, অপাংক্তেয়, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অনুভব করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোম্যান্টিক গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত লক্ষণগুলিকে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখি, ছোটগল্প বিচারের ক্ষেত্রে নারায়ণবাবু তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে - গল্পটির শ্রেণী নির্ণয় করতে, গল্পটির চরম ক্ষণের তীব্রতা ও গভীরতা পরিমাপ করতে, ভাবের একমুখী সংক্ষিপ্ত নিটোল রূপ রক্ষিত হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করতে, প্রকাশ ভঙ্গিতে ইঙ্গিতগর্ভ তাৎপর্য অন্বেষণ করতে, বিষয়ানুসারী ভাষার উপযোগিতা পরীক্ষা করতে, লেখকের ব্যক্তিত্বকে লেখার মধ্যে আবিষ্কার করতে ও গল্পের নামকরণের যৌক্তিকতা নির্ণয় করতে বলেছেন। তেমন বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না হলেও মোটামুটিভাবে গল্প বিচারের এই ধারাকে অনুসরণ করেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করা হল। কেননা, এতে তাঁর নিজের মানদণ্ডেই তাঁর গল্পগুলির বিচার করা সম্ভব বলে মনে হয়, যা যেমন অভিনব, তেমনি যুক্তিযুক্ত। এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু রোম্যান্টিক গল্পের আলোচনা করছি।

'আলেয়ার রাত' —

গল্পটি লৌকিক ও ব্যবহারিক অর্থ-তাৎপর্যকে অতিক্রম করে অনুভূতির রোম্যান্টিক সৌন্দর্যলোকে বিস্তৃতিলাভ করেছে। এ গল্পে লেখক দেখাতে চেয়েছেন দুর্যোগপূর্ণ ভয়ঙ্কর পটভূমি, আলেয়ার প্রতারক হাতছানি, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ— এ সবকিছুকে ছাড়িয়ে সঙ্গীতের রূপ-রস-বৈচিত্র্য কেমনকরে তার রাগ-রাগিনীর বিস্তার করে হৃদয়-শতদলের এক-একটি পাঁপড়ি সহজ প্রসন্নতায় মেলে ধরে।

এই রোম্যান্টিক গল্পটি কাব্যধর্মী এবং ভাবাশ্রয়ী। তাই এ গল্পে কোন ঘটনা বা প্রকৃতি সঙ্গীতকে গড়ে তোলেনি, সঙ্গীতই গড়ে তুলেছে জীবন ও প্রকৃতিকে। এমনকি, তা মৃত্যুর মধ্য দিয়েও উত্তীর্ণ হয়েছে সঙ্গীতের অমর লোকে।

এ গল্পে দুর্দান্ত ফুটবলার হারাণ হঠাৎ পড়ে গেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রেমে। দরবারী কানাড়ার সুর কানে আসতেই 'কেয়াফুলের গন্ধে যেমন করে কেউটে সাপের ঘুম ভাঙ্গে, তেমনি ভাবে চমকে উঠল তার বুকের মাঝখানে।'[১৫] হারাণের ভাষায় - 'এমনিই হয় ভাই, হঠাৎ এক এক সময় মানুষ এমনি করে নিজেকে চিনতে পারে। মনে হল আকাশটা যেন আলো হয়ে উঠছে, তারাগুলো কাঁপছে. বাইরের গাছপালাগুলো পর্যন্ত গানের তালে তালে মাথা নাড়ছে। সুরটা যেন আমার নাড়ী ধরে টান মারল। আর থাকতে পারলামনা — ছুটে বেরিয়ে এলাম।'[১৬] আপাতদৃষ্টিতে ক্লাস এইটে তিনবার ফেল করা হারাণের মুখে এমন কাব্য-কথা খুব বেমানান লাগে। কিন্তু একটু – গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এটা স্কুলের নির্বোধ ছাত্র হারাণের মুখের কথা নয়; সঙ্গীত-প্রেমী হারাণের অন্তরের কথা। আসলে তার ভেতরকার সঙ্গীতই যেন কথা বলে উঠেছে।

ক্রমশ কাব্য-প্রেমী বন্ধু বিমলের কল্পনাকে দুলিয়ে দিয়ে হারাণ তাকেও সঙ্গীত জগতের দিকে টেনে আনে। কাব্যের স্পর্শে তার সঙ্গীত-চেতনা ওঠে জেগে। সুতরাং মাঝে মধ্যে বিমল গানের আসরে হারাণের সঙ্গী হয়। কিন্তু গানের প্রতি আগ্রহ জাগলেও বিমল কখনো হারাণের মতো সঙ্গীত-পাগল হয়ে ওঠেনা। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনেকটা বৈষ্ণব কবিদের মতো। বৈষ্ণব কবিরা যেমন শৈল্পিক দূরত্ব রক্ষা করে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শন করে তার কাব্যরূপ দান করেন, বিমলও তেমনি দূর থেকে সঙ্গীতের রসাস্বাদন করে তাকে কাব্যে অনুভব করে। অপরপক্ষে হারাণ যেন স্বয়ং রাধিকা। তাই সঙ্গীত রস-রূপ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনাকাঙ্খায় সে বর্ষামুখর ভায়নক রাতে, বিপদসঙ্কুল পথে অভিসারে পা বাড়ায়। আর বিমলের মনে জাগে আশঙ্কা 'এই রাত্রির মল্লার অন্ধকারের বুকভাঙা বিপুল জলধারার মতো নেমে আসবে আমাদের ওপর, আমরা ভেসে যাব হারিয়ে যাব, জলের ভিতরে একটা চিনির কণা যেমন করে মিশে যায় – তেমনিভাবে মিশে যাব চিরকালের মতো।'[১৭] এই আশঙ্কা গল্পের গতিকে এ্যাড্‌ভেঞ্চারে আরও টান টান একমুখী করেছে ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দান করে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। আলেয়ার বিভীষিকা, মসীলিপ্ত আঁধার, ঝড়-বৃষ্টি, অচেনা মাঠ জঙ্গল, জংলা নদীর পাগল করা বাণের প্রলয় গর্জন এ গল্পে ভয়ানক রসের সৃষ্টি করলেও গল্পের মূল ভাবরস হারাণের কথায়-আচার-আচরণে ঝরে পড়ে এক অদ্ভুত রোম্যান্টিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। হারাণ বলে '..... ওই নদীটা ঠিক কোনো পুরোনো বুড়ো ওস্তাদের মতো। ঝিম মেরে চুপচাপ বসে থাকে-বাহবা চায়না, আসরে যায়না -- লোকে ভাবে মানুষটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসে বুড়ো ওস্তাদ তানপুরা টেনে নেয়। ধীরে ধীরে গলা খোলে – তারপরেই বিদ্যুতের মতো খেলতে থাকে সরগমের ঝলক, পাহাড়ী ঢলের মতো সব ভাসিয়ে দিয়ে সুরের বান আসে তখন কে দাঁড়ায় তার সামনে?'[১৮]

এভাবে রাধা যেমন কালো চুলে, নয়নাঞ্জনে, যমুনার জলে -- সর্বত্র কৃষ্ণকে দেখে, তেমনি হারাণ প্রকৃতির সর্বত্র সঙ্গীতকে আবিষ্কার করে। সব বিপদ ভুলে সঙ্গীতোন্মাদ হারাণ বন্ধু বিমলকে নিয়ে কাঠের নড়বড়ে পুলে উঠে পড়ে। আর এখানেই আসে গল্পের চরম মুহূর্ত। ছোটগল্পে এই চরম মুহূর্তটিই হয় গল্পের মূল রসকেন্দ্র। এই চরম মুহূর্তটি এখানে কালরাত্রির ভয়াল গর্জনের মধ্যে অপূর্বভাবে উপস্থিত। যে গভীরতা ও তীব্রতা এই পরমক্ষণটি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল, উপযুক্ত সঙ্কট ও স্থান পরিবেশ নির্মাণ করে তা সার্থকভাবে সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকারে পাহাড়ী নদীর দুরন্ত স্রোতে ভেসে গেছে বিমল। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শকে রুদ্ধশ্বাসে অনুভব করেছে। মরীয়া হয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করে তীরে উঠে প্রকৃতির উন্মত্ত মৃত্যু-আলিঙ্গনের চেয়ে গোখরোর বিষ শ্রেয় মনে করেছে । মৃত্যু-চেতনা এখানে জীবন-বাসনার নামান্তর মাত্র। আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ এখানে স্পষ্ট প্রকৃতির হিংস্র রূপে ও বাঁচার জন্য লড়াইয়ের তীব্রতায়।

কিন্তু বিমল বাঁচলেও, হারাণ মৃত্যুবরণ করেছে। তাই তাকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আলেয়ার আলোর হাতছানিতে দিক্‌ভ্রান্ত বিমল পথ হারিয়েছে। ঘোরের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখেছেযে, হারাণের গান শুনে সে চেঁচিয়ে উঠতেই গানের সুর গেছে কেটে, শোনা গেছে উপহাসের অট্টহাসি। আসলে হারাণের গানের স্বপ্নময় রাজ্যে বিমলের প্রবেশাধিকার নেই, এ স্বপ্ন তারই ব্যঞ্জনাবাহী।

বিশ বছর এরপর কেটে গেছে। পরিণত বিমল এখন জেনেছে, গান কেমন করে মানুষকে পাগল করে হারাণের মতো ছুটিয়ে বেড়ায় আলেয়ার পিছনে। তাই ওস্তাদ আমির খানের জলসা থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের অজস্র সঙ্গীত-প্রেমীদের মধ্যে সে হারাণকে আবিষ্কার করেছে। অনুভব করেছে যে, ফুটপাথের অসংখ্য সঙ্গীত-পিপাসু শ্রোতাদের প্রতিনিধিই হারাণ। তাই বিমলের ভাষায় ' সেই রাত্রে সেই আলেয়ার মাঠে, কোন্ এক জলসায় হাজিরা দেবার জন্য যারা লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারা বহুদিন হল পেয়ে গেছে হারাণকে। আমি সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছিলুম, তাই আমাকে তারা সঙ্গে নিলনা।'[১৯]

এ গল্পে ঘটনা থাকলেও, ঘটনার বৃত্তে এর পরিসমাপ্তি নয়। আখ্যায়কার দিকে এ গল্পের পদক্ষেপ নয়, ভাবাত্মক একমুখিতার সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগর্ভতার গভীরে এর সঞ্চার। বিশেষকরে, কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যু স্রোতের গর্জনের পটভূমিতে সঙ্গীত উপলব্ধির ব্যঞ্জনাধর্মী মীড় মূর্ছনাজাত রোম্যান্টিকতা হৃদয়কে আবিষ্ট করে। গল্পের শেষাংশ এই ভাবকে আরও পুষ্ট করে। এক হারাণকে ছড়িয়ে দেয় সঙ্গীত-প্রেমী লক্ষ হারাণের মাঝে।

এ গল্পে লেখকের ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত প্রসঙ্গে এইটুকুই বলব যে, এই গল্পে লেখকের কেবল সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞানের নয়, সঙ্গীত-প্রীতি ও সঙ্গীত-চেতনার বিকাশ দেখা যায়। লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইযে, এই গল্পে সঙ্গীত কোথাও আরোপিত হয়নি। হৃদয় থেকে সঙ্গীত যেমন আপনি উৎসারিত হয়, তেমনি সঙ্গীত এই গল্পে আপনি নেমে এসেছে নদীর মতো, প্লাবিত করেছে হৃদয়ের দুকূল।

এ গল্পে বর্ণনা আছে, কিন্তু এ বর্ণনা কখনো গল্পের অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধি করেনি। এ বর্ণনার ভাষা স্বপ্নময়, কোমল, মূর্চ্ছনাময় এবং ইঙ্গিতগর্ভ। এ ভাষা মুখের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা; লৌকিক ভাষা নয়, সঙ্গীতের ভাষা। এই গল্পের প্রতিটি অক্ষর যেন রাগ-রাগিণীর সুরের একেকটি তার। স্পর্শমাত্রই চেতনায় ঝঙ্কার বেজে ওঠে।

এ গল্প ঘটনা প্রধান নয়, ভাবপ্রধান। সুতরাং এ গল্পে অন্যবশ্যক ঘটনাজাল বিস্তারের কোন অবসর নেই; আছে একমুখী ভাবের নিটোল রসরূপ। আর নামকরণ প্রসঙ্গে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'আলেয়ার রাত' গল্পের বহিরঙ্গে আলেয়ার রাতের এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ও বিভীষিকার কথা যেমন আছে, অন্তরঙ্গে তেমনি আছে আলেয়ার মতো সঙ্গীত জগতের হাতছানি, যা লক্ষ হারাণকে টেনে নিয়ে যায় অমোঘ নিয়তির দিকে।

এ গল্পের গঠন-কৌশল সম্বন্ধে এটুকুই বলব, গল্পটির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবটাই যেন এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। প্রথমে ধীর লয়ে আলাপ, মাঝে দ্রুতলয়ে তান বিস্তার, আর শেষে রয়ে গেছে সঙ্গীতের রেশটুকু ফুলের গন্ধের মতো। ছোটগল্পের, বিশেষত রোম্যান্টিক গল্পের এর চেয়ে সুন্দর গঠন বা পরিসমাপ্তি আর কি হতে পারে?

বনজোৎস্না ----

রোম্যান্টিক স্বপ্নময় পরিবেশ এই গল্পটির বাতাবরণ গড়ে তুলেছে, গল্পের চরিত্র গঠন করেছে এবং এই রোম্যান্টিক মাধুর্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে রোম্যান্টিক বেদনার অতৃপ্ত হাহাকারে। জঙ্গলের ভীষণতা, রাজনৈতিক মতাদর্শের নীতিগত কঠোরতা, মানুষের আদিম লালসা হিংস্র ব্যাধের রূপ ধরে এ গল্পকে অসহায়া হরিণীর মতো তাড়া করে ফিরেছে; কিন্তু হরিণীর চোখে

তখনও নিবিড় মায়ার রোম্যান্টিক স্বপ্নাঞ্জন।

এই গল্পটিযে রোম্যান্টিক গল্প, সেকথা রবিন পালও স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় 'গল্পটি এক বিপ্লবীর সঙ্গে বনবাসী এক মেয়ের রোমান্টিক প্রেমের গল্প।'[২০]

নিবিড় শালের বনে, জ্যোৎস্নাস্নাত অপার্থিব মায়াময় পরিবেশে, জলঢাকা নদীর ছলচ্ছল শব্দে, পাহাড়ী যুবতী শিউকুমারীর পিতমের অপেক্ষায় বুকে রক্তের দোলা লাগিয়ে এই রোম্যান্টিক গল্পের শুরু। এখানে 'পিতম' কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, যেকোন নারীর কল্পনার চিরন্তন পুরুষ সে। তাই তার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে শিউকুমারীর 'বুকের রক্তে মাতলামির দোলা লেগেছে, সমস্ত শিরাস্নায়ু চকিতে হয়ে উঠেছে অধীর এবং উদগ্রীব প্রতীক্ষায়।'[২১]

অপ্রাপণীয়ের জন্য এভাবে শিউকুমারীর হৃদয় যখন পিপাসার্ত হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় নদীতীরে সে আবিষ্কার করেছে বাঙালীবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায়। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, লেখক কিভাবে উপযুক্ত স্থান পরিবেশ ও মানসিক প্রস্তুতি নির্মাণ করে গল্পের নায়ককে এনেছেন। আর ফলত যা হবার তাই হয়েছে। শিউকুমারীর মনে জেগেছে প্রেমের অঙ্কুর। আর জ্ঞান ফিরে মহীতোষ দেখেছে - ' সামনে তরুণী নারী। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কালো চোখে জ্যোৎস্না, সুন্দর মুখখানিতে জ্যোৎস্না, কর্ণাভরণে জ্যোৎস্না।'[২২] এইভাবে উপযুক্ত পরিবেশ ও মানসিকতার মধ্যে এই মুগ্ধতা ও প্রেমোন্মেষের চিত্র একান্তই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু রোম্যান্টিক আবেগাপ্লুতা শিউকুমারীর মনের স্বপ্ন ও মহীতোষের আকাঙ্খা এক নয়। দিনের আলোয় বাস্তবে এসে মহীতোষের তাই মনে পড়ে শৃঙ্খলিত মাতৃভূমিকে মুক্ত করাই তার একমাত্র ব্রত। তাই বিপ্লবী মহীতোষের শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, এবং তার মনে বারবার বনলক্ষ্মীর মতো দেখা দেয় শিউকুমারী। ভিজে বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে তার যৌবনের আমন্ত্রণ মহীতোষের রক্তে আগুন জ্বালে। বনবালার প্রেম ও রাজনৈতিক কর্তব্যের টানাপোড়নে সে ক্ষতবিক্ষত হয়। বিপ্লবের পথে চলে যেতে ইচ্ছে করে এ মোহজাল ছিন্ন করে। কিন্তু সে শক্তি বা সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে।

আর এমন সময়ে গল্পে খল চরিত্র বলদেওর আবির্ভাব গল্পটির নাট্যরসকে ঘন করে তোলে। বলদেও শিউকুমারীর কাছে একদা কুৎসিত প্রস্তাব করলে, স্বাধীন ভুটিয়া মেয়ে শিউকুমারী তাকে চড় মেরেছিল। তার প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত সময় বুঝে এবার বলদেও এগিয়ে আসে। বাঙালীবাবু আর থাপাজীর হাতে দড়ি পড়াবার ভয় দেখিয়ে সে শিউকুমারীকে বশে আনতে চায়। ফলে বলদেওর হাত থেকে মহীতোষকে ও নিজেকে রক্ষা করার জন্য শিউকুমারী মহীতোষের সঙ্গে পালিয়ে যেতে চায়। এ প্রসঙ্গে রবিন পাল বলেছেন — 'বনভূমির সুন্দর বর্ণনায় অরণ্য পরিবেশ ও অরণ্যবাসীর চিত্র হয়ত সুন্দর কিন্তু মহীতোষ ও শিউর দ্রুত প্রেম, বিশেষতঃ অন্যত্র গিয়ে গৃহস্থ হবার সাধ সঙ্গত মনে হয়না।'[২৩] একথা সত্যি, গল্পটির ঘটনা খুবই নাটকীয় — অনেকটা সিনেমার রোম্যান্টিক গল্পের মতো। কিন্তু গল্পের রোম্যান্টিক পরিবেশ-শালপাতার মর্মরধ্বনি, হরিণ-হরিণীর প্রণয়, বনমোরগ দম্পতির মিলনমায়া, পাহাড়ের নিস্তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন জীবন রোম্যান্টিক প্রেমানুভূতি জাগাবার পক্ষে এবং রাজনীতির তরঙ্গোদ্বেল জীবন ভুলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। আর পাহাড়ী মেয়েরা যেমন দুঃসাহসী ও স্বাধীন-চেতা হয়, তাতে শিউকুমারীর পক্ষে একত্রে ঘর ছেড়ে যাবার প্রস্তাব একেবারে অসঙ্গত নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু মহীতোষ শহরের বাস্তববাদী ছেলে। তাই সে এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানায় আর্থিক অসুবিধার কথা ভেবে। আর শিউকুমারী মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুছে ফেলে টাকা আনবার জন্য বলদেওর কাছে রওনা হয়- 'একটি রাত্রি অশুচিতা! তারপর যে জীবনে আসবে, তার পবিত্র নির্মল স্রোতে ধুয়ে যাবে সমস্ত, মুছে যাবে সমস্ত গ্লানি আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।'[২৪] প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে চলে সরলা পাহাড়ী বালা। এদিকে মহীতোষের রক্তে লাগে দোলা। অতীতের রাজনৈতিক আন্দোলন — সবকিছু তার মিথ্যা মায়া মনে হয়, প্রেমের সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দেবার উন্মাদনা সাড়া জাগায় তার শিরায় শিরায়।

আর এইবারেই আসে গল্পের চরমক্ষণ। এই স্বপ্নময় মুহূর্তে অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে আবির্ভাব ঘটে বিপ্লবী অরবিন্দর। রিভলবার তুলে সে মহীতোষকে যেতে বাধ্য করে অতীত আন্দোলনের পথে। কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন মহীতোষ পুতুলের মতো তার সঙ্গ নেয়। তাই রবিন পাল যথার্থই বলেছেন — 'শিউর ওপর অতি নির্ভরশীলতা এবং শিউকে না বলে মহীতোষের চলে যাওয়া এই বিপ্লবী চরিত্রটিকে পৌরুষবর্জিত ও অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছে হয়ত লেখকের অজান্তেই।'[২৫] তবে এক্ষেত্রেও একটি কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, লেখকের উদ্দেশ্য এখানে বিপ্লবীর চিত্রাঙ্কন নয়, রোম্যান্টিক প্রেমের রোম্যান্টিক বেদনাই গল্পটির মুখ্য উপজীব্য। তাই একা শিউকুমারী অন্ধকার জঙ্গলে পাগলের মতো মহীতোষকে খুঁজে বেড়ায়। আর বলদেওর কামনার দাবাগ্নি তাকে তাড়া করে ফেরে।

গল্পের শেষে তাই মনে হয় স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে গেছে বাস্তবের তীব্র আলোতে। কিন্তু বাস্তবের তীব্র নির্মমতা নয়, শিউকুমারীর স্বপ্নভঙ্গের রোম্যান্টিক বেদনাই গল্পের শেষ পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। রোম্যান্টিকতার সেই চির অতৃপ্তি, হারানোর বেদনা শিউকুমারীর অন্তরে বাসা বাঁধে। পিতমের জন্য তার অপেক্ষা আর শেষ হয়না।

গল্পটি শিথিল বিন্যস্ত নয়। ভাবের একমুখিতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব গল্পটিকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করেছে। বনজ্যোৎস্নার পটভূমিতে বনবালার প্রেম রোম্যান্টিক স্বপ্নাবেশ সঞ্চারিত করেছে গল্পটিতে। লেখকের প্রকৃতি-প্রেম গল্পটির প্রতিটি ছত্রে উৎসারিত। লেখকের লেখনীর গুণে প্রকৃতি এখানে কেবল ছবি নয়, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-যাবতীয় অনুভব নিয়ে পাঠকের স্বপ্নের জগতে তার সঞ্চার। উজ্জ্বল মজুমদার যথার্থ বলেছেন -- 'বনজ্যোৎস্নার মধ্যে ডুয়ার্সের যে ভীষন সুন্দর রূপের বর্ণনা আছে তা বাঙলা গল্পের নতুন দিগন্ত খুলেছে।'[২৬] তাই এ গল্পের ভাষাও যেন কল্পলোকের ভাষা-স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে তা নেমে এসেছে বইয়ের পাতায়।

গল্পের নামকরণ এই স্বপ্নের মায়াজাল বিস্তার করেছে গল্পের শুরুতেই। তাই নামকরণটি যেমন রোম্যান্টিক, তেমনি ভাবগভীর। চাঁদে কলঙ্ক থাকে, শিউকুমারীর শরীরেও তেমনি কলঙ্ক লেপন করেছে বলদেও। কিন্তু বন-জ্যোৎস্নায় কোন কলঙ্ক নেই। বনবালার প্রেমও সেই বন-জ্যোৎস্নার মতোই নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নির্মল ও সুন্দর।

'একটি চিঠি' ---

এটি একটি রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প। বাল্য-প্রেমের সারল্য, বিশ্বাস ও স্বপ্ন গল্পটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। বাল্যের ভালবাসা কিভাবে একটি বালিকার মনে স্থায়ী আসন লাভ করে, কিভাবে সামান্য একটি ফুলগাছ পোঁতার ঘটনা ভালবাসার কুঁড়ি ধরায় সেই বালিকার মনে, গাছের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমের পুষ্টি-বৃদ্ধি , গাছের ফুল ফুটতে হৃদয়ে প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়া আর সেই গাছের ফুল দান করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আত্মোৎসর্গতা এ গল্পে ব্যক্ত হয়েছে নান্দনিকভাবে। বস্তুত, ফুলগাছটি এখানে প্রেমেরই প্রতীক।

গল্পটি উত্তম পুরুষ চিঠির ভাষায় কথিত। সুতরাং গল্পটি অনাড়ষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য। বক্তার হৃদয়ের কথা বলবার সুযোগ এক্ষেত্রে অনেক বেশি থাকায় হৃদয়-মুখ্য গল্পটির বক্তব্য হৃদয়েই পৌঁছয়। বাল্যকাল থেকেই এই বালিকার মনে বালকের প্রতি পক্ষপাত প্রচুর। বালকটির সঙ্গে পুতুল খেলার জন্য সে তার সইদের সঙ্গে আড়ি করতে পেছপা হয়না। তার প্রিয় পুতুল ঐ বালকটি ভেঙ্গে ফেললে সে রাগতো করেইনা, বরং তাকে সান্ত্বনা দেয়। আর পুতুলের বিয়ের বাসর সাজাবার জন্য বাবা রাগ করবে জেনেও বাবার টবের গোলাপ গাছ থেকে গোলাপ তুলে মার খায়। আর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই বালকটি বলে -- 'চল্ খুকু, আমরা ফুলের গাছ লাগাই। সেই গাছে ফুল হবে পুতুলের বিয়েতে আর কারো ফুল নিতে হবেনা।'[২৭]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একস্থানে মন্তব্য করেছিলেন -- 'এতদূরে বিষবৃক্ষের বিজ বপন হইল'।[২৮] এক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুকে অনুসরণ করে বলা যায় - 'এত দূরে প্রেম বৃক্ষের বীজ বপন হইল।'

জাগতিক নিয়মে সেই বালকের বাবা চাকুরিতে অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম চিঠি-পত্র আসত। পরে তাও বন্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে মেয়েটি কিন্তু তার বাল্য সঙ্গীকে ভুলতে পারলনা। তার ভাষায় -- 'বছরের পর বছর কাটতে লাগল, বারে বারে আমার টগর গাছটি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। আমি আর পুতুলের বিয়ে দিইনি--- গাছের একটি ফুল তুলিনি, একটিও তুলতে দিইনি কাউকে।'[২৯]

এরমধ্যে মেয়েটির সংসারে কত ঝড় এল গেল। অর্থাভাবে মেয়েটি পড়া ছেড়ে স্কুলে চাকরি নিল। কিন্তু এত দুঃখেও মেয়েটি সেই গাছটির কথা ভুললনা। তার ভাষায়- 'কত ভোরের আবছা আলোয়, কত ঝিমঝিম দুপুরে টগর ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে যায় -- আমি চুপ করে বসে থাকি, দেখি পুতুলের বিয়ের স্বপ্ন। আর ভাবি, তুমি আসবে, নিশ্চয়ই আসবে একদিন।'[৩০]

অবশেষে এই রোম্যান্টিক প্রতীক্ষার অবসান ঘটে মর্মান্তিকভাবে। জীপে ধুলো উড়িয়ে আসে সেই বাল্যের সখা। সেই গাছটির কথা উঠতেই হেসে বলে 'হাউ ফানি।'[৩১] মেয়েটির বুকে তীরের মতো এসে বেঁধে সেই অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ। কথায় কথায় সে জানতে পারে, ছেলেটি তারই এক সহপাঠিনীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে চলেছে।

ছেলেটি চলে যাবার পর মেয়েটি ছোট বাচ্চাদের ডেকে সেই গাছের ফুল দেয় পুতুল খেলার জন্য। কারণ, এতদিনে সে বোঝে -- 'পুতুল খেলার জন্যে যে ফুলের গাছ লাগিয়েছিলুম পুতুর খেলা ছাড়া তার ফুল আর কোন কাজেই লাগেনা। জীবনের নিয়মই তাই।'[৩২]

গল্পের শেষে মেয়েটির স্বপ্নভঙ্গের রোম্যান্টিক বেদনা ও অভিমান কেবল ছেলেটির প্রতি নয়, জীবনের প্রতিও। এই অভিমান, এই বেদনাও একান্তভাবে রোম্যান্টিকতার লক্ষণ। গল্পটির শেষে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্মরণীয় উক্তিটি মনে পড়ে --- 'বাল্যকালের ভালবাসার বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।'[৩৩]

এই গল্পটিতে মাত্র তিনটি চরিত্র আছে। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন চরিত্র পর্যন্ত এতে নেই; ঘটনাতো দূরের কথা। তাই নির্দিষ্ট বিষয়াভিমুখী ও ভাবমুখী হয়ে গল্পটি সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে ছোটগল্পের নিয়ম রক্ষা করেছে। এ গল্পে কেবল

মেয়েটি নয়, সমগ্র পাঠককুলও প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে ছেলেটির আগমণে।

গল্পটির ভাষা সহজ, সরল, সুন্দর কাব্যময়। শৈশব-প্রেমের কথা থাকায় লেখায় শিশু সুলভ সারল্য যেমন আছে, তেমনি আছে যুবতী হৃদয়ের স্বপ্নের লজ্জারুণ লাবণ্য। গল্পটির নামকরণ 'একটি চিঠি' এই কারণেই সার্থক যে, গল্পটি আগাগোড়াই একটি চিঠির আকারে কথিত। তবে গল্পটির নামকরণ যদি ঐ ফুলগাছ বা বাল্যপ্রেম প্রসঙ্গে হত, তাহলে আরও বেশি ব্যঞ্জনাগর্ভ ও বিষয়াভিমুখী হত বলে মনে হয়।

'শুভক্ষণ' —

এই গল্পটিও 'একটি চিঠি' গল্পটির মতো পত্রের আকারে কথিত। তাই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু পত্রের অতিদীর্ঘতার গল্পের বাঁধুনি শিথিল করে রোম্যান্টিক ভাবালুতার বিস্তারই সপ্রমাণ করে।

এ গল্পের নায়ক নিশীথ তার বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে একটি মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয় ও তার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে ফেলে। এক রোম্যান্টিক জ্যোৎস্নারাতে সে নৌকো করে বিয়ে করতে রওনা হয়। তখন 'জলটা কখনো দুধের মতো ধবধব করছে, কখনোবা হিজলপাতার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোটা চিংড়িধরা জালের মতো জলের উপর দোল খাচ্ছে। দুপাশের বেতবনের মধ্যে লগির ঘায়ে চমকে লাফিয়ে উঠছে ঘুমভাঙা মাছ — নলঘুরি ফুলেরা পাপড়ি গুটিয়ে এলিয়ে পড়েছিল তারাও শিউরে শিউরে উঠছে থেকে থেকে।'[৩৪] এ রোম্যান্টিক শিহরণ যেন নিশীথের হৃদয় থেকে সঞ্চারিত হয় প্রকৃতির মধ্যে। তাই নিশীথের মনে হয় 'সারা পৃথিবীটাই আজকে গায়ে হলুদ মেখে বসে আছে — চাঁদ থেকেও চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলুদ ঝরে পড়েছে চারিদিকে। নৌকোর ছল ছল উলুধ্বনি দিচ্ছে, পাতায় পাতায় খস্‌খস্‌ করে বেজে উঠছে নতুন চেলির শব্দ, খালের ধারে নরম কাদা একরাশ শ্বেত চন্দন হয়ে গেছে, বাঁশের বনে রাত্রির হাওয়ায় শানাইয়ের সুর বাজছে।'[৩৫] বস্তুত, এই বর্ণনাটুকু পড়ে মনে হয় যেন রোম্যান্টিক কবিতার কিছু পংক্তি। প্রকৃতি তার শব্দ গন্ধ স্পর্শ নিয়ে ইন্দ্রিগ্রাহ্য হয়ে উঠে এক ইন্দ্রিয়াতীতলোকের অনুভূতি দান করেছে এখানে।

কিন্তু জ্যোৎস্নারাতে নিশীথের এই রোম্যান্টিক স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পথ ভুল করে কনের বাড়ি পৌঁছতে দেরি হওয়ায় লগ্নভ্রষ্টা হবার ভয়ে মেয়েটিকে একটি অন্য ছেলের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। চুপিচুপি নিশীথ তার বরের টোপর ভাসিয়ে দেয় জলে। বেদনাহত চোখে দেখে '...... আর চাঁদ নেই খানিকটা মেঘ উঠে এসে তাকে আড়াল করে রেখেছে। খালের জল কালির মতো কালো। দুধারের বেতবনে বাতাসের শব্দ কর্কশ হাসির মতো শোনা যাচ্ছে।'[৩৬] মনে রঙের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিক রঙও বদলে যায়। নিশীথের মনে হয় 'চন্দ্রহীন আকাশে চলন্ত মেঘগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার শুভক্ষণটিও ভেসে চলে গেল।'[৩৭]

এরপর নিশীথের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। কিন্তু নিশীথ তার প্রথম প্রেমকে ভুলতে পারে না। অবশেষে মায়ের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে সান্ত্বনা দিতে নিশীথ বিয়ে করতে রাজী হয়। আর বিধাতার অদ্ভুত খেয়ালে ঘটে যায় আকস্মিক অভাবিত যোগাযোগ। খবরের কাগজে পাপ ব্যবসা চালাবার অভিযোগে ধৃত তিনটি মেয়ের মধ্যে সেইমেয়েটির নাম দেখে চমকে ওঠে নিশীথ। আর আদালতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার মানসীকে। তার রূপ এখন জ্বলে গেছে সময় ও বাস্তবের রূঢ় আঘাতে। কিন্তু নিশীথের ভাষায় - 'তবু তুমি তুমিই।'[৩৮] এখানেই প্রেমের রোম্যান্টিকতায় উত্তরণ। তাই পতিতা জীবনের ক্লেদাক্ত রূপকে নিশীথ সহজেই ভুলে যেতে পারে। কিন্তু ভুলতে পারেনা 'সেই গায়ে হলুদের রঙ, সেই নারকেল বনের ছায়া, সেই বাতাবী লেবুর গন্ধ ....'[৩৯]

তাই নিশীথ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনা। সে অনুভব করে 'বুকের ভিতরে যে জায়গাটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিল, সেটা এখন একটুকরো হীরার মতো জ্বলছে। যা আগুন ছিল, তা আলো হয়ে উঠেছে। সে আলোয় জ্বালা নেই — জ্যোতি হয়ে আমার বুকখানাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। ....আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম।'[৪০] এই রোম্যান্টিক ভালবাসাই তার শান্ত শুচিতায় উদ্ভাসিত করে তোলে একটি 'শুভক্ষণ'। ভাগ্যের বলিষ্ঠ দুহাত দিয়ে এবার তার হৃদয় পদ্মকে সমাজের নোংরা পাঁক থেকে তুলে এনে, এই শুভক্ষণটিকে নিজের পৌরুষ ও ভালবাসার জোরে জয় করে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং গল্পটির নামকরণ খুবই সার্থক। তবে গল্পটির শেষাংশ অতি-নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট। কিন্তু হৃদয়বেদ্য রোম্যান্টিক স্বপ্নমায়ায় গল্পটি মধুর। গল্পটিতে চরমক্ষণ দুবার এসেছে। একবার নিশীথের বিবাহ ভঙ্গের সময়, আরেকবার তার প্রিয়তমাকে অকস্মাৎ আবিষ্কার করবার সময়। কিন্তু দুবার হওয়ায় মুহূর্তের চরমতায় ধার কমে গেছে। মনে হয় প্রথম চরম ক্ষণটির সময় গল্পটি শেষ হলেই বেশি ভাল হত। সেক্ষেত্রে চরমক্ষণের তীব্রতা যেমন বজায় থাকত, নিশীথের রোম্যান্টিক হৃদয়-বেদনা পাঠকের বুকে স্থায়ী জায়গা করে নিত, এবং গল্পটি অনেক বেশি বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হত। সংক্ষিপ্ত, নিটোল একটি গল্পের ঠাসবুনুনি পাওয়া সম্ভব হত।

গল্পটির ভাষা অবশ্য খুবই সুন্দর। রোম্যান্টিক বাতাবরণ নির্মাণে এ গল্পে ভাষাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ গল্প যেন তাই জ্যোৎস্নার আখরে লেখা হয়েছে স্বপ্নিল আকাশের পাতায়।

মনস্তাত্ত্বিক —

মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পই আধুনিক ছোটগল্পকারদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্লট রচনার চেয়ে হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের গর্ভে উঁকিঝুঁকি মারতেই বর্তমান লেখকরা ব্যস্ত হয়েছেন বেশি। বস্তুত, বিংশ শতকের মানসিক জটিলতা, যন্ত্রনা, দ্বিধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ফ্রয়েড-সিগমণ্ড প্রদর্শিত পথে বাসা বেঁধেছে গল্পের চরিত্রে। অবশ্য 'মনস্তাত্ত্বিক গল্প রচনার উৎসমুখ উদ্ঘাটিত করেছেন হেনরি জেমস'।[৪১] জেমস্ জয়েস্, ডি. এইচ. লরেন্স, চেকভ, ফকনার, হেমিংওয়ে এই জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর আমাদের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও কাব্যিক ব্যঞ্জনার মেলবন্ধন ঘটেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্পে।

অসুস্থ মনোবিকারের নগ্ন অশ্লীলতা নয়, মানব-মনের গহনের অজস্র জটিল লূতাতন্তু নিয়ে গল্প রচনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মানব-মনের তিনটি স্তর—চেতন, প্রাক্-চেতন ও অবচেতনে অনায়াসে গতায়াত করে তিনি হৃদয়ের বিচিত্র রূপকে তুলে এনেছেন লেখনী মুখে। তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলিতে বিশ্লেষণতো আছেই, সর্বোপরি আছে মমত্ববোধ, - যার গুণে এগুলি প্রবন্ধ নয়, গল্পের নিটোল রসরূপ লাভ করেছে। তাঁর মনস্তত্ত্বমূলক কিছু গল্প আলোচনা করে আমার উক্তি সপ্রমাণিত করার চেষ্টা করছি।

'সুখ' –

'সুখ' কথাটি যে মানুষ কত বেদনায়, যন্ত্রণা-বিকৃত শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে, এ গল্পে তা-ই দেখা যায়। মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ম্যাকডুগালের মতে প্রক্ষোভ থেকে প্রবৃত্তির জন্ম হয়। এখানে দেখি ক্রোধ থেকে যুযুৎসার জন্ম। ব্যর্থ তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী তাঁর ব্যর্থতাজনিত অক্ষম ক্রোধে ফেটে পড়েছেন, ও তারই পরিণামে দেখা দিয়েছে আত্মপীড়নের প্রবণতা। ফলে জন্ম হয়েছে 'পাগলা চৌধুরীর'। শিক্ষিত হয়েও তাঁর আলাপ অশিক্ষিত চাষা-ভূষোদের সঙ্গে। বনজ-ভেষজ ওষুধ তৈরি করার জন্য তিনি ভয়াল নির্জন পরিবেশে সাপের খোলস কুড়িয়ে বেড়ান। টিনের ছোট্ট বাড়ি, কিছু তরি-তরকারি, ছ'টা হাঁসের ও মুরগীর সমন্বয়কে তিনি গর্ব করে বলেন 'মডেল ফার্মিং'। 'গরুর দুধের মালাই চা' বলে যে চা তিনি পরিবেশন করেন, তা একেবারে স্বাদগন্ধহীন। আসলে নিজের দীনতা-লজ্জা-যন্ত্রণাকে 'পাগলা চৌধুরী' মিথ্যা সুখ ও অহমিকার গর্ভে ঢাকতে চান; –সব জেনেশুনেও আত্মপ্রঞ্চনা করেন। তাঁর নামে কোন চিঠি আসেনা, এককালের বিখ্যাত কবি হয়েও 'টোটকা দর্পণ' ও 'ভেষজরহস্য' ছাড়া কোন বই তিনি পড়েন না। খবরের কাগজ রাখেননা এবং বোবা-কালা-কুরূপা স্ত্রীকে 'আদর্শ' স্ত্রী বলে প্রচার করেন আত্মপ্রসাদের ভান করে। এভাবে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রনা ভোগ করেন চৌধুরী তিলে-তিলে আত্মহত্যার সাধনায়-এক সুগভীর অভিমানে। এ আত্মহত্যা শরীরকে হত্যা করা নয়, আত্মাকেই তিলে-তিলে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবার সাধনা তাঁর। চৌধুরীর এই গোপন যন্ত্রণা অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে যায় একটা বিশাল পাথর ঠেলে সরানোর অমানুষিক প্রচেষ্টায় – 'চিরকাল কি এরকম করে একটা পাথরের তলায় সব চাপা পড়ে থাকবে? কবিতা হারিয়ে যাবে-মণিকা হারিয়ে যাবে – যেখানেই যাব, এই পাথরের হাত থেকে আমি মুক্তি পাবনা?'[৪২]

আর এই চরম মুহূর্তেই পাঠকের মনে এতক্ষণ চৌধুরী সম্পর্কে যে নিছক কৌতূহল ছিল, তা লেখকের সমবেদনার স্পর্শে মমত্বে পরিণত হয়। চৌধুরীর মুক্তির জন্য এই তীব্র আকুলতা দেখে লেখকের সঙ্গেসঙ্গে পাঠকেরও মনে হয় যে, এককালে চৌধুরীর কবিতায় প্রার্থনা ছিল– 'খাঁচার এই লোহার শলাকাগুলো পুড়েযাক/গলে যাক–চিরতরে হোক নিশ্চিহ্ন'[৪৩] কিন্তু 'খাঁচার শলাতো নিশ্চহ্ন হয়ে যায়নি-তীরের ফলা হয়ে পাখির বুকে বিঁধেছে।'[৪৪]

গল্পটির 'সুখ' নামকরণ তাই অত্যন্ত শ্লেষাত্মক, ট্রাজিক ও তাৎপর্যময়। আর গল্পটির ছত্রে-ছত্রে মনোবিকারের করুণ ও তীক্ষ্ম যন্ত্রণা স্পষ্ট । গল্পটির শেষাংশে তুহিনাংশু দত্ত-চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ বিদ্যুৎ চমকের মতো অতি নাটকীয়ভাবে হয়েছে। গল্পের চরম ক্ষণটি তাই উত্তেজনায় টানটান। আগাগোড়া গল্পে পাগলা-চৌধুরীর অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের করুণ রহস্যঘন জটিলতার ক্রম-প্রকাশ আছে। তাই গল্পের ভাবও একমুখী। আর ভাষা তীব্র, নাটকীয়, বিস্ময়-মিশ্রিত –এককথায় ভাবোপযোগী।

'প্রতিপক্ষ' —

এই গল্পে সুখী দম্পতির জীবনে সর্পিল ঈর্ষা তার বিষাক্ত ফণা তুলেছে। আর এই ঈর্ষার জন্য হয়েছে তাদের সুখী দাম্পত্য-জীবনে এক প্রতিপক্ষের আবির্ভাবে। আশ্চর্যের বিষয় এইযে, এই প্রতিপক্ষটি কোন তৃতীয় পুরুষ বা নারী হয়, বরং এই

দম্পতিরই সাধনার ধন -- সঙ্গীত। যে সঙ্গীত একদিন তাদের পরস্পরকে কাছাকাছি এনেছিল, সেই সঙ্গীতই একদিন তাদের প্রেমের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীত জগতে স্বামী ইন্দুভূষণের জনপ্রিয়তা যত বেড়েছে, তার স্ত্রী শিখা ততই হীনমন্যতায় ভুগেছে। বিশেষত গ্রামোফোন কোম্পানী যখন ইন্দুবাবুর সঙ্গে ডুয়েট গাইবার জন্য শিখাদেবীকে নিতে অস্বীকার করেছে. তখন অপমানে জ্বলে উঠে-শিখা নতুন করে তার সঙ্গীত সাধনা শুরু করেছে। কিন্তু সাধ অনুযায়ী সাধ্য তার ছিলনা। ফলে 'গাঁদা গাছে গোলাপ ফুটলনা।'[৪৫] কিন্তু শিখার মনে জেগেছে অদ্ভুত অহঙ্কার আর আত্মপ্রত্যয়। তার ধারণা হয়েছে যে, তার স্বামী তার প্রতিভাকে চাপা দিতে চায়। সুতরাং ইন্দুকে এক করুণ প্রহসনে ভূমিকা নিতে হয়েছে। ইন্দু গোপন আর্জি পেশ করে শিখাকে ফাংশানে নিয়ে গিয়েছে, এবং শিখা তার প্রাপ্য দক্ষিণা প্রত্যাশা করলে ত্রিশ-পঞ্চাশ টাকা তার সাম্মনিক হিসেবে দেখিয়েছে। আর শিল্পী হিসেবে এই স্বীকৃতিটুকু পেয়েই শিখা খুশি হয়েছে।

কিন্তু মিথ্যা কখনো চিরস্থায়ী হয়না। তাই গল্পে ঘনিয়ে এসেছে চরম মুহূর্ত। জলসার জনৈক উদ্যোক্তার মুখে সত্য কথাটি শুনে শিখা একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার স্ত্রীর এই করুণ অবস্থা দেখে ইন্দু আবিস্কার করেছে যে, গানের চেয়ে সে স্ত্রীকেই বেশি ভালবাসে। তাই তখনই সে মনস্থির করেছে -- 'গান এসে মাঝখানে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট করে দেবে, এ আমি কিছুতেই সইবনা।'[৪৬] ফলে গায়ক ইন্দুভূষণ পরিণত হয়েছে এক সাধারণ দোকানদারে। পেন্সিল হাতে নিয়ে হিসেব লিখেছে -- 'স্নাফ্ -- ওয়ান ডজেন।'[৪৭] গল্পটির করুণ পরিণতি -- শিল্পী-সত্তার এমন অপমৃত্যু মনকে আঘাত করে। তবু এই ট্রাজেডির মূলে যে হৃদয়-যন্ত্রণার ইতিহাস আছে, তাতে শিখার প্রতিও পাঠক মমতাবোধ করে। আর গল্পের শেষে শিল্পের চেয়েও প্রেম বড় হয়ে ওঠে।

গল্পটি যথাযথ সংক্ষিপ্ত ও নিটোল। মূল কাহিনীর পাশে কোন শাখা কাহিনীর অনাবশ্যক বিস্তার নেই। যে সমস্যা নিয়ে গল্পের সূত্রপাত, সেই সমস্যার সমাধানেই গল্পের সমাপ্তি। গল্পটির গতি তাই দ্রুত ও একমুখী -- যা একটি সার্থক ছোটগল্পের লক্ষ্ণণ। গল্পটির ভাষা অনাড়ষ্ট এবং অনাড়ম্বর।

আর গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে বোধহয় এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, 'প্রতিপক্ষ'কে বিদায় করতেই গল্প দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই 'প্রতিপক্ষ'কেই কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত। গল্পের যাবতীয় হৃদয়-সমস্যার মূলেও এই 'প্রতিপক্ষ'। তাই এর চেয়ে সার্থক নামকরণ আর কি হতে পারত ?

'আত্মহত্যা' --

এটি একটি জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প। হৃদয়ের বিচিত্র ভাবাবেগ কিভাবে একটি সুস্থ, সুন্দর, সুখী মানুষকে আত্মহননের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, সে কথাই এ গল্পে লেখক বলেছেন। এ গল্পে সুখী, কৃতী, ধনী, সুপুরুষ পিনাকী তার সুখের মুহূর্তকে অমর করবার জন্য আত্মহত্যা করেছে। প্রেম ও মনস্তত্ত্বের কবি Robert Browing এর 'Porphyriou's Lover' এর প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। এই কবিতার নায়কও প্রেমের সুখের মুহূর্তকে অমর করবার জন্য মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিল। আমাদের বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের 'লাসকাটা ঘরে' শীর্ষক কবিতাটির মানুষটিও স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সুখী। আর তাই সে লাসকাটা ঘরের টেবিলে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

পিনাকী তার স্ত্রী সুপ্রভাকে জীবন-সঙ্গিনী-রূপে পেয়ে চরিতার্থ হয়েছিল। তার সামনে প্রসারিত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তাকে আশ্বস্ত ও সুখী করেছিল। তাই গল্পের প্রথমাংশে জীবনের প্রতি পিনাকীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সদর্থক। মৃত্যুর রহস্যময়তা তাকে ভীত করেছিল ও সে তার উজ্জ্বল জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভেবেছিল -- 'সুন্দর, কী সুন্দর এই জীবনটা!'[৪৮] বারান্দার নির্জনতায় স্ত্রীর উষ্ণ সান্নিধ্যে তার জীবন-প্রীতি আরও গাঢ় হয়ে আসছিল। কিন্তু আচমকা তার স্ত্রী সুপ্রভা যখন পিনাকীকে জানায়যে, ঐ বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে একটি ছেলের কেমন করে মৃত্যু হয়েছিল; মুহূর্তে পিনাকীর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গেল বদলে। তার মনে হল সারা জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে যুদ্ধ করার চেয়ে একেবারে এরকম সুনিশ্চিত সমাপ্তিই ভাল।

স্ত্রী চলে যেতে একাকীত্বের সুযোগে এই দার্শনিক অনুভূতি তাকে আরও আচ্ছন্ন করল। সে অনুভব করল জরা, মৃত্যু সবই মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর যৌবনে যে ভালবাসা উপভোগের, জরার আগমনের সাথে-সাথেই তা যন্ত্রণায় পর্যবসিত হবে। সুখের মুহূর্ত আর ফিরে আসেনা- এ অমোঘ সত্য উপলব্ধি করে পিনাকী চমকে উঠল ও নিজের ভবিষ্যতে অবহেলিত জীবন কল্পনা করে স্ত্রী পুত্রের ভালবাসা হারাবার আশঙ্কায় সে শিউরে উঠল। তাই এ মুহূর্তে সুখী জীবনের মাধুর্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখতে পিনাকী মৃত্যুর শরণ নিল। ওকে প্রেরণা জুগিয়েছে ব্রাউনিং এর Porphyriou's Lover', ব্রাউনিংয়ের কথার প্রতিধ্বনি করে পিনাকী বলেছে 'Who knows but the world may end to night ?'[৪৯] পিনাকী ভেবেছে আজকের পৃথিবী শেষ না হলেও, সে নিজেতো শেষ হয়ে যেতে পারে। আর 'বিদায় যদি লইতেই হয়, তাহা হইলে অমৃতপাত্র পরিপূর্ণ থাকিতে থাকিতেই আনন্দের চরমতম মুহূর্তটিতেই সমাপ্তির ছেদ পড়িয়া যাক্।'[৫০] গল্পটির শেষ হয়েছে এইভাবে 'porphyriou's Lover'-এর মূল মন্ত্রটিকে উচ্চারণ করে।

গল্পটিতে মনের অলিতে-গলিতে কোন্ ভাবনা কেমন করে বাঁক নেয় তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানোর উপর জোর বেশি পড়ায় ও তার বিস্তারিত খুঁটি-নাটি বর্ণনার ফলে গল্পের মধ্যে খানিকটা দার্শনিক প্রবন্ধের ভাব এসেছে ও গল্পের নিটোল সংক্ষিপ্ততা তেমন রক্ষিত হয়নি। বিশেষত Browning এর 'Porphyriou's Lover' এর পাশে গল্পটির ইঙ্গিতগর্ভ ভাবগভীরতা, নিটোল গাঁথুনি অনেকটা টাল খেয়ে গেছে। মনে হয় এটা যেন ব্রাউনিংয়ের কবিতাটির মনস্তত্ত্বের পোস্টমর্টেম।

'দুর্ঘটনা'—

এই গল্পটিতে কুরূপা, যৌবন-বঞ্চিতা, অবহেলিতা নারীর অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সৌন্দর্যহীনা স্কুলমিসট্রেস্ মিস্ ইন্দিরা চৌধুরীর আর পাঁচটা নারীর মতোই ছিল জৈবিক চাহিদা, আত্মবিকাশের চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, ভালবাসার চাহিদা। কিন্তু কুরূপা হওয়ায় এইসব চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তাকে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই বাধার থেকে সৃষ্টি হয়েছে ক্রোধের, এবং হীনমন্যতা থেকে জন্ম নিয়েছে ঈর্ষ্যা। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় — 'তাই ষ্টিমারের বুকে তরুণ দম্পতির মধুর দাম্পত্যলীলা দেখে তার রক্তের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ উদ্দাম হয়ে উঠল।'[৫১]

প্রতিহিংসা-কুটিল প্রেতিনীর মতো ঐ তরুণ দম্পতির সুখের সংসারে তার ঈর্ষার আগুন লাগিয়েছে মিস্ ইন্দিরা। যে সুখে সে নিজে বঞ্চিত, দাম্পত্যের সেই মধুর সুখ অন্যে পাবে — তা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই স্টোভ-দুর্ঘটনার কথা গোপন করে মিথ্যে গল্প বানিয়ে ঐ নব দম্পতির মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কালো ছায়া বিস্তার করে নিষ্ঠুর উল্লাসে ইন্দিরা চৌধুরী দূরে সরে গেছে। জগদীশ ভট্টাচার্যের জবানীতে বলা যায় 'গল্প শেষে ইন্দিরা চৌধুরীর নিঃশব্দ অপসরণ সুন্দরের বেদী ভেঙে শয়তানের অট্টহাসির মতো অজস্র বীভৎসতায় পাঠক মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে।'[৫২] কিন্তু গল্পের শেষে যখন লেখক প্রশ্ন করেন 'নিজের সব ভেঙে গেছে বলেই যা সুন্দর দেখতে পায় তাইকি তার ভাঙতে ভাল লাগে?'[৫৩] তখন এই প্রশ্নটুকুর মধ্যেই লেখকের হৃদয়ের মমতা ঝরে পড়ে এই কুরূপা বঞ্চিতা মেয়েটির প্রতি। এই একটিমাত্র প্রশ্নেই ইন্দিরার হিংস্র বীভৎস রূপের আড়ালে উঁকি মারে দুর্ভাগা নারীর বুভুক্ষা।

গল্পটির ভাবৈক্য নিটোল। ভাষা সহজ সুন্দর ও বিষয়োপযোগী। মিস্ট্রেস ইন্দিরার বানানো গল্পে বিশ্বাসযোগ্যতা এসেছে এই ভাষার গুণেই। বঞ্চিতা নারীর ঈর্ষাকাতর মনস্তত্ত্ব বর্ণনায় লেখক মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটির নামকরণ প্রসঙ্গে বলব, স্টোভ 'দুর্ঘটনা' একটি নারীর মনস্তত্ত্বকে কিভাবে গড়ে তুলেছে তারই প্রকাশ এই গল্পে আছে। সুতরাং সেদিক থেকে দেখতে গেলে গল্পটির নামকরণ যথোপযুক্ত।

'অমনোনীতা' ----

এটি একটি অদ্ভুত জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প। সদ্যবিবাহিত লোকেনের সুখী দাম্পত্য জীবনে খুব তুচ্ছ কারণে, সামান্য উপলক্ষ্যে কিভাবে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল, তারই ক্রমবিস্তার আছে এ গল্পে।

লোকেনের বন্ধু সুখেন্দু একদা ঠাট্টাচ্ছলে কৌতুক করে জানায় যে, তাদেরই বন্ধু দুলাল লোকেনের স্ত্রী মণিকাকে বিয়ের পাত্রী হিসেবে একসময়ে অপছন্দ করেছিল। কিন্তু এই কথাটা লোকেনে মনে কাঁটার মতো এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে খচ্‌খচ্ করতে থাকে। কেন মণিকা দুলালের 'অমনোনীতা' হয়েছিল, এই প্রশ্নবাণ ঘুরে ফিরে তাকে বিদ্ধ করতে থাকে। দুলাল এ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়ে এর কারণ জানার পথটাকেও রুদ্ধ করে দেওয়াতে লোকেন যেন ক্রমাগত এক বন্ধ দরজায় মাথা কুটতে থাকে। সে নানা যুক্তি খাড়া করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চায় যে, মণিকাকে বিয়ে করে সে ঠকেনি। আসলে বন্ধুর 'অমনোনীতা' পাত্রীকে সে বিয়ে করেছে এই হীনতাবোধ ও অপমান তাকে অবচেতনে পীড়িত করতে থাকে। দুলালের কাছে তার নিজেকে পরাজিত বলে মনে হয়। তাই অন্ধ ক্রোধে, অক্ষম ঈর্ষায় সে দুলালের নানা ত্রুটি আবিষ্কার করে। আমরা জানি, মনোবিদদের মতানুযায়ী পরাজয়ের গ্লানি থেকেই হীনমন্যতাবোধের জন্ম হয় এবং এই হীনমন্যতাবোধই জন্ম দেয় অক্ষম ঈর্ষার। তাই মনোবিজ্ঞানের প্রতিটি উদ্ভাস এ গল্পে বিজ্ঞান-সম্মত।

ক্রমে সন্দেহের সরীসৃপ ফণা তোলে লোকেনের মনে। তার বিষ ঢুকে যায় লোকেনের শিরায় শিরায়। এই মনোব্যাধির প্রকোপ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। সংশয়ে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয় লোকেন। স্ত্রী মণিকাকে এ বিষয়ে জেরা করতেও ছাড়েনা। বিনিদ্র রাতে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লোকেন অনুভব করে 'ঘরের ভিতরে কোথায় একটা লুকোনো সাপ একটানা ফুঁসে চলেছে-কিন্তু সেটাকে দেখতে পাওয়ার কোনো উপায় নেই।'[৫৪] গল্পটি যেন মনস্তত্ত্বের সিঁড়ি। লোকেনের মানসিক ব্যাধি এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ক্রমশ ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়েছে। গল্পটির আগাগোড়া একই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের ক্রম-বিস্তার। সুতরাং ভাবের একমুখিতা এ গল্পে রক্ষিত হয়েছে। গল্পটির গভীর ও জটিল মনস্তত্ত্ব ইঙ্গিতগর্ভ তাৎপর্য বহন করেছে। গল্পটির ভাষায় অজানা মনোরহস্যের ছায়া ঘন, তাই প্রশ্নময়তা বেশি। সর্বোপরি স্ত্রী মণিকা একদা স্বামীর লোকেনের বন্ধুর কাছে

'অমনোনীতা' হয়েছিল বলে, সেই কারণেই এ গল্পে লোকেনের মনোবিকলনের বীজ উপ্ত হয়েছে। সুতরাং গল্পটির নামকরণও যথাযথ হয়েছে বলে মনে হয়। আর লেখকের সহানুভূতির ছোঁয়া লাগে পাঠকের মনেও। তাই দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত অসহায় লোকেনকে দেখে পাঠক যেমন শিউরে ওঠে, তেমনি তার জন্য মমতাও বোধ করে।

রূপক - সাঙ্কেতিক গল্প ঃ —

গল্পের বহিরঙ্গে রূপের কাঠামোয় যে অরূপের প্রকাশ ও গভীর সঙ্কেতের তাৎপর্য নিহিত, তাই হল রূপক সাঙ্কেতিক গল্প। এ ধরনের গল্প ঘটনা প্রধান নয়, ভাব ও তত্ত্ব প্রধান। রূপক গল্পে গল্পের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দু'টি ভাগকেই বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। আর সাঙ্কেতিক গল্পে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের গল্প মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পে এই রূপক ও সাঙ্কেতিকতার মিশ্রণ ঘটেছে। কেননা, তিনি যেমন বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী, ঠিক তেমনই ভাব-বিহ্বল ও আবেগ-প্রবণ। তাঁর স্বভাবের এই দ্বৈত রূপই তাঁর রূপক-সাঙ্কেতিক গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এ ধরনের গল্পে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে মন গভীরতর ব্যঞ্জনার দিকে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'একটি আষাঢ়ে গল্প', এইচ. জি. ওয়েল্‌সের 'The last day of judgement' সার্থক রূপক গল্পের উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটকে রূপক ও সাঙ্কেতিকতা মিলেমিশে গেছে। আবার ই. এম. ফরস্টারের 'The celestial omnibus' ও বিখ্যাত রূপক-সাঙ্কেতিক গল্পের সম্ভার। জটিল মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই রূপক-প্রতীকী প্রবণতা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রূপক-সাঙ্কেতিক গল্পগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। এবার তাঁর কিছু এই শ্রেণীর গল্প ধরে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

কুয়াশা —

একটি স্বপ্নের রূপকে জটিল মনস্তত্ত্বের সংকেতে গল্পটির মূল রস পরিবেশিত হয়েছে। স্বপ্নটি হল এই যে — একটি ছেলের ছুঁড়ে দেওয়া পোকাধরা চীনেবাদাম একটা কাঠবেড়ালী খেতে লাগল। চাঁপার ফুলের গন্ধে ঝিম ধরা দুপুরে একটা প্রজাপতি উড়ে এল মাথার উপর। ছেলেটা ভাবল কোন্‌টাকে ধরবে 'প্রজাপতি না কাঠবেড়াল?'[৫৫]

অমূল্য দত্তগুপ্ত ডাক্তার। তাঁর দ্বৈতসত্তা-দ্বিমুখী হৃদয়। একদিকে তিনি ডাক্তার, সেখানে 'ডক্টরস্ ডিউটি'ই প্রধান। অন্যদিকে তিনি একজন ব্যক্তিসত্তা 'অমূল্য দত্তগুপ্ত', যাঁর মধ্যে আছে 'কাঠবেড়ালী'র ছেলেমানুষী ছটফটানি, আবেগ। আর ঐ স্বপ্নের প্রজাপতি হল এক নারী, যার শরীরে রঙীন সৌন্দর্যের ছটা, চোখে কুহকিনী মায়া; এক ফুল থেকে আরেক ফুলে প্রজাপতির মতোই যার ক্রম-সঞ্চরণ।

মাঝরাতে 'কল্' পেয়ে শীতার্ত ডাক্তার রুগী দেখতে আসেন। সেখানেই তাঁর স্বপ্নের প্রজাপতি 'মঞ্জুর' সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। রুগীর পায়ে গুলির আঘাত দেখে কর্তব্য-পরায়ণ ডাক্তার একথা পুলিশকে জানাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেই রূপসী মঞ্জু ডাক্তারের পায়ের কাছে বসে চোখে জল এনে মোহজাল বিস্তার করলে 'ডাক্তার নয়, যে অমূল্য দত্তগুপ্ত একটু আগেই ঘাসের ভেতরে কাঠবেড়ালী আর প্রজাপতির স্বপ্ন দেখছিল'[৫৬] তিনি মেয়েটির অনুরোধ রাখেন। মেয়েটি তার সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে নিজের বাবা বলে পরিচয় দেয় এবং বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে ফায়ার হবার একটি গল্প সাজিয়ে বলে। ডাক্তার এ গল্প বিশ্বাস না করলেও, অমূল্য দত্তগুপ্তর ব্যক্তিসত্তা এ গল্প বিশ্বাস করতে চায়। মেয়েটির উগ্র প্রসাধন, মিথ্যা-কথন, ইতস্তভাব ডাক্তারবাবুর নজর এড়ায়না। কিন্তু ব্যক্তি অমূল্য দত্তগুপ্ত মঞ্জুকে নিতে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আর মঞ্জু ঠিকানা-বিহীনভাবে বিদায় নিতেই এ স্বপ্নের ইতি ঘটে।

কিন্তু গল্পের এখানেই ইতি নয়। আড়াই বছর বাদে হঠাৎ মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হতে ডাক্তারবাবু এবার জানতে পারেন রূপোপজীবিনী মঞ্জুর আসল পরিচয়। এইসঙ্গে এও জানেন যে, সেদিন মঞ্জু কেলেঙ্কারি গোপন করতে আহত ভদ্রলোককে নিজের পিতৃ-পরিচয় দেবার ফলে ভদ্রলোকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটে ও তিনি সালঙ্কারা মঞ্জুকে সুপাত্রে দান করতে চান। একথা শুনে ডাক্তার ভাবেন, দেহ-পসারিণী মঞ্জু নিশ্চয়ই এই সুযোগে ফাঁকি দিয়ে কারোর গৃহবধূ হয়েছে। ডাক্তারের কথার সুরে ও শ্লেষে এই ভাবনা গোপন থাকেনা। কিন্তু তাঁকে বিস্মিত করে মঞ্জু বলে ওঠে - 'কী ভেবেছেন আমায়? একটা আত্মসম্মান নেই আমার?'[৫৭] হতবাক্ ডাক্তার বাবু ভেবে পাননা, যে গৃহবধূর সম্মান পেতে সব নারী আগ্রহী, তাতে পতিতা মঞ্জুর সম্মানে লাগে কি করে? ভদ্রলোকের লালসা স্নেহে পরিণত হতেই বা মঞ্জুর আত্মসম্মানে লাগে কেন?

আসলে মঞ্জুর জীবন উর্বশীর মতো-প্রজাপতির মতো। কবিগুরুর ভাষায় ঃ 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী'[৫৮] তাই স্নেহও তার কাছে অপমান। আর সর্বোপরি সে উপার্জনক্ষম এক নারী। কারোর অনুগ্রহ নিয়ে- কারোকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে তারও আত্মসম্মানে লাগে বৈকি !

এ গল্পে পতিতা নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ আধুনিক মননের আবেগে দীপ্ত। আর এ গল্পে লেখক জটিল মনস্তত্ত্বকে যেভাবে

রূপকের আবরণে গভীর সঙ্কেতময় তাৎপর্যে অন্বিত করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। গল্পটিতে চরমক্ষণ এসেছে মঞ্জুর সত্য পরিচয় জানবার মুহূর্তে। আর গল্পটির ভাষা-কৌশল লক্ষ্য করবার মতো। ডাক্তারের দুটি সত্তা অনুযায়ী ভাষা সময়ে সময়ে বদলে গেছে। ডাক্তারের উপস্থিতিতে ভাষা যেখানে শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত; অমূল্য দত্তগুপ্তর আবির্ভাবে সেই ভাষা মুহূর্তে হয়ে উঠেছে কোমল, স্বপ্নময়, আবেগ-বিহ্বল। গল্পটির নামকরণ সম্বন্ধে এটুকুই বলব যে, গল্পটির শুরুতে প্রকৃতিতে যেমন কুয়াশা, মঞ্জু মেয়েটির চরিত্রও তেমনি গল্পের প্রথম ভাগে রহস্যময় কুয়াশায় আবৃত-অস্পষ্ট। অমূল্য দত্তগুপ্ত মেয়েটির চোখে 'সাদা কুয়াশা'ও দেখেছেন। আর গল্পের শেষে ডাক্তারবাবু নিজেই কুয়াশা হাতড়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন মঞ্জুর আত্মসম্মানে কোথায় যে ঘা লেগেছে সেইটেই তিনি কোনোমতে বুঝতে পারেননি। আসলে এ কুয়াশা কেবল ডাক্তারবাবুর মনে নয়, আমাদের সমস্ত সমাজ আজও কুয়াশাচ্ছন্ন। বারবণিতার মর্যাদার আসন আজও সে কুয়াশায় খুঁজে পাওয়া যায় না। 'কুয়াশা'র রূপকে এই গভীর সাঙ্কেতিকতা গল্পের নামকরণে সার্থক ব্যঞ্জনার বিস্তার করেছে বলেই মনে হয়।

শেষ চূড়া —

এই গল্পটিতে রূপক ও সঙ্কেতময়তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে জটিল মনস্তত্ত্ব। এ গল্পের প্রধান চরিত্র স্পোর্টসম্যান ভূপেন সেন বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও নিজেকে মনে করেন যুবক। তিনি যে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, এই অনিবার্য সত্যকে অস্বীকার করবার তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা। তাই যুবতী এণাক্ষীকে নিজের শক্তি ও সাফল্যের গল্পের মুগ্ধ শ্রোতা রূপে পেয়ে ভূপেন সেন আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। কিন্তু ধূমকেতুর মতো সহসা তাঁদের মাঝখানে সুদর্শন যুবক প্রফেসরের আবির্ভাব ঘটলে, তার যৌবনের প্রাচুর্য দেখে ও তার প্রতি এণাক্ষীর স্বাভাবিক মুগ্ধতা দেখে ভূপেন সেন অক্ষম ঈর্ষায় জর্জরিত হন। প্রফেসরের কৃতিত্বকে নানা ভাবে খাটো করতে গিয়ে তিনি নিজেই হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠেন।

এই ভূপেন সেন 'কুয়াশা' গল্পের ডাক্তারের মতো রূপক-সাঙ্কেতিক স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্ন গল্পটির জটিল মনস্তত্ত্বকে দ্যোতিত করেছে রূপকের আবরণে এবং গল্পের ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতিও অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেছে। তাই গল্পটিতে এই স্বপ্নের কথা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। স্বপ্নটি হল এইরকম— ঠান্ডা-শ্যাওলা ধরা দেওয়াল, এক একটা আলো, ফাটল ধরা পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে ক্রিকেট ব্যাট হাতে ভূপেন সেন চলেছেন। স্কোর বোর্ডে তাঁর নামের পাশে নিরানব্বই উঠেছে। হঠাৎ স্কোরবোর্ড হয়ে গেল ঘুলঘুলি। সিঁড়ি চলে গেল আকাশের দিকে। সিঁড়ির শেষে বসে আছে সেই পাখি, যার সন্ধানে তিনি চলেছেন। ধবধবে সাদা তার পালক নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, শান্তি ও শুচিতায় উজ্জ্বল, বুকের কাছে সোনালি স্বপ্ন, পা দুটো চুনীর মতো কামনায় লাল, আর চোখদুটো পান্নার মতো তারুণ্যে সবুজ। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাখিটাকে ধরতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যেতেই চমক লেগে ঘুম ভাঙে ভূপেন সেনের। কিন্তু স্বপ্নটার কথা তিনি ভুলতে পারেননা— 'কোনো, মানে নেই, অথচ মনে হয় ওর একটা মানে আছে।'[৫৯]

স্বপ্নটাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আসলে বাধর্ক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ভূপেন সেনের জীবন এখন শ্যাওলা ধরা ফাটল ধরা পাথরের মতোই। অন্যের যৌবনের আলোর বল্লম এসে বেঁধে তাঁর বুকে। নিজের বয়স ও অসুস্থতাকে জোর করে ভুলতে ভূপেনবাবু তাঁর অতীত যৌবনের (৯৯ স্কোরের) স্মৃতিচারণা করেন ও নিজের বর্তমান সামর্থ্যের কথা ভুলে তাঁর অবচেতন মন পৌঁছতে চায় সবার উপরে যৌবনের আলোর আকাশে। আর সেই আকাশ থাকে তাঁর সেই স্বপ্নের পাখি-কামনায় রক্তিম, তারুণ্যে সবুজ ও তার শুভ্রতায় চিরশান্তি। বাস্তবেও ভূপেন সেন তাঁর সামর্থ্যের কথা ভুলে জোর করে অতীত-যৌবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বিজয়ী হবার আকাঙ্ক্ষায় প্রফেসর ও এণাক্ষীকে চ্যালেঞ্জ জানান পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে- 'দেখি কে আগে উঠে যেতে পারে।'[৬০] এক প্রবল উন্মাদনায় মিঃ সেন পাহাড়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু পাহাড়ের পথ যেন সেই স্বপ্নে দেখা অনন্ত সিঁড়ি। ক্রমে তাঁর বুকে চাপ সৃষ্টি হয়, পায়ে যন্ত্রণা হয়, তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন; তবু থামেননা। ধনুকের মতো শরীর নিয়ে জীবনের 'শেষ চূড়া'য় পৌঁছে বিজয়ীর শেষ হাসি হেসে তিনি ভূমিশয্যা নেন। এবার স্বপ্নে দেখা সিঁড়ি তিনি চিনতে পারেন। ক্রিকেট ব্যাট হাতে নেন, স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করতে থাকে তাঁর ৯৯ রান। না, সেঞ্চুরি নয়। সেঞ্চুরি হতে পারত যদি তিনি এই পাহাড় চূড়োতে উঠেও সুস্থ থাকতেন, বেঁচে থাকতেন। আর এ সময়েই তিনি দেখতে পান সেই স্বপ্নের পাখিটাকে। সেই পাখিটার মুখ আস্তে আস্তে এণাক্ষীর মতো হয়ে যায়।

আসলে ভূপেন সেনের শুভ্র শান্তি, সোনালী স্বপ্ন, রক্তিম কামনা ও সবুজ তারুণ্যের আধার যেন তরুণী এণাক্ষী। এণাক্ষীর ভেতর যা যা ভূপেন সেন খুঁজে পেয়েছিলেন এবং যা যা কামনা করেছিলেন, — তারই মূর্ত্ত প্রতীক ঐ পাখি। তাই জীবনের 'শেষ চূড়া'য় পৌঁছে ঐ পাখিকে স্বরূপে দেখেন ভূপেন সেন। আর অমনি সেই পাহাড়ের চূড়ো তলিয়ে যায় অন্ধকার সমুদ্রের গভীরে।

এই গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অসামান্য সৃষ্টি। এ গল্পে স্বপ্নের এক-একটি সিঁড়ি পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূপেন সেনের জটিল মনস্তত্ত্বের এক-একটি ধাপ দেখা যায়। গল্পের রূপক পাখি এনে দেয় অপরূপ রূপকথার স্বাদ, গভীর সংকেতময়তার সুদূর ব্যঞ্জনা। সঙ্কেতময়তার ধর্মানুসারে এই গল্পে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের গল্প মিলে মিশে গেছে। আবার রূপকের ধর্মানুযায়ী এই গল্পের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুটি ভাগকে বুদ্ধি দিয়ে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। সুতরাং এটি একটি সার্থক রূপক-সাঙ্কেতিক গল্প। এ গল্পে চরম ক্ষণ এসেছে পাহাড়-চূড়োয় উঠবার মুহূর্তে। গল্পটির নামকরণও সার্থক। কেননা পাহাড়-চূড়ার রূপকে এখানে জীবন ও কামনার 'শেষ চূড়া' ব্যঞ্জিত হয়েছে। ঐ পাহাড়ের পথ তাই জীবনের ক্লান্তিকর প্রতিযোগিতার পথ, আর 'শেষ চূড়া'য় পৌঁছে সব প্রতিযোগিতা সব অতৃপ্ত কামনার শান্ত চিরসমাপ্তি। গল্পটির ভাষা ইঙ্গিতগর্ভ, সাঙ্কেতিক তাৎপর্যে অন্বিত। আর গল্পের ভাব অবশ্যই একমুখী। রূপক সাঙ্কেতিক গল্পের গভীরে এক প্রৌঢ় মানুষের মনোবিকলনের জটিল সূত্র খুঁজে বেড়ানোই এ গল্পের মূল লক্ষ্য।

লালঘোড়া —

উত্তম পুরুষে কথিত এই গল্পে ছেলেবেলার মুগ্ধতা, বিস্ময়, রোমাঞ্চ সব মিলিয়ে যেন এক অপরূপ রূপকথা গড়ে উঠেছে। ঘোড়ার রূপকে মিলে গেছে জীবনের সঙ্কেত গভীর দুই সত্য 'মুক্তি আর মৃত্যু।'[৬১]

এ গল্পের লাল ঘোড়া যেন রূপকথার এক অলৌকিক পক্ষীরাজ। আগুনের শিখার মতো তার কেশর, সর্বাঙ্গে উল্কার গতি, গায়ে অদ্ভুত এক মাদক গন্ধ। খোকন মুগ্ধ বিস্ময়ে এই ঘোড়া চেয়ে চেয়ে দেখে। সহিস রামযশের উত্তেজক ও রোমহর্ষক গল্প খোকনের এই মুগ্ধ কল্পনায় ইন্ধন যোগায়।

এর মধ্যে খোকনদের গ্রামে আসে বেদের দল। তারা সামান্য ব্যাপার নিয়ে খুনোখুনি করতে গেলে, খোকনের বাবা তাদের শাস্তি দিয়ে গ্রাম ছাড়া করেন। তার জের গিয়ে পড়ে সেই লাল ঘোড়াটার উপর। পরদিন তাকে জিন পরাতে যেতেই উৎকট ভঙ্গিতে বিকট চীৎকার করে বুকের রক্ত চমকে দিয়ে লাল আগুনের ঝলক তুলে অদৃশ্য হয় লাল ঘোড়া।

খোকনের বয়স তখন সদ্য তোরো। সদ্য বাল্য থেকে সে পা বাড়িয়েছে কৈশোরের দিকে। মায়ের নিভৃত স্নেহাঞ্চল থেকে উঁকি মেরেছে রোদে-পোড়া বলিষ্ঠ নির্ভীক অনিশ্চিত জীবনের দিকে। দু' চোখে তার অদম্য কৌতূহল, বুকে তার মুক্ত প্রসারিত জীবন-তৃষ্ণা। তাই সে সাঁতরে নদীর জল তোলপাড় করে, গাছের ফল আর বুলবুলির বাচ্চা খুঁজে বেড়ায়, সাপের ভয় ভুলে তুলে আনে শিঙারা, পদ্মচাকী। এসব দুরন্তপণায় বাধা দেন না তার বাবা। শুধু ঐ ঘোড়ার পিঠে তিনি চাপতে দেননা খোকনকে। আর যেখানেই বাধা, সেখানেই আকর্ষণ হয় অপ্রতিরোধ্য। রূপকথাতে একটা বিশেষ দরজা খোলা যখন বারণ থাকে, রাজপুত্র সেই দরজা খোলার জন্য কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

আরব বেদুইনের লাগাম ছাড়া মুক্তির সন্ধানে খোকন একদিন উঠে বসেছে তার স্বপ্নের ঘোড়ার পিঠে। এতদিন খোকন স্বপ্ন দেখত, লাল ঘোড়ার পিঠে চড়ে মরুভূমি, পাহাড়, বন পেরিয়ে, পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে অনন্ত নীল আকাশে সে চলেছে। আগুন-রঙা ঘোড়া হয়ে উঠেছে পক্ষীরাজ। আর তারায় তারায় ক্ষুরের শব্দে বেজে উঠেছে মুক্তির ঝঙ্কার। সেই মুক্তির দৌড় লাগিয়েছে খোকন। বাধা-বন্ধনহীন মুক্তির উল্লাসে তার তাজা কিশোর প্রাণ মেতে উঠেছে। কিন্তু এ মোহ কাটতে তার দেরি হয়নি। লাল ঘোড়া যখন পাগলের মতো দৌড় লাগিয়েছে, তখন অনুতপ্ত ও ভীত খোকনের মনে হয়েছে 'যেকোনো সময় একটুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো উড়ে যাব আমি।'[৬২] ঘোড়ার ঘামের গন্ধের মাদক উগ্রতায় সে চেতনা হারাতে বসেছে। মৃত্যুভয়ে ঘামের স্রোত নেমেছে তার গা বেয়ে।

একসময় এই প্রাণপণ সংগ্রামের অবসান ঘটেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেছে খোকন এক অন্ধকার কবর খানায়। আর এই সময় লোলুপ হিংস্র শেয়ালের দল তার অবসন্ন শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবার জন্য এগিয়ে এসেছে। আর আশ্চর্য, যে লাল ঘোড়া খোকনকে এতক্ষণ মৃত্যু আশঙ্কায় দিশাহারা করে তুলেছিল, সেই এবার খোকনের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় নেমে এসেছে। লাল ঘোড়া তাকে বাঁচিয়েছে 'রাশি রাশি ধারালো দাঁতের আদিম হিংসা থেকে।'[৬৩] সকালে যখন খোকনের জ্ঞান ফিরেছে, তার বাবা লালা ঘোড়াকে গুলি করে মেরেছেন জেনে সে কেঁদে ভাসিয়েছে।

আজ জীবনের অনেকগুলো বছর পার করে এসে খোকন ভাবে 'লালু কেন অমন করেছিল সেদিন? সত্যিই কি ইরানীরী ঝি খাইয়েছিল তাকে? অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি না সাহারার ডাক শুনেছিল সে? কোন যুদ্ধের দামামা তালে তালে সেদিন বেজে উঠেছিল তারি বুকের রক্তে?'[৬৪] শেষ পর্যন্ত সেই দু'টি সত্যকে খোকন তথা লেখক আবিষ্কার করেছেন লালুর মধ্যে মুক্তি ও মৃত্যু। গ্রামের আস্তাবলে বদ্ধ তেজী আগুন রঙা ঘোড়া লালু একদিন মুক্তির খোঁজে বেপরোয়া হয়ে ঘর ছেড়ে অবশেষে মুক্তি লাভ করেছে মৃত্যুর মধ্যে। আর সেই সঙ্গে খোকনকেও দিয়েছে বালকত্ব থেকে মুক্তি এবং মৃত্যু-চেতনা।

গল্পটিতে রূপকের রূপকথা যেমন আছে, তেমনি আছে সঙ্কেতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। লেখকের প্রশ্নে, চিন্তায় রূপকের অন্তর্নিহিত রূপের চকিত উদ্ভাস লক্ষ্য করা যায়। আর ঐ চকিত আলোটুকুই সমগ্র গল্পটিকে আলোকিত করে। গল্পটির নামকরণও উপযুক্ত। কারণ, লাল ঘোড়াকে কেন্দ্র করেই গল্পটির সমগ্র ঘটনা, ভাবনা আবর্তিত। এই 'লাল ঘোড়া'ই গল্পের মূল রূপক চরিত্র। এমনকি গল্পের ভাষাতেওএই ঘোড়ার আগুনে রূপের স্পর্শ লেগেছে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এই গল্পটিকে মনস্তত্ত্ব প্রধান গল্পের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। নারায়ণ বাবুর গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'মনস্তত্ত্ব-প্রধান প্রথম শ্রেণীর কিছু গল্পও তাঁর আছে। দুর্ঘটনা, ভাঙ্গা বন্দর, ফলশ্রুতি, ভাঙা চশমা, লালঘোড়া, তিনজন এবং চতুর্থ ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে'।[৬৫] অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমি গোড়াতেই জানিয়েছি যে, রূপক-সাঙ্কেতিক গল্পগুলিতে মনস্তত্ত্ব একটি বড় স্থান অধিকার করেছে।

গল্পটিতে চরমক্ষণ এসেছে উপযুক্ত সঙ্কটময় পরিবেশে খোকনের লাল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবার সময়। লেখকের ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত এ গল্পে বেশ স্পষ্ট। কেননা, লেখক তাঁর 'আমার কথা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, তাঁর বাবা পুলিশের দারোগা ছিলেন, এবং লেখকের ভাষায় 'মনে পড়ছে ত্রিশ মাইল দূর থেকে ডাকাতের আস্তানায় রেইড করে তিনি ফিরে আসছেন মাঠের ওপারে সাদা আরবী ঘোড়াটার ওপরে দেখা যাচ্ছে ইউনিফর্ম পরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরো পাঁচ হাত একটি মানুষ।'[৬৬] এ গল্পে খোকনের বাবাও ঘোড়সওয়ার। সুতরাং বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে সেই ঘোড়াকে ঘিরে খোকনের মতো স্বপ্ন দেখতে লেখকের বাধা কোথায়? বস্তুত, এই গল্পে একটি ছোট্ট ছেলের মনের মুক্তির আকাঙ্খা ঘোড়াটির মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ঘোড়াটি যেন সেই মুক্তির প্রতীক। বালকের রোম্যান্টিক মুক্তি-কল্পনা এক বাঁধন ছেঁড়া দুরন্ত ঘোড়ার রূপকে প্রতীকায়িত হয়েছে।

রিবন বাঁধা ভালুক —

গল্পটিতে ভালুকের রূপকে এক আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব সঙ্কেতিত হয়েছে। বালক অঞ্জুর সঙ্গী আরতিদি। অঞ্জুর থেকে মাত্র তিন-চার বছরের বড় হয়েও সে যেন এক যুবতী। তাই অঞ্জু যখন চকমকি পাথর ঠোকে, গিরগিটির পেছনে ছোটে, কলকে ফুলের রস দিয়ে ছবি আঁকে, আরতিদি তখন তার ভাবী স্বামীর রূপ কল্পনা করে, গানের ভাষায়, সুরের দোলায় ঘটে তার যৌবনের চঞ্চল প্রকাশ। যে বিলিতি পুতুল ভালুকটাকে দেখে অঞ্জুর মনে হয় ভালুকটা বুঝি গল্পের 'গোল্‌ডিকস্' এর তিনজনের একজন, সেই ভালুককে দেখেই আরতিদি কল্পনা করে 'ও নিশ্চয় বর ভালুক বিয়ে করতে যাবে।'[৬৭]

তার যৌবন-শিহরিত কিশোরী কল্পনায় ভালুকটা বরবেশে রাতে বিছানায় নেমে আসে। তার ভাবী স্বামী মণীশকে পাবার আকাঙ্ক্ষা এই পুতুল ভালুকটার মধ্য দিয়ে এক আশ্চর্য সজীবতা লাভ করে। রূপকথার স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই পুতুল ভালুকটার প্রতি আরতিদির মুগ্ধতার ঘোর কিন্তু আকস্মিক অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে কেটে যায় গল্পের শেষ পর্বে এসে একটি সত্যিকারের হিংস্র ভালুকের আগমনে।

সুবর্ণরেখার তীর থেকে এই বন্য শ্বাপদটির তাড়া খেয়ে আরতিদির স্বপ্ন পরিণত হয় আতঙ্কে। ভালুকের রূপকে মোড়া ভাবী স্বামী মণীশ সম্পর্কে তার মনে জন্ম নেয় এক আশ্চর্য ভীতি। জ্বরের ঘোরে আরতিদি কেবল বলতে থাকে 'ওই যে ভালুকটা আসছে। না না — আমি মণীশ সেনকে বিয়ে করবনা, কক্ষনো বিয়ে করবনা।'[৬৮]

এইভাবে আরতিদির অবচেতন মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্ঠুর বাস্তব মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়। আরতিদি সভয়ে আবিষ্কার করে যে, যে পুতুল ভালুকটা শখের আলমারিতে ছিল, তা মিথ্যে এবং দুষ্প্রাপ্য এক স্বপ্ন মাত্র; সত্য সেই বনের হিংস্র ভালুক। আরতিদির মনে হয় ঠিক তেমনি মিথ্যে মণীশ সেনের শৌখিন ফটোতে বাইরের মধুর রূপ, বরং সত্য নিষ্ঠুর স্বার্থপর সংসারে কামনাময় মানুষ মণীশ সেন। তার মধ্যে রূপকথার সজীবতা নেই, অপরূপ স্বপ্নচারিতা নেই; আছে প্রত্যহের নির্জীব কুশ্রী অভ্যাসের দিনচারিতামাত্র। তাই গল্পের শেষে বয়স্ক অঞ্জুর মনে সংশয়ের দোলা লাগে 'আলমারির ভালুকটা মহুয়াবনে যে মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনি করেই কি আরতিদির জীবনে ফোটো থেকে নেমে এসেছিল মণীশ সেন? দুটো কি এক হতে পারে? দুটো কি এক হতে পারেনা?'[৬৯]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রূপক-সাঙ্কেতিক গল্পে এভাবে সর্বদাই মনস্তত্ত্বের জটিল রূপ-রেখা মিলে মিশে যায়। আর 'কুয়াশা' 'লালঘোড়া' প্রভৃতি রূপক সাঙ্কেতিক গল্পের মতোই এ গল্পের শেষেও আছে বিস্মিত জিজ্ঞাসা। নারায়ণবাবুর এই ধরনের গল্পগুলি যেন রূপকের মোড়কে মোড়া মনস্তত্ত্বের এক জটিল গোলকধাঁধাঁ, যার প্রতিটি বাঁকে উজ্জ্বল দর্পণে শাণিত সঙ্কেতের প্রতিফলিত ঝলক চোখে লাগে। এ গল্পে লেখক যে নিপুণতায় ও কৌশল চেতন-অবচেতন মনকে মিশিয়ে দিয়েছেন ও ভালুকের রূপকে তাকে ব্যক্ত করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীর মানসিক পরিণতির যে ফারাক, তা কলমের সামান্যক'টি আঁচড়েই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের স্বচ্ছন্দতা ও সাবলীলতা কিন্তু গল্পের শেষ

পর্বে নষ্ট হয়েছে জীবন্ত ভালুকের আকস্মিক ও অতি-নাটকীয় আবির্ভাবে। গল্পটিতে চরমক্ষণও এসেছে এই সময়ে। আর 'রিবনবাঁধা ভালুক'কে কেন্দ্র করেই গল্পের সব ঘটনা ও ভাবনার বির্বতন ঘটেছে। সুতরাং গল্পটির নামকরণও সার্থক।

কালপুরুষ —

এ গল্পে কোন গল্প বা ঘটনা নেই। একটি নাটকের উপস্থাপনায় কিছু আপাতঃ-বিচ্ছিন্ন দৃশ্য — তথা চিত্রের সমাবেশে গল্পটির আবহ গঠিত। গল্পটির শেষে লেখক বলেছেন 'এ নাটক ট্রাজেডি, কমেডি, রূপক না প্রহসন তা আমি জানিনা,'[৭০] বস্তুতপক্ষে এতে ট্রাজেডি, কমেডি, রূপক, প্রহসন সবকিছুরই লক্ষণ অল্পবিস্তর আছে। তবে রূপকের আবরণেই গভীর সঙ্কেতকে দ্যোতিত করে গল্পটি বর্ণিত। গল্পটির মধ্যে আগাগোড়াই বর্তমান যুগ ও জীবনের গভীর ট্রাজেডি নিহিত; আবার গল্পটির কোথাও কোথাও দেখা যায় ব্যঙ্গের চকিত স্ফুরণ। যেহেতু রূপকের পাত্রে বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনের গরল এ গল্পে পরিবেশিত হয়েছে গূঢ় সঙ্কেতের অঙ্গুলি স্পর্শে, সেহেতু মনে হয় গল্পটিকে রূপক-সাঙ্কেতিক গল্প বলাই যুক্তিযুক্ত।

বস্তুত, গল্পটি লেখকের যুগ-চেতনার ফসল। বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবিশ্বাস, সংশয়, দুর্ভিক্ষ, বস্ত্র-সংকট, চোরাকারবার, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অবক্ষয় ও সঙ্কট মানুষের মূল্যবোধে আঘাত হেনেছিল। তাই এ গল্পে নাটকের নায়ক বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে মানবিক ন্যায়পরতার বিশাবাসের প্রতি বিদ্রূপ, অনিশ্চিত সংশয়াকুল জীবন ও শোষিত মানুষের নিপীড়িত অন্তরাত্মা-এই ত্রিবিধ শূন্যতা নিয়ে মধ্যবিত্তের বিংশ শতকের মঞ্চে পদক্ষেপ করেছে।

নাটকের বিশৃঙ্খলিত পরিবেশ বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খলিত শাসন-ব্যবস্থা ও জীবনকে ইঙ্গিত করেছে। নাটকের প্রথমে তিনটি মেয়ের প্রবেশও সঙ্কেতবহ।

শিউলিফুলের মালা হাতে মেয়েটি শৈশবের স্বপ্ন, ধানের মঞ্জরী হাতে মেয়েটি অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি, আর যে মেয়েটি ছবিতে রঙ লাগায় ও গানে সুর ফোটায়, সে প্রিয়তমা — যৌবনের রোম্যান্টিক স্বপ্ন।

এসব অতীতের স্বপ্ন থেকে নায়ক নেমে আসে বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার নিষ্ঠুর লোহার গরাদের ভেতর। শোষকের বিদ্যুৎ — চাবুকের আঘাতে শোনা যায় শোষিতে বুক ফাটা চিৎকার। নায়ক এর প্রতিবাদ করতে চায়, হাত তুলে দেয় অভিসম্পাত। যুগান্ধকারের পটভূমিতে এবার অসংলগ্ন ছেঁড়া ছেঁড়া সুররিয়ালিস্টিক ছবি তৈরী হয়। অর্থাৎ অবচেতনার অস্পষ্ট রেখা নায়কের মনের আবহ রচনা করে। বর্তমান যুগ-সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তি পেতে নায়ক অতীতের স্বপ্ন-জগতকে আশ্রয় করতে চায়। এরপর আসে একদল লোক, তাদের হাতে কামনায় সর্পিল 'সাপের খোলস।' তারা কামনা-পঙ্কিল পথে নায়ককে টেনে নামাতে চায়। কিন্তু সে বর্তমান যুগের নীতিহীন, পঙ্কিল জীবনযাত্রার তালে তালে পা মেলাতে পারেনা। 'একটা অদ্ভুত শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণায় সে যেন ছিন্ন বিদীর্ণ হয়ে'[৭১] লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।'

এবার মঞ্চে বয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়া, বোমার বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায, বেহালার করুণ সুরে শোনা যায় যেন হতভাগ্য মানুষদের চাপা ক্রন্দন। এ ঝড় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী ঝড় আর ও কান্নার সুর ঐ যুদ্ধেরই ফলশ্রুতি।

এরপর এই অন্ধকার অনিশ্চিত যুগে নায়ক পথ খোঁজে। তাকে পথ দেখাবার নাম করে অজানা মন্দ লোকেরা ঠেলে দেয় পরা-বাস্তবতার অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন পথের দিকে। পরিবর্তে নেয় তারা নায়কের কৈশোর, যৌবন ও অতীত সমৃদ্ধির সুখস্মৃতি।

এবার শ্যাওলা, কঙ্গাল, চোরাবালি, ধূ ধূ আকাশ এক ভয়াবহ পরিমণ্ডল তৈরি করে মঞ্চে। শ্যাওলা-পিছল বর্তমান জীবনের পথ, দুর্ভিক্ষের ধূ ধূ আকাশ, কঙ্কাল, কামনার চোরাবালি এ যুগকে গ্রাস করেছে। তারই প্রতীক এইসব। তাই যন্ত্রণা-কাতর নায়কের বুকে ঝরে পড়ে রক্ত। কঙ্কালের হাত, শ্যাওলা, ক্যাকটাসের বিষাক্ত কাঁটা তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, চোরাবালি টানে পা। এবার বর্তমান যুগের পাপের চোরাবালি তাকে গ্রাস করতে চায় — ক্যাকটাসের কাঁটায় হৃদয় দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়। এ যেন তার পুরাতন মূল্যবোধের সঙ্গে বর্তমানের আগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্ব। তাই এরপরেই মঞ্চে তৈরি হয় যন্ত্র-সভ্যতার আবহ। উঁচু বাড়ি মাথা তোলে, কারখানার চিমনি দেখা যায়, ক্রেন ওঠে নামে, গাড়ির হর্ণ, জাহাজের ভোঁ শোনা যায়।

এ গল্পের নাটকে মুখোশ নৃত্যটিও রূপক-সাঙ্কেতিক। নেকড়ে বাঘ হরিণের সঙ্গে ভাব করতে চায়, শেয়াল মুরগী পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে রসালাপ করে। অর্থাৎ শোষক, শোষিতের সঙ্গে মিথ্যে একাত্মতার অভিনয় করে; যুগের ভণ্ডামি সঙ্কেতিত হয় এভাবে নেকড়ে - হরিণ, শেয়াল-মুরগীর রূপকে।

এরপর নিষ্ঠুর কামনা আসে একটি নারীর রূপ ধরে 'তার নাক নেই — চোখ নেই — ঠোঁট নেই,'[৭২] সে পাথরের ফাটলে একটি স্নেহজলের বিন্দুও নেই। তার কামনার অধীর নায়ক তার পাষাণরূপ দেখে নিজেও যেন পাথর হয়ে যায়। আবেগ — বিবেকহীন এ নিষ্ঠুর সভ্যতার যুগে তার হাঁটাচলাও হয়ে যায় রোবটের মতো। অন্ধকারে নিষ্ঠুর বৃদ্ধ প্যাঁচার মধ্যে

নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সে চমকে ওঠে। প্যাঁচার উপমা এখানে জীবনানন্দের কথা মনে করায়। প্যাঁচার মতো অভিজ্ঞ শিকারীর অনুসন্ধিৎসা এ যুগের স্বার্থপর মানুষের মৌল লক্ষণ। ক্রমে মুণ্ডকাটা শবদেহে, সাপের শিষে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে পাগল হয়ে ওঠে নায়ক। 'মুণ্ডহীন শবদেহ' এখানে বিবেক-বুদ্ধিহীন জড়বৎ মানুষদের কথা ও 'সাপ' বিষাক্ত কামনার সঙ্কেত দ্যোতিত করে। এদের হত্যা করতে গিয়ে নায়ক নিজেকেই তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে। আসলে যুগ আত্মহত্যারই যুগ।

আর গল্পের শেষে দেখা যায় নায়কের শবদেহের মাথার কাছে ফণা ধরে আছে সেই সাপটা, যা বিসর্পিল কামনারূপী এ যুগের গরল-ভাণ্ডার। এইসব বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকে আদৌ গল্প বলা চলে কিনা সন্দেহ আছে। সাম্প্রতিক কালে গল্পহীন গল্পের যে ধারা আছে, এটি তারই পর্যায়ভুক্ত — প্রতীকী চেতনায় ন্যস্ত কিছু আপাতঃ বিচ্ছিন্ন গভীর অর্থবহ দৃশ্যের সমষ্টি। এখানেও চরমক্ষণ এসেছে গল্পের শেষমুহূর্তে নায়কের আত্মহননের সময়। গল্পটি ভাবের দিক থেকে একমুখী - আগাগোড়া সভ্যতার নিষ্ঠুর ভয়ালতা ও পঙ্কিলতাকে ফুটিয়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। গল্পটির গঠন চূড়ান্ত নাটকীয়। ভাষা ইঙ্গিতগর্ভ। 'কালপুরুষ' নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আকাশে কালপুরুষ যেমন বিশেষ একটি দিককে নির্দেশ করে, তেমনি এখানে 'কালপুরুষ' বিশেষ করে একটি কালকে নির্দেশ করেছে। আকাশের কালপুরুষকে শিকারী যোদ্ধারূপে কল্পনা করা হয়, এ গল্পের কালপুরুষও কালের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে।

পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্বমূলক গল্প —

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ — এর ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি ও এর ফলে জাত যন্ত্র-সভ্যতার আবির্ভাব, কালোবাজারী, শোষণ — মানুষের জীবন-যাত্রা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ভিটে-মাটির মোহ ত্যাগ করে মানুষ পা বাড়িয়েছিল জীবিকার অন্বেষণে। অর্থনৈতিক শোষণ তাদের ভিতর রোপণ করেছিল সাম্যবাদী বিপ্লবের বীজমন্ত্র। নূতন যুগের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ প্রাচীন সংস্কারের অসাড়তাকে দেখতে পেয়েছিল। আবার যুগের ধারায় গা ভাসিয়ে বহু মানুষ তাদের পুরানো আদর্শ-ধ্যান-ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে ঝুঁকেছিল নৈতিক অবনমনের দিকে। বস্তুবাদী চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়েছিল তাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ। আবার কিছু মানুষ অতীতকে আশ্রয় করেই বাঁচতে চেয়েছিল। তাই এযুগে শুরু হয়েছিল নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। মানুষের মনও এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে-সংশয়ে হয়েছিল জর্জরিত। সেই চিন্তা ভাবনার প্রতিচ্ছায়া খুব স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছে সে যুগের সাহিত্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর,' 'রায়বাড়ি', 'পিতাপুত্র', 'ময়দানব' প্রভৃতি গল্প, পরশুরামের 'রাতারাতি', 'বর-নারীবরণ', 'আনন্দবাঈ', সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' প্রভৃতি গল্প এর উদাহরণ। যুগ-সচেতন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও এই যুগ-সন্ধির টানা-পোড়েন স্পষ্ট। সুচিত্রা সেন চন্দ্রের মতে — 'নারায়ণবাবুর শিল্পী — চেতনার মর্মমূলে রাষ্ট্রীক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ জাগিয়েছিল-তারই প্রকাশ তাঁর সৃষ্টিতে।'[৭৩] আবার রবিন পাল এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন নারায়ণবাবু সম্পর্কে। রবিনবাবুর ভাষায়— 'নতুন কাল, নুতন দৃষ্টিভঙ্গীর দিকেই তিনি বেশী আগ্রহী।'[৭৪] আসলে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অতীত স্মৃতির প্রতি মমতা নারায়ণবাবুর যেমন গভীর, তেমনি নবীনকে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। আবেগ ও যুক্তিবাদিতার দ্বিমুখী অবস্থান তাঁর চরিত্রে আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত তাঁর 'সুনন্দর জার্নাল' — এর অন্তর্গত 'ইতিহাসের মৃত্যু' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। এ প্রবন্ধে নারায়ণবাবু বলেছেন — 'নতুনকালের কাছে আজ আত্মবলি দিচ্ছে ইতিহাস। দুঃখ করবার কোন অর্থনেই। মানুষের দাবী, প্রয়োজনের দাবি, যুগের দাবি। .... তবু সুনন্দর মতো সাধারণ মানুষের মনে হবে — এক বিপুল অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র আমরা ছিন্ন করে ফেলছি'। ('সুনন্দর জার্নাল' ১৩৮৪, পৃঃ ১০৫) এবার তাঁর এ ধরনের কিছু গল্প আলোচনা করছি।

ভাঙ্গাবন্দর —

এই গল্পে আছে অতীতের ঐতিহ্যময় স্মৃতিচারণা। বস্তুত, বর্তমান যুগের অবনমিত রূপ দেখে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উট' কবিতার উটের মতো বেশ কিছু মানুষ অতীতকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছিল। এই পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় আছে এই গল্পে।

নায়েব শ্রীধর মিত্তির ভাঙ্গা বন্দরের অতীত ঐশ্বর্যের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বর্তমানের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও অনীহা সুস্পষ্ট। তাই বর্তমান থেকে অতীতে তিনি প্রায়ই চলে যান এবং মনে মনে আশা করেন 'এই বন্দর হয়তো আবার তেমনি করেই উঠবে বড় হয়ে। .... আবার এই বন্দরে কোটি টাকার লেনদেন চলবে, দক্ষিণের তালবনটার পাশ ঘেঁষে চীনাবাজার বসবে আবার।'[৭৫]

বর্তমান বন্দরের ভগ্নদশা মিত্তিরবাবুকে ব্যথিত করে। মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া ব্যবসা, ভাটিয়াদের লাখ লাখ টাকা মুনাফা দেখে মিত্তিরবাবুর মনে পড়ে পঁচিশ বছর আগে এ তল্লাটে হিন্দুদের একাধিপত্যের কথা। সেইসব সমৃদ্ধ বংশের উত্তরসূরীরা আজ মেয়েমানুষের পেছনে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে দেখে মিত্তির মশাই ক্ষেপে ওঠেন - 'একটা বন্দুক দিতে পারো আমাকে, বন্দুক ? .... গুলি করব - গুলি করে মেরে ফেলব সব'।[৭৬]

এই নীতিবাগিশ মিত্তিরবাবুই আধুনিক যুগের ম্যানেজারকে এই বন্দরের অতীত ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে বারবার অবজ্ঞা ও বিদ্রূপে বিদ্ধ হয়ে অবশেষে মরীয়া হয়ে তাকে মেয়েমানুষের লোভ দেখিয়ে অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্বে জয়ী করতে চেয়েছেন অতীতকে। এখানেই এসেছে গল্পের চরমক্ষণ ও চরম ট্রাজেডি। এইভাবে চরম মিথ্যা ও অসম্মানের কাছে আত্মবিক্রয় করেও মিত্তির বাবু বর্তমানকে জয় করতে পারেননি। তাই চূড়ান্ত লজ্জা ও অপমান মাথায় নিয়ে তিনিও এই বন্দর সম্পর্কে ম্যানেজারবাবুর মতো নিরাসক্তির স্তরে এসে গেছেন। বুঝেছেন 'ভাঙা বন্দর কোনদিন আর জোড়া লাগবেনা।'[৭৭] এপ্রসঙ্গে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন মিত্তিরবাবুর 'এই পরম অসত্যের কাছে আত্মবিক্রয়ের চরম পরাজয় আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এই ধরনের অতীত-বর্তমানের দ্বন্দ্বের গল্প তারাশঙ্করের হাতে আগেও শিল্পরূপ পেয়েছে। তার মধ্যে বাস্তবের ভয়ঙ্করতা আছে, বলিষ্ঠতা আছে, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে তার সঙ্গে কাব্যময় ব্যঞ্জনা এবং দ্রুতগতিশীল ভাষা সহযোগিতা করে পরাজয়ের আন্তরিক গ্লানি বর্ণনাকে প্রতীকের আলোকে উদ্দীপ্ত করেছে।'[৭৮] 'ভাঙা বন্দর' গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে শান্তভাবে অনিবার্যকে মেনে নেবার ট্রাজেডিতে। নারায়ণবাবুর অধিকাংশ গল্পে এইভাবে অনিবার্য সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। লেখকের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে এর মূলে। আবার অন্যদিকে এমনিধারা হাজার শ্রীধর মিত্তিরদের জন্য লেখকের সমবেদনা প্রচুর। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা সুগভীর, আবেগ আন্তরিক। কিন্তু লেখক এই আবেগকে প্রশ্রয় দেননি। এখানেই তিনি যুক্তিবাদী ও আধুনিক।

'ভাঙা বন্দর' যে ভাঙাই, আর কখনো জোড়া লাগবেনা-এসত্যের ইঙ্গিত গল্পের নামকরণেই স্পষ্ট। এই 'ভাঙা বন্দর' শ্রীধর মিত্তিরদের মতো মানুষের মনকে কেমন করে ভেঙে দেয়, তাও এ গল্পে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া 'ভাঙা বন্দর'কে কেন্দ্র করেই এই গল্পে চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বিষয়, ভাব— সবদিক থেকেই গল্পটির নামকরণ যথার্থ। গল্পটিতে অন্য কোন ভাবনা বা ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তাই গল্পটিতে প্রতীতির একমুখিতা রক্ষিত হয়েছে। ফলে সার্থক ছোটগল্প হিসেবে গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে লেখা সমরেশ মজুমদারের 'জায়গা' নামক গল্পটিতে এ গল্পের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। কারণ ওই গল্পটিতে নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব আছে এবং সেই দ্বন্দ্বে আহত বৃদ্ধ হরিহরবাবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বদলে যাচ্ছে সেই দুঃখে নিজের মৃত্যু কামনা করেছেন। অতীতের জন্য এই দীর্ঘশ্বাস ও বর্তমানের অনিবার্য অগ্রগতি 'ভাঙা বন্দরে'র মতো 'জায়গা' গল্পেরও মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে।

উস্তাদ মেহের খাঁ —

এ গল্পের একদিকে আছে প্রাচীন ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সুখস্মৃতি, অন্যদিকে আছে নিষ্ঠুর, হিংস্র বর্তমান কাল। একদিকে খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুংরী-টোরী রাগের মূর্চ্ছনা, অন্যদিকে বিলিতি গিটারের লঘুসুর, চটুল ফিল্মিগান। একদিকে দিল্লীর বনেদী ঘরায়ানা, নবাবী হিরে মুক্তোর তাজ, আরেকদিকে আধুনিক কলকাতা নিরলঙ্কার, উদ্ধত, হিংস্র।

এই নূতন ও পুরতনের দ্বন্দ্ব এ গল্পে আগাগোড়া যেন সাদা-কালো দাবার ছক বুনেছে। আর সঙ্গীত-প্রেমী ওস্তাদ মেহের খাঁ এই ছকের গোলকধাঁধায় ঘুরতে-ঘুরতে একসময় কিস্তিমাত হয়ে গেছেন।

ওস্তাদজী পুরোনো যুগের মানুষ। প্রাচীন ঘরানার বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর আলাপ বেজে ওঠে তাঁর রক্তে। তাই এখনকার চটুল আধুনিক গান তাঁকে কষ্ট দেয়, যদিও তিনি জানেন - 'যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি আওরি।'[৭৯]

তাই ওস্তাদজীর উত্তর-পুরুষরা বাঁশি বাজায়, গীটারে লঘু সঙ্গীত বাজায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওস্তাদজীর শিষ্যের পুত্র শঙ্কর ওস্তাদজীর গানকে ব্যাকরণের নীরস পণ্ডিতি বলে বিদ্রূপ করে। কলকাতার গলির অন্ধকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছুরি ঝলসে ওঠে। আর সঙ্গীত জগতে আত্মহারা ওস্তাদজী ডুবে থাকেন সুরের গভীরে— অতীত স্মৃতিচারণার মায়াজালে। মিএগাকি টোড়ীর সুরমূর্চ্ছনায় আশিক বাঈয়ের ঝুটা প্রেম এখনও তাঁকে হাতছানি দেয়। জগদীশ ভট্টাচার্য এই গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন '..... পিয়ারীর প্রেমের প্রতিদান মিললনা, প্রেমিক হল দেওয়ানা। কিন্তু জীবনের অপরাহ্নে শিল্পী তাঁর নিজের জগৎকে খুঁজে পেয়েছিল। টোড়ী রাগিণী মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় ভালবাসা আর বিরহের অশ্রু। একজনের চোখের জল যদি সত্য নাই হয় তবু আরো হাজার হাজার ভাগ্যবানের জীবনে টোড়ী রাগিণী চিরন্তন হয়ে থাকতে পারে। তাই তিনি তাঁর শেষ অর্ঘ্য তুলে দিতে চেয়েছিলেন কন্যাপ্রতিম শিষ্যার হাতে। কিন্তু সেখানে সন্দেহ, এবং তারই পরিণাম হিসেবে হল শিল্পীর অপমৃত্যু।'[৮০] হিংস্র, কুটিল, আধুনিক কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হলেন ওস্তাদজী। জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে 'মানুষের পশু-হাতে শিল্পীর মৃত্যুতে কলকাতা দাঙ্গা অধিকতর কলঙ্কিত হয়েছে।'[৮১] এবং সর্বোপরি 'এ কাহিনী ক্ষণকালের মধ্যেই বিন্যস্ত বটে, কিন্তু সুরময় পৃথিবীর আকাশ এ গল্পের আবেদন কি কোনো বিশেষ কাল বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে?'[৮২] সত্যই এই গল্পটি অতীত ও বর্তমান দু'টি কালকে স্পর্শ করেও নিরবধিকালের অসীম

আকাশে মুক্তির সম্ভাবনায় দ্যুতিমান।

গল্পটি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত হলেও ভাব-প্রধান। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত এ গল্পে স্পষ্ট। এ গল্পেও লেখক প্রাচীন সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মমত্বময়; কিন্তু অসহায়ভাবে উদ্ধত নবীনের হিংস্র আবির্ভাবকে তিনি মেনে নিয়েছেন। গল্পটিতে রাগ-রাগিণীর মায়াজাল এক আশ্চর্য অতীতের স্বপ্ন-জগত নির্মাণ করেছে। লেখকের সঙ্গীত-প্রীতি ও সঙ্গীত-চেতনার পরিচয় এ গল্পে স্পষ্ট। ওস্তাদজীর শিল্পী-সত্তা এ গল্পে শৈল্পিক সুষমা সৃষ্টি করেছে। গল্পে চরমক্ষণ এসেছে শেষভাগে। গল্পটির ভাষা রমণীয়। সমাপ্তিতে নাটকীয় চমক আছে। সব মিলিয়ে গল্পটি যেন বর্তমানের পল্‌কা সুতোয় গাঁথা অতীত মুক্তার মালা। বর্তমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছুরিকাঘাতে মালাটি ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলি তখনো অমূল্য।

ওস্তাদজীকে কেন্দ্র করেই গল্পের ঘটনা ও ভাবনা বিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং গল্পটির নামকরণ সার্থক। প্রসঙ্গত, বুদ্ধদেব বসুর 'ওস্তাদজী' নামক গল্পটির কথা মনে পড়ে। সেখানেও আধুনিক ফিল্মী গানের চটুলতার সঙ্গে পুরানো ঘরানার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংঘাত বেধেছে।

মমি —

এই গল্পটিতে এক ভয়ানক রসাশ্রিত অপ্রাকৃত পরিবেশে পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব দ্যোতিত হয়েছে। এখানে পিতা পুরাতন ও পুত্র বর্তমান সভ্যতার প্রতিনিধি। অতীতের উচ্ছৃঙ্খল ধনী পুরুষ রত্নেশ্বর রায়ের ব্যাধি-বিকৃত রূপ যেন প্রাচীন মিশরের 'মমি।' তাঁর পুত্র মণীন্দ্র সংস্কার মুক্ত আধুনিক যুবক। আধুনিক কম্যুনিজমের স্বপ্ন দেখে সে— 'নতুন পৃথিবী সূর্যালোকিত দিগদিগন্ত।'[৮৩]

রত্নেশ্বর রায় প্রাচীনযুগের কুসংস্কার, ব্যভিচার ও সীমাবদ্ধতার মূর্ত প্রকাশ। তাই তাঁর চিন্তা ভেনাসের নগ্নমূর্তি আর পূর্বপুরুষের ছবির ভিতরেই সীমাবদ্ধ। জমিদারী অত্যাচার ও যৌনতার যথেচ্ছাচার তাঁর কাছে পাপ নয়, গর্বের বস্তু। তাই বংশগত উচ্ছৃঙ্খলতা নিজের পুত্রের মধ্যে না দেখে তিনি আহত হন। আর যখন শোনেন যে, তাঁর রক্ষিতার মাসোহারা তাঁর পুত্র মণীন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে এবং জমিদারি লাটে উঠিয়ে সে প্রজাকল্যাণের দিকে ঝুঁকেছে; তখন 'মরফিয়ার বিষাক্ত স্পর্শে' রত্নেশ্বর রায়ের শরীরের রক্ত 'বিষ জ্বালার মত জ্বলে ওঠে।'[৮৪]

এরপরই শুরু হয় পিতা-পুত্রের তথা অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সংযমের দ্বন্দ্ব, নিস্প্রাণ ভয়াল রহস্য ও প্রাণময়তার দ্বন্দ্ব, অন্ধ কুসংস্কার ও যুক্তিবাদিতার দ্বন্দ্ব। বস্তুত, গল্পের এই অংশটি নাটকীয় দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। প্রথমে রত্নেশ্বর রায় যাদুকরের মতো পুত্রকে সম্মোহিত করেন। তাঁর সর্বাঙ্গ ঘেরা রহস্যের অবিচ্ছেদ্য কালো ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে বস্তুবাদী মণীন্দ্রর দৃষ্টি চলেনা। রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তার মনে হয় অভিশপ্ত বাড়িটায় পূর্বপুরুষের আত্মারা নেমে আসে। রত্নেশ্বর রায় কুলদেবতার মন্দিরের অলৌকিক ভীতিকর পরিবেশে পুত্রকে এনে তাকে রায়বংশের মর্যাদা রক্ষার প্রতিজ্ঞা করতে বলেন। কুলদেবীর বিভীষণা রূপ তার লেলিহান জিভে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্তের কাল্পনিক রূপ, রত্নেশ্বর রায়ের মমির আগুনচোখ ব্যক্তিত্ব— তাঁর জীবনাতীত অপ্রাকৃত শক্তি ক্রমে মণীন্দ্রকে অভিভূত করে ফেলে। 'জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম চলে। কিন্তু যেখানে জীবন নেই সেখানে?'[৮৫] এখানেই এসেছে গল্পে টান টান উত্তেজনার চরম মুহূর্ত।

কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও জীবনীশক্তির বলে মণীন্দ্র অবশেষে নিজেকে সংযত করে নেয়। রত্নেশ্বর রায়ের মমির আগ্নেয় চোখে আগুন নিভে গিয়ে জল পড়তেই মণীন্দ্র অনুভব করে 'রত্নেশ্বর রায় মমি নন .... মানুষ।'[৮৬]

এইভাবে প্রাণশক্তির কাছে— যুক্তিবাদী বর্তমানের কাছে রত্নেশ্বর রায়ের পুরাতন জীবনাতীত শক্তি হেরে যেতেই মণীন্দ্র জেগে ওঠে। নেশাচ্ছন্ন, পরাজিত, অসহায় পিতাকে সে বলিষ্ঠ দু'হাতে ধরে সহানুভূতির সঙ্গে আলোর পথে নিয়ে যায়।

গল্পটি অত্যন্ত নাটকীয়। অতীতের নঞর্থক ও বর্তমানের সদর্থক দিকটাই এই গল্পে প্রধানত প্রকাশিত হয়েছে। ভয়ানক রস এ গল্পের প্রধান উদ্দীপকরূপে কাজ করলেও, গল্পটির বিষয়-বস্তু হল পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব। মূল বিষয় থেকে গল্পটি ক্ষণিকের জন্যও চ্যুত হয়নি।

গল্পটির ভাষা নাট্যগুণান্বিত এবং ভয়ানক রস সৃষ্টির উপযোগী। আর গল্পটির নামকরণও ইঙ্গিতগর্ভ। অতীতের রত্নেশ্বর রায় এযুগে মৃত এক 'মমি' মাত্র, এক অশরীরী উপলব্ধিমাত্র। তাই বর্তমানের প্রাণময়তার কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পিতাপুত্র' নামক গল্পটির কথা মনে পড়ে। সেই গল্পেও পিতা ও পুত্রে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে।

সৈনিক –

গল্পটিতে পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব অনেক প্রত্যক্ষ ও প্রবল, এবং স্থানে স্থানে তা হৃদয়বিদারী। বস্তুত, এখানে প্রাণশক্তি পুরাতন যুগের ও যন্ত্রশক্তি নূতন যুগের প্রতীক।

পুরাতন যুগের প্রতিনিধি এই গল্পে জমিদারের হাতি নীলবাহাদুর। যৌবনে সে অমিত শক্তিধর এবং হস্তিনীর কামনার পাত্র। কিন্তু তার বৃদ্ধ বয়সে জমিদারের পুত্র ইন্দ্র চৌধুরী তার মনিব হল। সে আধুনিক যুগের যুক্তিবাদী মানুষ। আধুনিক সভ্যতার জটিল কূট-কৌশলও তার করায়ত্ত। তাই এককালের আদরের হাতি নীলবাহাদুর নয়, তার বাহন নতুন যুগের গাড়ি অষ্টিন; এবং বিদ্রোহী সাঁওতালদের দমন করতে নিষ্ঠুর চক্রান্তে ক্ষুধায় আকুল করে নীলবাহাদুরকে আদিম পশুবৃত্তিতে হিংস্র করে তুলে সাঁওতালদের ক্ষেতে ছেড়ে দিতে ইন্দ্র চৌধুরীর বাধেনা। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় ‘ পরিচিত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে আজ আর নীলবাহাদুর নবাগত অতিথি নয়, বুভুক্ষায় অন্ধ তাড়নায় আজ সে অত্যাচারীর হাত হিংস্র সৈনিকমাত্র।’[৮৭] ফলত, সাঁওতালদের বিষাক্ত তীরে নীলবাহাদুরের মৃত্যু ঘটে ঠিকই, তবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নূতন যুগের বাহন অস্টিন গাড়িটিকে সে তার দেহের চাপে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। এইভাবে ‘নতুন যুগের প্রজা ও জমিদারের দ্বন্দ্বে সৈনিক হিসেবে সে শুধু প্রাণই দিলনা, এই দ্বন্দ্বের স্বরূপটিও উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে গেল।’[৮৮] প্রাণশক্তির কাছে হেরে গেল যন্ত্রশক্তি। বর্তমান যন্ত্র সভ্যতা যে ‘পাখির বাসা’র মতোই ভঙ্গুর, তা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল নীলবাহাদুর।

গল্পটিতে নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব হাতি নীলবাহাদুরের ঈর্ষা ও বেদনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আবেগময় ভাষায় — ‘সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আসামের পাহাড়ে সেই হিংস্র মদমত্ত যৌবন যেন বহুদিন পরে ফিরে আসে নীল বাহাদুরের শিথিল শরীরে। মদস্রাবী গ্রন্থিতে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। .... এক আছাড়ে ওই জানোয়ারটাকে কি ধুলো করে উড়িয়ে দেওয়া যায়না?’[৮৯]

এই গল্পের চরমক্ষণ এসেছে ক্ষুধার্ত নীলবাহাদুরকে জঘন্য চক্রান্তের শিকার করে টোপ হিসেবে সাঁওতালদের শস্যক্ষেত্রে ছেড়ে দেবার সময়। গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে নাটকীয়ভাবে প্রতীকী দ্যোতনায়। গল্পটিতে বর্তমানের মেকী যান্ত্রিক যুগের কুটিল চক্রান্তের প্রতি লেখকের ঘৃণা স্পষ্ট। এ যুগের শিক্ষিত মানুষের আত্মপরিচয়মুখিতা ও অকারণ অনুসন্ধিৎসা যে লেখকের বিরক্তির কারণ, তাও এ গল্পে স্পষ্ট। তাই ইন্দ্রচৌধুরী সাঁওতালদের টিলা খুঁড়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার করে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখলে ম্যানেজার নৃসিংহ ভেবেছে ‘অতীতের ইতিহাস! অতীতেই যা শেষ হয়ে গেছে, মাটির তলায় যা আত্মগোপন করেছে, বাইরের আলোকে তাকে টেনে আনবার, উদ্‌ঘাটিত করবার সার্থকতা কোথায়। মৃত যে, তাকে মৃত্যুর মধ্যে শেষ করে দেওয়াইতো ভালো। আজ অতীতের ভাঙা কবরের ওপর নতুন যুগের মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে, ফলে-ফসলে তাকে জাগিয়ে তুলেছে নতুন প্রাণের মধ্যে। সেই জীবন্ত মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর কঙ্কালকে পুজো করতে হবে এ কোন্ দেশী খেয়াল?’[৯০]

এখানে আবার যুক্তিবাদী, আধুনিক-মনস্ক, প্রাণশক্তির পূজারী লেখক নবীনের বন্দনা করেছেন।

গল্পটির নামকরণ তাৎপর্যময়। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে— তথা প্রাণশক্তি ও যন্ত্রশক্তির দ্বন্দ্বে হাতি নীলবাহাদুর ‘সৈনিক’-এর মতোই প্রাণ দিয়েছে। নীলবাহাদুরের মর্মান্তিক নিষ্ঠুর মৃত্যুতে গল্পটি শেষ হলে ট্রাজেডিই প্রধান হত। কিন্তু মৃত্যুর সময় নীলবাহাদুর তার প্রতিদ্বন্দ্বী অস্টিন গাড়িকে গুঁড়িয়ে দিতেই গল্পটির সেই মূল দ্বন্দ্বের সুর ও তার পরিণামের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ময়দানব’ গল্পেও নতুন যুগের যন্ত্রশক্তির সঙ্গে পুরাতন যুগের প্রাণশক্তির বিরোধ ঘটেছে। কিন্তু এই গল্পের পরিণামে যন্ত্রশক্তিই প্রাণশক্তিকে পিষে মেরেছে। আসলে তারাশঙ্কর ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা উভয়েই নতুনের অনিবার্য আবির্ভাবকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু নতুন যুগের নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক নির্মমতাকে ঘৃণা করেছেন।

‘সৈনিক’ গল্পটি হাতিকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আদরিণী’ গল্পের মতো এতে মানুষ ও পশুর ভিতরকার বাৎসল্য রসই প্রধান নয়। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় ‘সৈনিক’ গল্পের ‘নীলবাহাদুর ব্যক্তি সম্পর্ককে অতিক্রম করে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।’[৯১] আর গল্পটি পড়লে দেখা যায়, এ জনজীবন নূতন ও পুরাতনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।

অতিপ্রাকৃত ও বীভৎস রসের গল্প

এই ধরনের গল্পে বাস্তবে অসম্ভব এমন রহস্যময় গা-ছমছম পরিবেশে বীভৎস বিভীষিকার ছায়া পড়ে। আদিমতার হিংস্র

উল্লাস অবিশ্বাস্য পরিবেশ রচিত করে। তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও রুদ্রতার গুণেই এ জাতীয় গল্পে অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত পরিবেশ গড়ে ওঠে ও সেই অতিপ্রাকৃতের পাত্রে পরিবেশিত হয় বীভৎস রস। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু গল্পে এইভাবে অতিপ্রাকৃত পরিবেশে বীভৎস রস সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত বালজাকের 'A Passion in the Desert', জ্যাক লণ্ডনের 'To Build A Fire' এডগার এ্যালান পোর 'The Black Cat', 'The tell tale heart', 'The masque of the Red death' প্রভৃতি গল্প; আমাদের দেশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী', 'ডাইনী'; 'অগ্রদানী'; মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। নারায়ণবাবুর কিছু অতিপ্রাকৃত ও বীভৎস রসের গল্প অতঃপর আলোচনা করছি।

মর্গ —

গল্পটিতে আছে এক অদ্ভুত রৌদ্র উল্লাস। এ গল্পে লেখক জীবনের নিষ্ঠুর নগ্ন সত্যকে এক হিম-শীতল পৈশাচিক ঘৃণ্যতায় আবিষ্কার করেছেন। সেই সঙ্গে জীবনের মিথ্যা মোহের প্রতি একটি শাণিত বিদ্রূপও উদ্যত হয়ে আছে এই গল্পের প্রতিটি ছত্রে। অথচ এসব কিছুর মধ্যে দিয়েই ফল্গু নদীর মতো ভেতরে ভেতরে বয়ে চলেছে লেখকের জীবনের প্রতি অপার মমতার করুণাধারা। আর সবকিছুকে ছাপিয়ে আছে এক অসহায় আত্মসমর্পণ— এক উদাসী দার্শনিকতা, অতিলৌকিক পরিবেশে বীভৎস রসের সাগরে অবগাহন করে যার জন্ম হয়েছে এ গল্পে।

পঙ্গু স্বামীর সুন্দরী স্ত্রী মমতা জানে তার রূপ-যৌবনের দিকে তার চাকুরীর মালিক অনিরুদ্ধর লোলুপ দৃষ্টির কথা। কিন্তু তার ভয় নেই। কেননা, 'ভয় করে লাভ নেই। তাই ভয়ও নেই।'[৯২] আসলে নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে লড়াই করে করে মমতা অসম্ভব ক্লান্ত। ভয় করার জন্য যেটুকু মনোবল দরকার, তাও তার আর অবশিষ্ট নেই। বস্তুত, স্বামীর বিকৃত জীবন্ত লাশের সঙ্গে ঘর করতে করতে ভয় তার কেটে গেছে। এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর শীতলতা সে অর্জন করেছে তার জীবনের করুণ ও বীভৎস অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। সে জেনে গেছে মানুষের জীবনের মোহ, সৌন্দর্য কত ভঙ্গুর, চিরন্তন সত্য হল মৃত্যুর শীতলতা— জীবিত শবের বীভৎসতা। তাই এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত দার্শনিকতা এসেছে তার চরিত্রে। যে জীবনকে সে ভোগ করতে পারেনি, তার প্রতি একটা অক্ষম ক্রোধ তার বিদ্রূপকে করেছে শাণিত, হৃদয়ে এনেছে এক হিংস্র উল্লাস। তাই মমতাকে দেখে যেমন এক বিস্মিত-শিহরণ জাগে, তেমনি তার জন্য মমতাও হয়।

মমতা সুন্দরী। কিন্তু তার হাসিতে পুরুষের রক্তে দোলা লাগেনা, লাগে এক অস্বস্তিকর হিমেল স্পর্শ। তার আঙুলগুলোও অস্বাভাবিক শীতল। আর গলার স্বর যেন মৃত মানুষের। তাই বহুনারীর-সঙ্গধন্য অনিরুদ্ধ অনেক চেষ্টা করেও তার কাছে আসতে পারেনা।

বস্তুত মমতার জীবনের অভিজ্ঞতা এত ভীষণ যে, তা দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ সবরকম বোধকেই অসাড় করে দিয়েছে। বেঁচে থেকেও সে যেন এক মৃত মানবী। তাই অনিরুদ্ধর সঙ্গিনী হতেও মমতা সঙ্কোচবোধ করে না। একসঙ্গে তারা বেড়াতে যায়।

এরপর ঝড় ওঠে। প্রবল ঝড়ে আশ্রয় খুঁজতে অনিরুদ্ধ ও মমতা প্রবেশ করে মর্গে। একদিকে ঝড়ের তাণ্ডব, পৈশাচিক বজ্রের আওয়াজ; অন্যদিকে পচা মাংস আর ওষুধের গন্ধে ভরা লাসকাটা ঘর। এই ভয়ানক নাটকীয় পরিস্থিতিতে বিদ্যুতের হিংস্র আলোয় আশ্রয়স্থলের নারকীয় পরিচয় পেয়ে অনিরুদ্ধ ভয়ে গোঙায়। আর অন্ধকারে মমতার হাসির আওয়াজ কানে আসে। অনিরুদ্ধর এই দুরবস্থাকে সে তিল-তিল করে উপভোগ করতে চায়। এতদিন যে যন্ত্রণা সে পেয়েছে, আজ তা আরেকজনকে পেতে দেখে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি হয় তার। এক পৈশাচিক হিংস্র উল্লাস তার চেতনাকে আলোড়িত করে। অনিরুদ্ধকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করবার সুযোগ ছাড়তে চায়না সে বলে— 'ভয় পাচ্ছেন?' উত্তরে অনিরুদ্ধ ইতস্তত করলে বলে 'গন্ধ' ! ও কিছুনা। মানুষ পচলে ওরকম গন্ধই বেরোয়। ও সয়ে যাবে।'[৯৩] এতদিন ধরে যা সয়েছে মমতা, অনিরুদ্ধ কি তা এতটুকু সময়ও সইতে পারবে না? মমতা যে তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে, সব সয়ে যায়। তার চাপা বেদনা এখানে ঘৃণিত ধিক্কারের রূপ নিয়েই বেরিয়ে এসেছে। আর পেট-চেরা শবের গলিত বীভৎস চেহারা দেখে অনিরুদ্ধ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। এই নারকীয় গা-ছমছম করা পরিবেশে নারী-সঙ্গ কামনা দূরের কথা এক বীভৎস ঘৃণা ও ভয়ে তার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে এসেছে। জীবনের পরিণতির নিষ্ঠুর সত্য রূপটি উপলব্ধি করে সে আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আরও কিছু জানতে তখনো বাকি ছিল তার। মমতারও পৈশাচিক প্রতিহিংসা নেবার আরও একটু বাকি ছিল।

এই বাকি অংশটুকু পূর্ণ হল মমতার বাড়িতে এসে। মমতার অনুরোধে তার স্বামীকে দেখতে এল অনিরুদ্ধ। এতক্ষণ সে মৃত মানুষের পচা শরীর দেখেছিল, এবার দেখল 'লাশকাটা ঘরের সেই লাশটা আরো বিকৃত, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে বসেছে।'[৯৪] আর তখনই তার মনে হল— 'কোন্ মমতাকে হাত বাড়িয়ে সে ছুঁতে চাইছিল? জীবনের লাশকাটা ঘরের এই জীবন্ত প্রেতিনীকে কেমন করেইবা স্পর্শ করবে? মনে হল যে হাতে সে মমতাকে ছুঁয়েছিল, হাতের সেইখানে ক্লেদ-মাখা একরাশ

পচা মাংস জড়িয়ে আছে।'[৯৫]

এখন কামনার পাত্রীই আতঙ্কের পাত্রী হয়ে উঠল অনিরুদ্ধর কাছে। তাই ছুটে পালালো অনিরুদ্ধ। তার কানে কেবল বাজতে লাগল মমতার তীক্ষ্ণ শাণিত হাসির শব্দ। এ শব্দ হাসির না কান্নার, কে বলবে? বীভৎস রসের ভেতর দিয়ে এখানে করুণ রসের ফল্গুধারার বিস্তার।

গল্পটির পরিবেশ বীভৎস। মমতা, তার স্বামী— এসব চরিত্রই হিমঘরের অনুভূতি নিয়ে আসে। তাই গল্পটি অতিপ্রাকৃত ও বীভৎস রসের গল্প। গল্পটির ভাষায় শাণিত দীপ্তি আছে। সেইসঙ্গে আছে ভয়ালতা, বীভৎসতার রোমহর্ষক বর্ণনা। গল্পটির ভাব একমুখী। অপ্রাসঙ্গিক কোন প্রসঙ্গের অবতারণা গল্পটিকে তার মূল রসবিন্দু থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। আর গল্পটির নামকরণ অবশ্যই তাৎপর্যময় তথা ইঙ্গিতগর্ভ। মর্গের শীতলতা ও বীভৎসতা গল্পটির সর্বত্র ব্যাপ্ত।

জান্তব —

গল্পটিতে আদিম জীবন-সংগ্রামের জান্তব রূপ বর্ণিত। আমরা জানি পশুশক্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির মিলনেই মানুষের সৃষ্টি। প্রতিটি মানুষের ভিতরেই সুপ্ত থাকে জৈবিক চাহিদা। মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে এই জৈবিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষেরও জেগে ওঠে সেই আদিম প্রবৃত্তি। তাই প্রবল বন্যায় আত্মরক্ষার জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' তার প্রিয়তমা স্ত্রীর আলিঙ্গনমুক্ত হবার জন্য স্ত্রীর শ্বাসরোধ করে; জ্যাক লণ্ডনের 'To Build A Fire' গল্পে মৃত্যু-হিম শীতের হাত থেকে রেহাই পেতে একটি লোক তার প্রিয় সঙ্গী কুকুরটিকে হত্যা করে তার তপ্ত রক্তে উষ্ণতার স্পর্শ পেতে চায়। নারায়ণবাবুর এই গল্পটিতে জ্যাক লণ্ডনের গল্পটির প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্ট। এখানেও হিমালয়ের মৃত্যু-হিম-শৈত্যে-এক ঝড়ের রাতে গুম্ফা লামা তার একমাত্র বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ কুকুরটিকে কম্বলের উত্তাপের অংশীদার করতে পারেনি। আদিম জীবধর্মের জৈবিক চেতনার অনুবর্তী হয়ে নিজে বাঁচবার তাগিদে কুকুরটিকে পাথর দিয়ে মেরে সে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে। গল্পটির চরম মুহূর্ত আসে এইখানে। এক নিষ্ঠুর ভয়াবহতা, হিমার্ত আতঙ্ক পাঠকের শরীরকেও হিম করে তোলে। আদিম বীভৎস এই হত্যাকাণ্ডটি স্নায়ুকে পীড়িত করে। গল্পটি যদি এখানেই শেষ হত, তবে এ্যালান পো, জ্যাক লণ্ডনের নিষ্ঠুর ভয়ালতাই এর একমাত্র অবলম্বন হত। কিন্তু এ গল্পের শেষে অনুতপ্ত গুম্ফা ঐ কুকুরটিকে খুঁজতে গিয়ে নিজে একপাল কুকুরের হাতে প্রাণ দিয়ে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। তাই গল্পটির শেষে মানবিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ও পরিণতি হয়েছে করুণ। তবু এ গল্পের মূল সুর আদিম জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর অনিবার্য ভয়ঙ্কর সুর। আমরা জানি, আবার যদি তেমন দুর্যোগ ঘনায়, গুম্ফা তার আদরের কুকুরকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। গল্পটিতে তথাকথিত নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। গল্পটির ভাব একমুখী, ভাষা বিষয়োপযোগী। নামকরণের মধ্যে দিয়ে গল্পটির বক্তব্যের স্পষ্ট আভাস মেলে। তাই গল্পটির নামকরণ ইঙ্গিতধর্মী।

এই গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার যথার্থই বলেছেন— 'জান্তব-এর পরিবেশ হলো হিমালয়ের উপত্যকা— একদিকে তুষার মাখা পাহাড় অন্যদিকে শাল, পাইন, দেওদারের বন যেখানে প্রকৃতি ও মানুষের (গুম্ফা লামা) হৃদয়ের নট-লীলা একই আদিমতায় বহে চলে। মানুষ আর জন্তু এক হয়ে যায়। প্রভু-ভৃত্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়। এই পরিবেশের মানুষগুলি অত্যন্ত আবেগতপ্ত, এবং এই আবেগতপ্ত মানুষের গল্পেই নারায়ণবাবুর হাত ভাল খোলে। মানুষে উত্তপ্ত আবেগ এবং প্রকৃতির হিংস্রতাকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পাঠকের মনে সঞ্চার করতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই।'[৯৬]

টোপ —

এটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। ডুয়ার্স-টেরাইয়ের আদিম বন্য হিংস্রতা এক ভয়াবহ নৃশংস উল্লাসে এ গল্পে জেগে উঠেছে। অবিশ্বাস্য এক পৈশাচিকতা গল্পটিতে বীভৎস রসের প্লাবন এনেছে। গল্পটির শেষে নিষ্ঠুর নগ্ন সত্যের আকস্মিক আঘাত পাঠকের মনে ক্ষতচিহ্নের মতো স্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত করেছে। নীতি-ধর্ম-সমাজ বিবর্জিত আদিম পাশব কামনা শৌখিন শখের মুখোসের ভিতর তার লেলিহান জিভ লুকিয়ে রেখেছে। তাই ধনতন্ত্রের অন্তিম বিকারের শিকার রাজাবাহাদুর মানব-সন্তানকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর বাঘ-শিকারের শখ মেটান। যে টোপের কাজ অনায়াসে কোনো জন্তুকে দিয়ে হত, সেখানে তিনি মানব শিশুকে বেছে নেন। কেননা, ভাল টোপ ছাড়া তাঁর আবার পছন্দ হয় না। এই অদ্ভুত বিস্ময়কর নৃশংসতার নেপথ্যে আছে রাজাবাহাদুরের রাজরক্ত; যা বন্য হিংস্রতার রাজত্বে রাত্রির অন্ধকারে আদিম হিংসায় শিকারের হিংস্র উল্লাসে জেগে ওঠে। বস্তুত বন্য জন্তুর বর্বরতার চেয়েও ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা খেলা করে রাজা বাহাদুরের টোপে সুচিত্রা সেনচন্দ্র এই গল্পটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে বলেছেন- ''টোপ' গল্পে ক্ষমতা ও শক্তি প্রদর্শনের দুর্দম লিপ্সাজাত বিবেকহীন ধনীর নির্মমতা অসীম।'[৯৭]

তাই দরিদ্র হাউস-কীপারের একটি ছেলে হারিয়ে গেলে ধনী রাজাবাহাদুরের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়না। তিনি ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়েন, রোলস্ রয়েসে চড়ে ঘুরে বেড়ান। আর তাঁর পাঠানো বাঘের চামড়ার চটি পায়ে দিয়ে চাটুকার মেরুদণ্ডহীন

বাঙালী কৃতার্থ বোধ করে। তাই গল্পের শুরুতে ও সমাপ্তিতে লেখকের ব্যঙ্গের হুল তীক্ষ্ণ। কিন্তু এ সবকিছুকে ছাপিয়ে রয়েছে রাত্রির তমসায় আদিম হিংসার ভয়াল ভ্রূকুটিময় শ্বাসরুদ্ধ অতিলৌকিক পরিবেশে বীভৎস নিষ্ঠুর খেলার নিষিদ্ধ উল্লাস।

গল্পটির গঠনভঙ্গি চমৎকার। যেভাবে লেখক গল্পটিতে সাস্‌পেন্স তৈরি করেছেন, তা চরম মুহূর্ত সৃষ্টিতে সহযোগিতা করেছে। গল্পটিতে ধাপে ধাপে উৎকণ্ঠা বেড়েছে ও তা চরম রূপ ধারণ করেছে শিশুর গোঙ্গানির শব্দের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। গল্পটি ট্রাজেডিতো বটেই। কিন্তু এ ট্রাজেডি কোন ব্যক্তির নয়, আমাদের সমাজের। ন্যায়-নীতি বিবেকবর্জিত ধনতন্ত্রের বিকারগ্রস্ত সমাজের গোঙানির শব্দ শোনা যায় ঐ শিশুর গোঙানির শব্দে। আর তাই তা শুধুই ট্রাজেডি নয়, সেইসঙ্গে আরও বেশি নিষ্ঠুর, ভয়াবহ, অবিশ্বাস্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী'তে লোভী ব্রাহ্মণের আপন পুত্রের পিণ্ড খাবার মধ্যে যেমন ট্রাজেডির চেয়ে বীভৎসতা বেশি, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এরকম বীভৎস রসের গল্প সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্লভ।

বস্তুত এই গল্পে মানব-শিশুকে টোপ বানাবার ব্যাপারটা এতই অমানুষিক, যে বিশ্বাস হতে চায়না। তবু লেখকের গল্প বলার কৌশলে, রৌদ্রগুণসম্পন্ন ভাষার বীভৎস রস নির্মাণ ক্ষমতায়, গা-ছমছম উৎকণ্ঠাময় পরিবেশ নির্মিতির কৌশলে গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় - 'মানবশিশুর তৈরী টোপ এমনকি বাস্তবে সত্য হলেও সারস্বত বিশ্বাসকে বিচলিত করতে চায়। তথাপি কয়েকটি ইঙ্গিতে রাজা বাহাদুরের যে অদ্ভুত হিংস্রতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং লেখকের বর্ণনাগুনেণ যে প্রাণঘাতী আরণ্য পরিবেশ প্রস্তুত হয়েছে, সেখানে এ কল্পনা সম্পর্কে শিল্পপ্রতীতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। গল্পটি লেখকের শক্তিমত্তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।'[৯৮]

বন-তুলসী—

আধুনিক লেখকরা প্রকৃতিকে কেবল সুন্দর বলে পূজা করেননা; প্রকৃতির হিংস্র ভয়াবহ রূপও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধুনিক লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গল্পে প্রকৃতির সেই সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় মেলে। প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত পরিবেশে তাই বীভৎস রস জেগে উঠেছে এ গল্পে। বন-তুলসীর কটু কষা গন্ধ গল্পের নায়ককে কৈশোরে বন-বালিকার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে তাই বন্য সাঁওতাল যুবতী ও বনতুলসীর আদিম আকর্ষণ মিলে মিশে গেল। রোম্যান্টিক আবেগে পথ হল ভুল। তারপরেই বনতুলসীর নিবিড় নিষ্ঠুর আলিঙ্গন অক্টোপাশের মতন চেপে ধরল। মনে হল 'আমার প্রেম এখন কোটিভুজ একটা রক্তশোষী জানোয়ার হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছে, তার লাল লাল ডাঁটাগুলিতে রক্তের তৃষ্ণা, তার শিরশিরে পাতাগুলোর স্পর্শে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।'[৯৯] ক্রমে তুলসী বনের শ্বাসরোধকারী মৃত্যু-ভয় সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করল। সাপের বিসর্পিল হিংস্রতায় কিলবিল করে উঠে যেন বনতুলসী পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। মনে হল প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর নিষ্পেশন থেকে কোনদিন মুক্তি নেই। এখানেই লেখকের বর্ণনার গুণে শ্বাসরোধকারী চরম উৎকণ্ঠার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে।

অবশেষে ভাগ্যের জোরে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে মনে হয়েছে 'ভালো মানুষের প্রেম, ... প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতর তোমাকে একেবারে অবলুপ্ত করে নেবেনা -'[১০০]

আসলে নারী ও প্রকৃতি উভয়ের প্রেমেই পূর্ণগ্রাস থাকলেও প্রকৃতিতে যে নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা আছে, তা নারীর মধ্যে নেই। প্রকৃতির মতো নারীও পুরুষকে ছলনা করে, বিভ্রান্ত করে, পথভ্রষ্ট করে, দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধে; কিন্তু সেইসঙ্গে তার কোমল হৃদয় গড়ে তোলে একটি ছোট্ট স্বপ্নের সংসার, তার মাতৃহৃদয় এনে দেয় আকাঙ্ক্ষিত সন্তান। তাই নারীর প্রেম প্রকৃতির মতো নৃশংস ধ্বংসাত্মক নয়, সৃষ্টিধর্মী। সেই সৃষ্টির স্বাক্ষর-রূপ সন্তানের মধ্য দিয়েই তারা ও তাদের ভালবাসা বেঁচে থাকে। গল্পের শেষে মানবতাবাদী প্রেমিক লেখক তাই মানব-মানবীর প্রেমের জয়গান করেছেন। তথাকথিত বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন সস্তা রোম্যান্টিসিজমের প্রতি তাঁর বিদ্রূপও শাণিত। কিন্তু অরণ্যের ভয়াল হিংসা, মায়াবী বিষ-নিঃশ্বাস গল্পটিতে বীভৎস রসের সৃষ্টি করে পাঠককে ভীত ও শিহরিত করেছে। পাঠকের চিত্তে এই রসটিরই স্থায়ী প্রভাব পড়েছে। গল্পটির ভাষা সুন্দর, সাবলীল এবং ভাবানুযায়ী পরিবর্তিত। এ ভাষায় কখনোবা লঘু হাস্যরস, কখনো তীক্ষ্ম বিদ্রূপ এবং কখনো তা ভয়ঙ্কর। গল্পটির বাঁধুনীও সুন্দর। বন-তুলসীর সর্বগ্রাসী রূপ রবি ঠাকুরের 'রাহুর প্রেম' কবিতার কথা মনে করায়। ছোটগল্পের অন্তরঙ্গ লক্ষণ হিসেবে গল্পটির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার উল্লেখ করা চলে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য গল্পটিকে রূপক গল্প বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, তাঁর মতে 'এখানে প্রকৃতি ও নারী পরস্পরের রূপক'।[১০১] বাস্তবিক, মানবীর সর্বগ্রাসী প্রেম-কামনা এখানে প্রকৃতির নিষ্ঠুর আলিঙ্গনের মাধ্যমে দ্যোতিত হয়েছে। কিন্তু গল্পের শেষে লেখক স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন, বন্য প্রকৃতির থেকে মানবীর প্রেমই ভাল। সুতরাং রূপক গল্প এটি সম্পূর্ণভাবে নয়। আর গল্পটির বর্ণনায় অতিপ্রাকৃত ও বীভৎস রসই যে প্রধান উপজীব্য, তার সমর্থন মেলে জগদীশবাবুরই আরেকটি মন্তব্যে 'এ বর্ণনায় শিল্পী এমনি বাণীসিদ্ধি লাভ করেছেন যে, তুলসীবনে শ্বাসরোধকারী মৃত্যুর অনুভূতি শুধু পাঠকের মনকে অভিভূতই করেনা, পাঠকমনও যেন এই অনিবার্য মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে চেতনা হারিয়ে বসে'।[১০২]

হাত —

অতিপ্রাকৃত পরিবেশে ভূতুড়ে গা-ছমছমানি বীভৎস রসের সৃষ্টি করেছে এ গল্পে। হিম-শীতল ভয়ের শিহরণ এ গল্পের আবহ রচনা করেছে। এক দুর্বোধ্য আতঙ্ক ভারি পাথরের মতো বুকে চেপে বসেছে। এক সাহিত্যিক বৈঠকে খুব সাধারণভাবেই গল্পটির অবতারণা হয়েছে। পাঞ্জাব মেলের দুর্ঘটনায় পঙ্গু এক ভদ্রলোক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন রোমহর্ষক ভাষায়। ঐ ভদ্রলোকটির চেহারায় কঙ্কালের আদল প্রথমেই অবশ্য গল্পটির মূল বিষয় ও রসের দিকে ইঙ্গিত করেছে। পরে ভদ্রলোকটির রহস্যময় ভৌতিক গলার স্বর ভূতুড়ে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

পাঞ্জাব মেলের আপার বার্থে শুয়ে শুয়ে ভদ্রলোক তাঁর নীচের বার্থের রূপসী মহিলাটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মহিলাটির হাতের আঙ্গুলের বিশাল আংটিটি তাঁর চোখে অস্বস্তিকরভাবে ছুরির ফলার মতো যেন বিদ্ধ হচ্ছিল। ক্রমে অন্যান্য যাত্রী ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়লে, তিনি রোম্যান্টিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন ঐ সুন্দরী পরস্ত্রীটিকে কেন্দ্র করে। ইরাণী বেগমের ভূমিকায় তিনি দেখছিলেন মহিলাটিকে। কিন্তু তার 'চোখে আগুন, ছোরায় রক্তমাখা'[১০৩] .....আর এইসময়েই ঘটেছিল পাঞ্জাব মেলের দুর্ঘটনা। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও ভদ্রলোক মোহাবিষ্টের মতন আবিষ্কার করেছিলেন যে, তাঁর গলা জড়িয়ে আছে সেই ভদ্রমহিলার আংটি-শোভিত হাত। ভদ্রলোক প্রথমে সহজাত ভদ্রতায় সরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহিলাটি চাপা স্বরে জানিয়েছিল যে, ওভাবে থাকতেই তার ভাল লাগছে। ফলে ঐ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যেও নিষিদ্ধ উন্মাদনার আনন্দ ভদ্রলোককে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল 'হাতের ওই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা যদি গলার মধ্য বিঁধে গিয়ে আমার শ্বাসনলীটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে— তার চাইতে বড় কিছু আমার চাইবার নেই এখন।'[১০৪] কিন্তু তারপরেই শোনা গেল এক বীভৎস পৈশাচিক অট্টহাসি। এই হাসির আঘাত বিকৃত মোহাবরণকে পলকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। আর ভদ্রলোক সভয়ে আবিষ্কার করলেন যে - 'মণিবন্ধের পরে সে হাতে আর কিছুই নেই, শুধু একতাল ছিন্ন মাংস।'[১০৫]

কিন্তু বিভীষিকার এখানেই শেষ নয়। ঐ দুর্ঘটনার এতবছর পরেও সেই পৈশাচিক হিমশীতল থাবার কথা ভুলতে পারেননি ভদ্রলোক।

গল্পের শেষে যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী নারায়ণবাবু অবশ্য বাস্তব জগতেই প্রত্যাবর্তন করেছেন - 'এখন আর বাস পাওয়া যাবেনা' নরেন মিত্তিরকে এই গল্প শোনার মাশুল দিতে 'এত রাত্রে হেঁটে যেতে হবে সেই বেনিয়াপুকুর!'[১০৬]

কিন্তু চেষ্টা করলেও ঐ অতিপ্রাকৃত পৈশাচিক পরিবেশের বীভৎসতা থেকে অত সহজে পাঠকের মনকে সরিয়ে আনা যায়নি। গল্পটির গঠন দৃঢ়, ভাব একমুখী। ভাষা বিষয়ানুযায়ী অত্যন্ত সার্থক। স্বপ্নের রোম্যান্টিক পটভূমিতে এই ভাষা যত কোমল, কাটা হাতের পৈশাচিক বীভৎসতায় এই ভাষা ততই ভয়ঙ্কর। এই গল্পে চরমক্ষণ এসেছে ট্রেন এ্যাক্সিডেন্ট ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর ক্রমে সেই চরমক্ষণের মাত্রা আরও চড়েছে। আর কাটা হাত আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তা চরম অনুভূতিতে গিয়ে পৌঁছেছে। নারীর সৌন্দর্য কত ভঙ্গুর আর মৃত্যুযে কত বীভৎস, আধুনিক যুগের এই দৃষ্টিভঙ্গিও গল্পটিতে প্রতিফলিত। উপযুক্ত সংকট ও স্থান পরিবেশ নির্মিতির দ্বারা গল্পটিকে একটি সার্থক অতিলৌকিক বীভৎস রসের গল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সমাজ-সমস্যামূলক গল্প

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই গল্পে স্থান করে নেয় সমাজের নানা সমস্যা। স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে 'পৃথিবীর ছোটগল্প সাহিত্যে এইখানেই সবচেয়ে বড় 'Pointing finger' - সবচেয়ে জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন। উনিশ শতকের ক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত মানসিকতা থেকে এদের যন্ত্রণাতিক্ত উদ্ভব। এরা আজ বিশ্বব্যাপী'।[১০৭] বস্তুত, সমাজ-সমস্যামূলক গল্পগুলি যেন সমাজের নানা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে সমাজ-চেতনার সংঘর্ষেই সমাজ-সমস্যামূলক ছোটগল্পের জন্ম। আর আমরা জানি, সমকালীন অশান্ত এক যুগের সাক্ষী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সে যুগের সমাজের অন্যায়, অনাচার, জ্বালা, যন্ত্রণা, গ্লানি ইত্যাদি সর্ববিধ সমস্যা তাই স্থান পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের ভাষায় 'যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মজুতদার অসংখ্য চোরাকারবারীর যেগাসাজস এবং মূল্যহীন মনুষ্যত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাঁর আবির্ভাব এবং এইসব অভিজ্ঞতা তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পে অতি তীক্ষ্ণ শিল্প রূপ পেয়েছে।'[১০৮]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ধরনের সমাজ সমস্যামূলক গল্পগুলির কয়েকটি এবার আলোচনা করছি।

বীতংস—

'বীতংস' শব্দটির অর্থ হল 'পাখি ধরার জাল'। বিশ্বযুদ্ধোত্তর নির্মম কৌশলী সমাজ কেমনকরে ফাঁদ পেতে নিরীহ মানুষকে তার জটিল প্রয়োজনের জালে বন্দী করে, তারই পরিচয় মেলে এই গল্পে। সাঁওতালদের কুসংস্কার ও সরলতার সুযোগ নেয় ভণ্ড সন্ন্যাসী সুন্দরলাল। দরিদ্র সাঁওতালদের মনে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভরসা জাগিয়ে তুলে, দেবতা শিংবোঙার প্রত্যাদেশ শুনিয়ে এই সু-অভিনেতা সাঁওতালদের গ্রাম-ছাড়া করে নিয়ে যায় চা বাগানে তাদের কুলি হিসেবে নিয়োগ করে কমিশন পেয়ে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য সুদূর আসামে। সরলা সুন্দরী সাঁওতাল-কন্যার প্রতি সুন্দরলালের কামনার আগুন ওঠে জ্বলে, অথচ আসন্ন সর্বনাশের খবর সাঁওতালদের কাছে থাকে অজানা। গ্রাম ছেড়ে যাবার সময়েও খসে পড়েনা ধূর্ত্ত সুন্দরলালের মুখোস। তাই নিশ্চিন্তে সাঁওতাল পুরুষরা বাঁশী বাজায়। আর সাঁওতাল কন্যারা পথ চলার আনন্দে বিভোর। 'মাদলের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কালো চুলে শাদা ফুলের মঞ্জরীগুলো দুলে উঠছে।'[১০৯] তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না কোন্ কুশলী, ধূর্ত, নিষ্ঠুর ব্যাধের জালে তারা পা দিয়েছে। অথচ এই জাল থেকে এই নিরীহ, সরল, বিশ্বাসী বন্য মানুষগুলোর মুক্তি নেই। ব্যাধের জালে পড়া বনের পাখির মতোই তাদের অবস্থা। তাই গল্পটির নামকরণ সার্থক। সমাজ এখানে নির্মম এক ব্যাধ। প্রতারণার জাল বিস্তার করাই তার কাজ। আর এই সমাজের দালালি করে অসংখ্য সুন্দরলাল। এইসব সুন্দরলালদের হাতে শিকার হয় অশিক্ষিত, অসহায় দরিদ্র ও সরল বিশ্বাসী মানুষ। কারণ এ সমাজ অবিশ্বাসের, বঞ্চনার, নীতিহীনতার নিষ্ঠুর সমাজ। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে সর্পিল কুটিলতার বিষ। তাই সমালোচক অলোক রায় যর্থার্থই বলেছেন ''বীতংস' নামকরণের প্রতীকী দ্যোতনা চোখে না পড়ে যায় না।'[১১০] তবু মানব-দরদী লেখক নারায়ণবাবু এ গল্পের ঘৃণিত চরিত্র সুন্দরলালের নীচতার কারণ হিসেবে তার অতীত জীবনের বেদনার কথা স্মরণ করেছেন সহানুভূতির সঙ্গে। স্ত্রীর দ্বারা, ভাইদের দ্বারা প্রতারিত হয়েই জন্ম নিয়েছে আজকের সুন্দরলাল। তাই সুন্দরলালের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ফল্গুধারা মতো নিঃশব্দে বয়ে চলেছে গল্পটির ভিতর। আর অসহায় সাঁওতালদের জন্য তাঁর বেদনা অপরিসীম। গল্পটির শেষে সাঁওতালদের আনন্দের ছবি গল্পের করুণরসকেই ঘন করেছে। আর সমাজের নির্দয় রূপটি হয়ে উঠেছে সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট।

এই গল্পটির মধ্যে কোথাও কোথাও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাঁওতালদের ভীত করে তুলেছে ভণ্ড সুন্দরলাল, অতিপ্রাকৃত পরিবেশ নির্মাণ করে বীভৎস রসের প্লাবনে। কিন্তু ঐ রস গল্পটির মূল আধার নয়, উপকরণমাত্র; সমাজ সমস্যাই এ গল্পের প্রধান অবলম্বন।

গল্পটির ভাষা গল্পের সূচনায় ও সমাপ্তিতে কাব্যময়, এবং মধ্যভাগে নাটকীয়। ভাবানুযায়ী লেখক ভাষাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। গল্পে চরমক্ষণ এসেছে সুন্দরলালের দেবতার প্রত্যাদেশ শোনাবার সময়। উপযুক্ত গা ছমছম অলৌকিক পরিবেশ ও শ্বাসরুদ্ধকারী সঙ্কটমুহূর্তে এই প্রত্যাদেশ চরমক্ষণটিকে সার্থক শিল্প-সিদ্ধিলোকে পৌঁছে দিয়েছে।

গল্পটির পরিসমাপ্তি সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন 'গল্পশেষে যতই মনে হয়েছে এই নিষ্ঠুর ব্যাধের জালে ধরা পড়া নিরীহ পশুর মত অসহায় এই নরনারীদের কিছুতেই মুক্তি নেই, ... ততই একদিকে মানুষের এই মহাশত্রুর প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ শতগুণিত হয়ে দেখা দিয়েছে, এবং অন্যদিকে আরো করুণ হয়ে উঠেছে গল্পের প্রচ্ছন্ন ট্রাজেডির আবেদন।'[১১১] গল্পটি আলোচনা প্রসঙ্গে অলোক রায় বলেছেন 'মানুষের ক্রুরতা আর লোভ বর্ণনায় দৃশ্যপটের অভিনবত্ব ও ঘটনার চমৎকারিত্ব বিশেষভাবে লক্ষনীয়।'[১১২] বাস্তবিক গল্পটির চরমক্ষণ থেকে শুরু করে গল্পের শেষাংশের নাটকীয় মোড় লেখকের উপযুক্ত দৃশ্যপট নির্মাণ ও নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম।

হাড় —

গল্পটিতে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের কথা স্পষ্ট। মানবদরদী লেখক নারায়ণবাবু এ গল্পে দারিদ্র্য ও ধনতন্ত্রের চরম বিকারকে 'হাড়ে'র মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। ধনী রায়বাহাদুর পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে শখ করে হাড় সংগ্রহ করে ভেলভেটের বাক্সে রাখেন। আর তার পাশেই দারিদ্র্যের চরম প্রান্তে পৌঁছে কাঠির মতো হাত পা ও বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটি শিশু ক্ষুধায় পাগল হয়ে প্রাণপণে হাড় চুষতে থাকে। একদিকে শখের বিলাস, অন্যদিকে বাঁচবার তাগিদ।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, রঙীন কাঁচের জানলায় সিল্কের পর্দা, গ্রাণ্ডিফ্লোরার উগ্রমধুর সুরভিময় যাদুমন্ত্রের দেশে বাস করেন রাজা বাহাদুর। গরীবকে শোষণ করে নীতিহীনতার যাদুমন্ত্রে ধনী হয়ে তিনি এখন মুখে খালি লম্বা লম্বা উপদেশ দিয়ে নিজে কুকুরের পাহারায় নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন যাপন করেন। অন্যদিকে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে চীৎকার করে খায়

মন্বন্তরের বুভুক্ষু নরনারী।

তবুও এই ধনী-দরিদ্র উভয়ের কাছেই 'হাড়' আছে এবং এই হাড়ের মধ্যে 'কোথায় একটা সাদৃশ্য'[১১৩] আছে। কেননা, এই হাড় ধনতন্ত্রের বিকারের ফলে ধনীর হাতে ও দারিদ্র্য-জনিত বিকারের ফলে দরিদ্রের হাতে এসেছে। তাছাড়া রায়বাহাদুরের সংগ্রহের হাড় শোষণ-মুখ্য সমাজে ধনতন্ত্রের কঙ্কালের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। আর দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে হাড় যেন শোষিত মানুষের বুকের পাঁজরা। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার যথার্থই বলেছেন — 'গল্পটিতে হাড়ের পরিকল্পনায় উভয় চিত্রের সাদৃশ্য আবিষ্কার ও সংযত মিতভাষণ গল্পটিকে বাঞ্ছিত ফলশ্রুতিতে উপনীত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।'[১১৪] তাছাড়া ধনী-দরিদ্র উভয়েই এই হাড়ের মন্ত্র পায়নি। রায়বাহাদুর সেই মন্ত্র পাননি যাতে 'তাল তাল পাথর সোনা হয়ে যায়' ও 'লতাপাতাগুলো অজগর সাপ হয়ে ফণা তুলতে পারে'[১১৫] আর তিনি নিজে হতে পারেন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর। আর ডাস্টবিনের বুভুক্ষু মানুষের হাতে হাড় এলেও তারা সেই মন্ত্র পায়নি, যার ফলে বালিগঞ্জের কালো আকাশ আগুনের মতো বিদ্রোহে লাল হয়ে উঠবে। তবু আকাশে মেঘ করায় এই বিদ্রোহের ঝড় যে আসন্ন, সে ইঙ্গিত দিয়ে আশাবাদী ও সাম্যবাদী লেখক গল্পের শেষ করেছেন।

রায়বাহাদুরের যে হাড় আকাশে রক্তের মেঘ থেকে রক্ত বৃষ্টি ঝরায় বলে রায়বাহাদুর দাবি করেছেন, তেমনি দরিদ্রের হাতে ক্ষুধায় চোষা হাড় একদিন রক্তাক্ত বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে এই ব্যঞ্জনাও এখানে আছে।

গল্পটি লেখকের নিজেরই প্রথম গল্প 'পাশাপাশি'র কথা মনে করায়। সেখানেও পাশাপাশি ধনী-দরিদ্রের অবস্থান এবং ধনীর হৃদয়-হীনতার কথা আছে। এছাড়া মার্কসবাদী মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের বহু গল্পেই এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। শরৎচন্দ্রের লেখায়ও সমাজের এই অন্যায়-অবিচারের কথা আছে। এই 'হাড়' গল্পটির ভাষা শাণিত, ইঙ্গিতগর্ভ। গল্পটি ঘটনা-প্রধান নয়, সমাজের স্বরূপ উন্মোচন করাই গল্পটির উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে গল্পটি একমুখি ও গঠন সুদৃঢ়। 'বীতংস', 'হাড়' দুটি গল্পেরই কিছু অংশে ভয়াবহ অতিলৌকিক বর্ণনার মাধ্যমে বীভৎস রস সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু তা গল্পের মুখ্য রস নয়, অংশ মাত্র। একটি শাড়িতে যেমন নানা অংশে নানা ধরণের কারুকার্য থাকে, গল্পের শরীরেও তেমনি করে এগুলি থাকে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি শাড়ি যেমন বেণারসী, জামদানী অথবা ঢাকাই; তেমনি সমগ্রতার দিক দিয়ে কোন গল্প মনস্তাত্বিক, কোনটি রূপক, কোনটি বা সমাজ-সমস্যামূলক। তাই 'হাড়' গল্পটিকে সমাজ-সমস্যামূলক গল্পেরই অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

'হাড়' গল্পটি সম্পর্কে মানস মজুমদারেব বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ''হাড়' গল্পটি আদ্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক, সভ্যতাগর্বী বিকারগ্রস্ত ধনতন্ত্রের প্রতি এ গল্পে যেন নির্মম কশাঘাত করেছেন লেখক।'[১১৬] গল্পটির পরিসমাপ্তি সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন 'মন্বন্তরের বলি হয় অসংখ্য মানুষ। ..... রায়বাহাদুরের মতো বিত্তবান অভিজাত শ্রেণীর বিবেকের দরজা বন্ধ থাকে। বুভুক্ষু মানুষের অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটবে না? লেখক স্বপ্ন দেখেন।'[১১৭] 'বীতংস' নামক গল্পটির সঙ্গে 'হাড়' গল্পটির তুলনামূলক আলোচনা করে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন- 'হাড়' গল্পের শিল্পায়ন আরো সূক্ষ্ম, আবেদনও আরো ব্যঞ্জনাময়।'[১১৮] বাস্তবিক সংযত মিতভাষণ ও পরিচ্ছন্ন শিল্পায়নেরগুণে, মন্বন্তরের পরিবেশে ধনতন্ত্রের অন্তিম বিকারের রূপটি-'হাড়' এর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমাজের শোষিত রূপকে ধনতন্ত্রের অন্তিম বিকারের আলোয় সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেছে।

নক্রচরিত —

এই গল্পে লেখক সমাজের মুখোশ পরা শয়তানের ভণ্ড রূপটি দেখিয়েছেন। চোরাকারবারী ও অসৎ ব্যবসায়ী নিশিকান্ত কর্মকার সমাজে মানী লোক, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। চোরের উপর বাটপাড়ি করে তার লোহার সিন্দুক পূর্ণ। গোলাঘরে সে শত শত মণ চাল মজুত রাখে ক্ষুধিত জনগণকে বঞ্চিত করে উচ্চ-মুনাফা পাবার প্রতীক্ষায়। বকধার্মিক এই লোকটির মুখে হরিণনাম, কপালে বৈষ্ণবের তিলক। অষ্টসভার কীর্তনের আসরে বৈষ্ণব ধর্মের নামে এই অন্যায় ও ভণ্ডামির মাদকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে এনে তার প্রকৃত স্বরূপটি দেখিয়েছেন লেখক। —

'ধূনীর আগুনের লাল আভা বোষ্টম-বোষ্টমীদের ব্যভিচার চিহ্নিত অপরিচ্ছন্ন মুখগুলোকে অদ্ভুতভাবে একাকার করে দিয়েছে।'[১১৯] লেখকের এই ভণ্ড বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্রূপ ও ঘৃণা স্পষ্টতর 'মহানন্দা' উপন্যাসে।

দারোগাকে হাত করার জন্য তার নিজস্ব সেবাদাসীকে দারোগার হাতে তুলে দিয়ে নিশিকান্ত নিজের বিকারগ্রস্ত জীবনের কদর্য রূপ উদ্ঘাটিত করেছে। আবার এজন্য নিজের শারীরিক অক্ষমতায় অক্ষম ঈর্ষাও তার বুকে জ্বলে উঠেছে। তার অর্থলোলুপ পৈশাচিকতা চরমে উঠেছে তখন, যখন তার আড়তে চাল জমা করার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে মতিপাল অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছে ও তার বৌ পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে। তাই নিশিকান্ত চরিত্রটির পৈশাচিক রূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অলোক রায় 'বীতংস' ও 'হাড়' গল্পের দুই শোষক ভণ্ড চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন- 'নক্র-চরিত' এর নিশিকান্ত কর্মকারও কি সুন্দরলাল রায়বাহাদুর জাতীয় চরিত্র?'[১২০] সব মানুষই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চায় নিজের কাছে।

নিশিকান্তও নিজের অন্যায় সম্পর্কে সচেতন বলেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছু অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করেছে, প্রয়োজনে ধর্মকে বিকৃত করেছে। ভেবেছে 'না খেয়ে মরেছে, সেতো কৃতকর্মের ফল'। [১২১] কিন্তু সে এও জানে যে, এ সান্ত্বনার বানী মিথ্যে। তাই শেষে সে বিবেকের তাড়নায় পাগলের মতো ভয় পেতে শুরু করেছে। তার এই উন্মাদবস্থা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শেষ বয়সের কথা মনে করায়।

নিশির মনে হয়েছে মৃত মানুষরা আর্তনাদ করে উঠবে— 'আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাণ্ডারে জমা করেছ তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার অর্থ, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমায়। কিন্তু এখন?'[১২২] নষ্ট সমাজ, মিথ্যে আইন, অর্থকরী ক্ষমতা মানুষকে শারীরিকভাবে বাঁচিয়ে রাখলেও বিবেক নির্মম। সেখানে কোন ক্ষমা নেই, আছে মনের উপর কেবল অঙ্কুশের আঘাত। তার থেকে কারোর মুক্তি নেই। এই চিরন্তন সত্যটি লেখক এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আর এই পাপবোধে আকীর্ণ হয়ে গল্পের শেষে নিশি তাই আড়তের পচা চালের সঙ্গে গরুর পচা মৃতদেহ নিয়ে ঘৃণ্য কাড়াকাড়ির সাদৃশ্য অনুভব করেছে। এইভাবে 'গল্পের উপসংহার হয়েছে ইঙ্গিতগর্ভ। বীভৎস এক চিত্রকল্প আশ্রয়ে লেখকের তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও নিপুণ ব্যঙ্গের প্রতিফলন ঘটেছে।'[১২৩]

এ গল্পটির ভাষা শাণিত ও তীক্ষ্ণ। সমাজের কদর্য বিকৃতিও স্পষ্ট। ছোটগল্পের ধর্মানুযায়ী এ গল্পেও মূল বক্তব্য ছাড়া অহেতুক বিস্তার নেই। অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা বিলাসের ভূমিকাও নেই। গল্পের সমাপ্তিও ইঙ্গিতগর্ভ। 'নক্র' শব্দটির অর্থ 'কুমীর'। এ গল্পের প্রধান চরিত্র নিশিকান্তের স্বভাব কুমীরের মতোই। হিংস্রভাবে সবকিছুকে সে গ্রাস করতে চায়। আর কুমীরকে যেমন 'পোড়া কাঠ' ভেবে লোকে ভুল করে, তেমনি ভেকধারী বৈষ্ণব নিশিকান্তকে দেখেও ভুল করে পরে পস্তাবার সম্ভাবনা আছে বৈকি। 'কুম্ভীরাশ্রু' কে যেমন লোকে বিশ্বাস করেনা, তেমনি নিশিকান্তর চোখের জলকেও কারোর বিশ্বাস নেই। তাই নামকরণের দিকে থেকে গল্পটি সার্থক।

নিশিকান্তর চরিত্র বিশ্লেষণ করে জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন- 'এই ভণ্ড তপস্বীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে লেখকের লেখনী ক্ষমাহীন।'[১২৪] এইভাবে 'নক্রচরিত' গল্পে সমাজের ভণ্ড তপস্বীদের মুখোস খুলে দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী তরবারির মতো ঝলসে উঠেছে। এ গল্পে 'তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা, মিতভাষণ, সংকট-চেতনা ছোটগল্প শিল্পী হিসেবে লেখকের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।'[১২৫]

তীর্থযাত্রা —

গল্পটিতে ৪২ এর মন্বন্তরের পটভূমিতে সমাজের বিকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষের সুযোগে বক-ধার্মিক নরোত্তম গ্রামের মেয়েদের কলকাতায় পাচার করে। এ সমাজ নারীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের নির্দ্বিধায় পণ্যে পরিণত করে। আর এজন্য নিজের বিবেককে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে ধর্মকে বিকৃত করে যুক্তি খাড়া করতেও নরোত্তমের বিবেকে বাধেনা। সে ভাবে 'বিপন্ন নারীর একটা সুবন্দোবস্ত করে দিলে পাপ হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখা নেই কোথাও।'[১২৬]

সরলার ঘেয়ো ছেলেটা মরে যেতে নরোত্তম উল্লাসিত হয়ে ওঠে। — 'ছেলেটা মরে গেছে, বোঝা কমেছে একটা'। [১২৭] তাছাড়া 'চিরযৌবনের রাজ্যে সবৎসার চেয়ে অবৎসার কদর বেশি।'[১২৮] নরোত্তমের এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর কথাই মনে করায়।

সুখী নামের একটি মেয়েকে মাঝপথে নৌকা থামিয়ে মিলিটারী কলোনীর ঠিকাদারের কাছে বেচে দিয়ে এসে চমৎকার বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করে নরোত্তম বলেছে, সুখীকে কুমীরে নিয়ে গেছে। শুধু তার পাপের সহযোগী মাঝি ফরিদ আসল সত্য জেনে 'কুৎসিত মুখে অমানুষিক'[১২৯] হাসি হাসে। কিন্তু তার বাইরের চেহারাটা 'কুৎসিত' হলেও অন্তর সুন্দর এবং হাসি 'অমানুষিক' হলেও প্রকৃতি মানবিক। গল্পের প্রথম থেকেই তাই মাঝি ফরিদ নরোত্তমের পাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সে নরোত্তমকে বিদ্রূপ করে বলে 'ঠাকুরমশাই মরে তুমি বেহস্তে যাবে।'[১৩০] ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজের নারীদের ইজ্জৎ রক্ষার যে পবিত্র কর্তব্য নরোত্তমের আছে, তাও সে মনে করিয়ে দেয়। আর আপশোস করে - 'আগে জানলে কে এমন করে নৌকো ঠেলে মরত?'[১৩১]

গল্পের শেষে ফরিদের অপরাধবোধ ও ভীতি প্রবল হয়ে ওঠে। সে ভাবে, যে অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে সে, একদিন সে অস্ত্র কি ওর নিজের গলাতেই এসে লাগতে পারেনা? তার নিজের বৌ-মেয়ে-পুত্রবধূর কথা ভেবে ভয় হয়। সে এই সার সত্য উপলব্ধি করে যে, 'নরোত্তম ঠাকুরের মতো লোকের অভাব হয়না কোথাও কোনদিন।'[১৩২] ফলে সে নৌকার লগির খোঁচা দিয়ে নরোত্তমের চোখ অন্ধ করে দিয়ে বলে 'এতখানি সহ্য হয়না ঠাকুরমশাই। না খেয়ে মরেতো মরুক, তবু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'[১৩৩]

নৌকোর মুখ ঘুরে যায়। আর অদৃষ্টের পরিহাসে নরোত্তম সুখীর বিষয়ে বানিয়ে বলা মিথ্যের ফাঁদে নিজেই পড়ে। সে পড়ে কুমীরের মুখে। কিন্তু অন্ধ হওয়ায় তা দেখতে পায়না। এভাবে গল্পের শেষে পাপীর শাস্তি সমুচিত হয়। গল্পটির নামকরণ ব্যঙ্গাত্মক। তীর্থযাত্রার ছলনা করে অসহায় দরিদ্র গ্রাম্য নারীকে এ সমাজের হাজার নরোত্তম যেভাবে ছলনা করে, তা-ই এ গল্পের নামকরণে ব্যঞ্জিত হয়েছে। গল্পে সমাজের নৃশংস, ধূর্ত্ত প্রবঞ্চনার রূপটি স্পষ্ট। কিন্তু গল্পের শেষে অতি নাটকীয়ভাবে নরোত্তমের শাস্তি ও মৃত্যু গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে এবং গল্পটির মধ্যে নৈতিক অনুশাসনের সুর এনেছে। ফলে গল্পটি অনেকটা হিতোপদেশ জাতীয় গল্প হয়ে গেছে। রবিন পালও গল্পটি সম্পর্কে প্রায় একই অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়— 'গল্পটি এখানেই শেষ না করে আহত নরোত্তমকে ধরবার জন্য সত্যিকারের কুমীরের উপস্থিত করাটা অতিরিক্ত হয়েছে বলা চলে।'[১৩৪] নরোত্তম চরিত্রটি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন 'নরোত্তম প্রসঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্পের কালাচাঁদের কথা মনে পড়া বিচিত্র নয়।'[১৩৫] সত্যিই, 'তীর্থযাত্রা' গল্পের নরোত্তমের মতো 'নমুনা' গল্পের কালাচাঁদও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরজাত দুর্ভিক্ষের সুযোগে অর্থলোভী পিশাচের মতো মেয়ে পাচার করেছে। তার অর্থ-গৃধ্নুতা নরোত্তমের চেয়েও বীভৎস মনে হয়। কারণ, সে শালগ্রাম সাক্ষী করে বিবাহ করা পত্নীকে পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে অন্যের হাতে তুলে দিতে স্বীকৃত হয়েছে। তবে, এককথায় বলা চলে, নরোত্তম আর কালাচাঁদ একই গোত্রের লোক, কৃত্রিম মন্বন্তরের কালোবাজারে এঁদের চিনে নিতে ভুল করেননি নারায়ণবাবু ও মাণিকবাবু দুজনেই।

একজিবিশন —

এই গল্পটিতে আমাদের সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা দেখানো হয়েছে। আমাদের সমাজে নারী যে কত অবহেলিত, কত প্রবঞ্চিত তার পরিচয় আছে এই গল্পে। পুরুষই এ সমাজে নারীকে পণ্যে পরিণত করে, আবার পুরুষই তাকে ঘৃণা করে। যে সমাজ একটি মানবীকে বারবণিতায় পরিণত করে, সেই সমাজই তাকে অচ্ছুৎ বলে ত্যাগ করে। অসহায়া মেয়েটির কাছে পৃথিবীর সবক'টি দরজা একে একে বন্ধ হয়ে যায়। ভাল হবার পথটুকুও তার কাছে খোলা থাকেনা। এই নির্মম, করুণ সত্য এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

এক্‌জিবিশনে গিয়ে এমন এক ভাগ্যহীনা পতিতা বাঙালী নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল বসন্ত; যার (মেয়েটির) নিজের জীবনটাই একটা এক্‌জিবিশনের মতো। অর্থাৎ পয়সা দিয়ে মেয়েটিকে সবাই দেখতে পারে, তার কিছু অংশ খরিদ করতে পারে— কিন্তু কেউ তাকে ঘরে ঠাঁই দেয়না। একটা অশ্লীল প্রদর্শনী হয়ে এক বুক ব্যথা তাকে বয়ে বেড়াতে হয় আজীবন। তাই গল্পটির নামকরণ ব্যঞ্জনাগর্ভ।

গল্পের শুরুতে মেয়েটিকে দেখে বসন্ত ও পাঠকের খুব স্বাভাবিকভাবেই বিতৃষ্ণা হয়েছে। মেয়েটির উগ্র সাজ-পোশাক ও নির্লজ্জ হাব-ভাব তার পরিচয় গোপন করেনা। তাই বিরক্তি ও ঘৃণাতে বসন্ত পাঁচটা টাকা দিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু পতিতা মেয়েটির আত্মসম্মানে লাগে। কালিপড়া চোখদুটো তার ক্ষণেকের জন্য জ্বলে ওঠে - 'আমি ভিখিরি?'[১৩৬]

মেয়েটিকে এড়িয়ে গিয়েও কিন্তু বসন্ত শান্তি পায়না। কারণ— 'সেন্টিমেন্ট'। একটা বাঙালী মেয়ে বাঁচবার জন্য কত দুঃখে এই অপমানের পথ বেছে নিয়েছে, নিজে বাঙালী হয়ে সেকথা বসন্ত ভুলতে পারেনা।

এক্‌জিবিশনের একটি স্টলে পবিত্র যীশুর মূর্তি বসন্তের মনে এক অপরূপ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। আর সে সময় মেয়েটি সেখানে আসতেই ক্ষণ পূর্বের সহানুভূতি ভুলে বসন্তর মনে হয় 'অশুচি হয়ে উঠল সমস্ত'।[১৩৭] নিষ্ঠুর গলায় বলে '....অন্তত যীশুখ্রীষ্টের কাছে তুমি এসে না দাঁড়ালেই ভাল করতে।'[১৩৮] এবার মেয়েটি কিন্তু তাকে চমকে দিয়ে বলে 'খ্রীষ্ট নিজে বোধহয় অন্য কথা বলতেন।'[১৩৯] এরকম একটা মেয়ের কাছে এমন জবাব আশা করেনি বসন্ত। তাই নিজের চিন্তাধারার সঙ্কীর্ণতার কথা মনে করে সে লজ্জিত হয় এবং খ্রীষ্টের অপার করুণা ও ভালবাসার কথা তার মনে আসে। মেয়েটির অনুভবের গভীরতা দেখে এই প্রথম বসন্ত তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মৃদু নীল আলোর রহস্যময়তায় সে এই মেয়েটির সঙ্গে তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। কিন্তু মেয়েটি তার মনের এই কোমলতার উপর বারবার ইচ্ছাকৃত আঘাত হেনে বসন্তর পূর্ব-কৃত অপমানের প্রতিশোধ নেয়।

অবশেষে বসন্ত মেয়েটিকে জোর করে লেকের ধারে নিয়ে গিয়ে তার পূর্বকথা জানতে চায় ও এ জীবন বেছে নেবার জন্য তাকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু মেয়েটির জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা শুনে বসন্ত মমতা বোধ করে। আকুল স্বরে বলে 'এখন কি ফেরা যায়না?'[১৪০] এমনকি বসন্ত তাকে বিয়ে করারও আশ্বাস দেয়। কিন্তু বারবার প্রবঞ্চিত পোড়খাওয়া মেয়ে চাঁপা সেকথা বিশ্বাস করতে পারেনা। তবু এই মুহূর্তে বসন্তর ভালবাসা ও সমবেদনা পেয়ে তার ভেতরকার সুপ্ত 'চম্পা' জেগে ওঠে। আনন্দে তার দুচোখে জল আসে। আবার নতুন করে বাঁচবার— ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে চম্পা। তবু দ্বিধা চকিত স্বরে প্রশ্ন করে— 'আত্মীয় স্বজন নেই আপনার? সমাজ?'[১৪১] মুহূর্তের জন্য বসন্তর মুখ অন্ধকার হয়। কিন্তু খ্রীষ্টের করুণাঘন

মূর্ত্তির আশ্বাস পেয়ে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে বলে 'না, সে ভাবনা আমার নেই।'[১৪২] চম্পার ঘামে-ভেজা লাজুক, ভীরু হাত সে নিজের হাতে তুলে নেয় পরম মমতা আর দৃঢ় প্রত্যয়ে। ঠিক সেইসময়েই এক্‌জিবিশনে আগুন লাগে। 'প্রাণ বাঁচানোর আদিমতম প্রেরণায়' ছুটন্ত মানুষের ভীড়ের চাপে চম্পা ও বসন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভীড়ের চাপে পিষ্ট চম্পাকে বাঁচাতে যাবার মানে নিশ্চিন্ত মৃত্যু একথা বুঝে আদিম জৈব প্রেরণায় প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বসন্তও ছুটে চলে।

আর গেটের বাইরে বেরিয়ে তার মনে হয় এ 'ভালোই হল'।[১৪৩] তার অবচেতন মন হয়তো এটাই চেয়েছিল। সমাজের বিরুদ্ধে একা লড়াই করবার সাহস কি তার শেষ অবধি থাকত? চম্পার জীবনের চতুর্থ পুরুষটিও যে তাকে বঞ্চনা করতনা-একথাকি জোর করে বলা যায়? সংশয় দ্বিধাকুল বসন্ত পরাজয়ের গ্লানি বহন করে টলতে টলতে পথ চলে। আর তার মনে হয় ততক্ষণে হয়তো পুড়ে যাচ্ছে 'ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট'। এই ভাবনাটির ব্যঞ্জনাই বসন্তর হৃদয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অপার মমতা ও ভালবাসার ইঙ্গিত দেয়। স্বার্থপর ভীরু বসন্ত আমাদের পুরুষ-সমাজের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একা।

গল্পটির বাস্তবতা গল্পটির বিশ্বাসযোগ্যতার শর্ত পূরণ করেছে। চরিত্রগুলিও বাস্তবায়িত। বাঙালী যুবক বসন্তের চিন্তাধারার পরিবর্তনও অত্যন্ত বাস্তব এবং সমাজানুগ। গল্পটির গঠন-কৌশল প্রশংসনীয়। গল্পটিতে কথিত পতিতা নারীটির হৃদয়-বেদনা সমাজ-দরদী লেখক শরৎচন্দ্রের কথা মনে করায়। গল্পে চরমক্ষণ এসেছে নাটকীয়ভাবে গল্পের শেষ মুহূর্তে এক্‌জিবিশনে আগুন লাগা ও তৎজনিত ঘটনায়। গল্পটির ভাষা ভাবানুযায়ী কখনো কোমল-রোম্যান্টিক, কখনোবা ব্যঙ্গে শাণিত। গল্পের শেষে বাঙালী যুবক বসন্তের আত্ম-বিশ্লেষণ যেন এই নিষ্ঠুর নারী-নির্যাতনকারী সমাজের পোস্টমর্টেম করেছে।

হলদে চিঠি —

বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরাণীর স্থান এ সমাজে কোথায়, তার স্পষ্ট নির্দেশ আছে এ গল্পে। গল্পটি চেখভের 'Death of a clerk' গল্পটির কথা মনে করায়। কিন্তু চেখভের গল্পে যে চাবুক আছে, হাস্যরসের অন্তরালে যে বেদনার ফল্গুধারা আছে, তা এই গল্পে ঠিক তেমনভাবে উপস্থাপিত হয়নি। এখানে বেদনা কোনকিছুর অন্তরালে নেই। এখানে আনন্দ ধীরে ধীরে বেদনায় পরিণত হয়েছে। চেখভের গল্পে আমরা দেখি সমাজ কিভাবে ভীরু, নির্বীজ, মেরুদণ্ডহীন একশ্রেণীর কেরাণী-চরিত্র সৃষ্টি করেছে। আর এ গল্পে আমরা দেখি কেরাণী সমাজে কত অবহেলিত, অনাকাঙ্ক্ষিত।

কেরাণীর চাকরির এ্যাপয়েনমেন্টের হলদে চিঠি অনিন্দ্যর বেকার জীবনে এনেছিল উৎসাহের আলো, সেই চিঠিই আবার তাকে গাছের পাতার হলুদ বিবর্ণতায় করুণ করে তুলেছে। দীর্ঘ বেকারত্বের অবসান ঘটায় আনন্দে অনিন্দ্যর যেন নেশার ঘোর লেগেছে। কিন্তু নাক-উঁচু সমাজ তার এই ঘোর কাটাতে দেরি করেনি। খুব শিগ্‌গিরই তাকে নগ্ন নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়েছে। শখের ইন্‌ট্যালেকচুয়াল লেখক বন্ধু অমরেশের কথায় কেরাণীর প্রতি অবজ্ঞা সুস্পষ্ট। তার কথা তাই অনিন্দ্যকে আঘাত করেছে। সে অনুভব করেছে 'বুদ্ধিজীবীর কাছে কেরানীগিরির মতো দীনতা আর নেই।'[১৪৪]

অমরেশের ভাষায় কেরাণীরা বই পড়তে পড়তে বাসে আর লোকাল ট্রেনে ঘুমোয়। আর কেরাণীর জীবন মানেই 'মিডলক্লাসিজম্‌ .....ছাঁটাই ইনক্রিমেন্ট অভাবের ফিরিস্তি .... মিনমিনে প্রেম....সেক্সের খোঁচা, ভাড়াটে বাড়ির একতলা, কল নিয়ে ঝগড়া.... এক আধডোজ সোশালিজম্‌'।[১৪৫] তাই অনিন্দ্য এক মুহূর্তে অনুভব করে 'এতদিনের চেনা বন্ধুর দল থেকে আজ সকালেই সে একেবারে আলাদা হয়ে গেল। এদের সঙ্গে তার আর মিলবেনা।'[১৪৬] আসলে সে আজ একটা কেরাণী একটি বিশেষ শ্রেণীর নীচুতলার মানুষ যাদের কোন বন্ধু থাকেনা এক কেরাণী ছাড়া। অমরেশের কথা অনিন্দ্যর মনে দ্বিধা ও সংশয় আনে— অমরেশই কি ঠিক বলেছিল? এই কেরাণীগিরির ধান্দায় দিনের পর দিন তারও মনটা বিন্দু বিন্দু করে মরে আসবে? কোনোমতে বেঁচে থাকার গ্লানি চাকরীর ছোটখাট দাবী তাকে শুকিয়ে তুলবে? রূপ রং-হীন জীবনে আধুনিকতার বোধ হারিয়ে সেওকি উপন্যাস কোলে ট্রেনের দোলায় ঝিমোবে?

তবু নতুন আশায় বুক বেঁধে অনিন্দ্য রওনা হয়েছে তার শেষ আশ্রয় নমিতার কাছে। উজ্জ্বল মুখে তার চাকরীর চিঠি হাতে নিয়েছে নমিতা। কিন্তু চিঠি পড়ে কেরাণীর চাকরীর কথা জেনেই তার মুখের আলো গেছে নিভে। অনিন্দ্য উপলব্ধি করেছে প্রেমের চাইতে ভাল চাকরি-টাকা-স্বার্থ এখন নমিতার কাছে অনেক বড়। এ্যাসিস্টেন্ট হেডমিস্ট্রেস হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছেড়ে নমিতা কেরাণীর অভাবের সংসারে কোনদিন যাবেনা। রবি ঠাকুরের কবিতার হরিপদ কেরাণীর মতো অনিন্দ্যও ভাববে—

'ঘরেতে আসেনি সেতো
মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া
পরণে ঢাকাই শাড়ি
কপালে সিঁদুর।'[১৪৭]

নিরুপায়, নিরাশ অনিন্দ্যর তখন মনে হয় এর চেয়ে বেকারত্বই বুঝি ভাল ছিল। তখন সম্ভাবনার সীমা ছিলনা। কিন্তু চাকরীর

এই কেরাণী জীবনের বঞ্চনার বৃত্তে 'নমিতার কাছে সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল সে।'[১৪৮]

গল্পটি পড়ে পাঠক উপলব্ধি করে যে, সত্যিই আমাদের সমাজে কেরাণীগিরির চেয়ে বেকারত্বও কাম্য। কেননা, তাতে অভাব থাকলেও প্রত্যাশা আছে। আর কেরাণীর চাকরিতে আছে কেবল দীনতা ও নিরাশা। এখানে অনিন্দ্য সমগ্র কেরাণী শ্রেণীর প্রতিনিধি। তার মধ্যে দিয়েই কেরাণী জীবনের যন্ত্রণা, অগৌরব ও হতাশা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। লেখক খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে তার আনন্দোজ্জ্বল হৃদয়ের ক্রমবিবর্তন দেখিয়েছেন। মাত্র দু-একটি চরিত্রের কথায় ও হাবে-ভাবে আমাদের সমাজে কেরাণী-জীবনের গ্লানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই গল্পটি সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতগর্ভ। ব্যক্তি-বেদনাকে ছড়িয়ে সমগ্র কেরাণীকুলের মর্মান্তিক ট্রাজেডি এ গল্পে ব্যক্ত হয়েছে। আগাগোড়া গল্পটিতে বিন্যাসে, বাচনে, ইঙ্গিতে, সমাপ্তিতে 'প্রতীতির সমগ্রতা' রক্ষিত হয়েছে। সমুদ্রর একটি ঢেউ যেমন সাগরের বার্তা বহন করে, তেমনি এ গল্পের প্রতীতি সমকালীন সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর চাকুরিজীবির করুণ জীবন-সত্যকে ব্যক্ত করেছে। চেখভের গল্পের তীব্রতা ও গভীরতা অবশ্য এ গল্পে নেই। তবু গল্পটি ছোটগল্প হিসেবে সার্থক।

তৃণ—

আমাদের ছুঁৎ মার্গপূর্ণ শোষণ-পুষ্ট সুযোগ-সন্ধানী সমাজে নিম্ন শ্রেনীর মুসলমান জেলেদের স্থান নেই। তাই তাদের জীবনের এঘাট থেকে ওঘাটে আশ্রয়হীনভাবে তৃণের মতো ভেসে বেড়াতে হয়। তাদের জীবন-কথাই সমাজের ক্যান্‌ভাসে এ গল্পে এঁকেছেন সমাজ-সচেতন লেখক নারায়ণবাবু।

নির্বিরোধ, শান্তিপ্রিয় মুসলমান ধাওয়ারা জীবনে পেয়েছে কেবল আঘাত আর বঞ্চনা। কিন্তু তাদের কণ্ঠে প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদের ক্ষীণতম ভাষাটুকুও তাদের কণ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তারা কেবল তাদের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে শিখেছে আর ভেবেছে 'আল্লা মালেক ছাড়া এর জন্যে দায়ী নয় কেউ।'[১৪৯]

তাই ধূর্ত্ত পাইকার যখন বলে 'আল্লা! আল্লা কী করবেন! মানুষের বদমায়েশী সব।'[১৫০] তখন ধাওয়া বসির ক্লান্ত নির্বোধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। এই সত্যকে অস্বীকার করতে চায়, তাই এসব কথা শুনতে ভালো লাগে না। এসব কথা যেন তার মনের মধ্যে খোঁচা মেরে সুপ্ত পুরুষ-সিংহকে জাগিয়ে তুলতে চায়। শিরায় শিরায় জ্বলে ওঠে আগুন।— 'মানুষ! মানুষের চাইতে বড় শত্রু মানুষের আর কে আছে!'[১৫১] এই কথাটিকেই মর্মান্তিকভাবে সত্য করে তোলে পাইকার এ গল্পের শেষে।

ধূর্ত্ত পাইকার 'সর্ব-বিশারদ'। মুখে তার সিনেমার গান, ফর্সা রং, গায়ে ধোপ দুরস্ত পাঞ্জাবি, সিল্কের লুঙ্গি। যখন সে বাঁশী বাজায়, দরজার পাশে ঠুনঠুন্ করে ওঠে বসিরের দ্বিতীয় বিবি সুন্দরী রোসেনার হাতের কাচের চুড়ি। কুৎসিত, দরিদ্র বসির তার যৌবন-চঞ্চলা বিবিকে খুশি করতে পারেনা। রোসেনার চুলের কাঁটা, রঙিন শাড়ি, প্রসাধনের দ্রব্যের প্রতি লোভ আছে। তাই জল আনতে গিয়ে তার বেলা বয়ে যায়। বসিরের ঘরে ফেরার কথা মনেও থাকেনা। আর তীব্র সন্দেহে ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বসিরের মন।

'লোকে বলে পাইকারের অসাধ্য কাজ নেই।'[১৫২] তবু এই পাইকারের ওপর ভরসা করেই অসহায় 'মোছলমানের বাচ্ছা' বসির নিজের বিবির ইজ্জৎ রক্ষা করতে গ্রাম ছাড়ে। জমিদারের লালসার দৃষ্টি থেকে বিবিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে সে পাড়ি দেয় দূর অজানার পথে। তার ভিতরের পুরুষ-সিংহ জেগে ওঠে ক্ষণিকের জন্য। একটুর জন্য তার হাতের হাসুয়া জমিদারের চরের গলা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আর রাতের আঁধারে জলে ভাসা তৃণের মতো সে নিরাশ্রয় হয়ে ভেসে চলে জীবনের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। বহুকাল আগে জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ আবার একই কারণে তাকে এই গ্রামও ছেড়ে যেতে হয়। আসলে সমাজ ওদের আশ্রয় দেয়না, ধর্মের ছত্রছায়া ওদের জন্যে নয়। তাই বসির 'ধাওয়া' একথা জেনে ঘৃণায় মৌলানা সাহেবের মুখের রং বদলায় 'মোছলমানের ব্যাটা হয়ে জেলের কাজ করিস? মরে যে তুই দোজখে যাবি।'[১৫৩] বসিরেরই জালে পড়া বড় বোয়াল মাছটা বিনে পয়সায় তৃপ্তি করে খেয়ে মৌলানা সাহেবের এই ঘৃণাও একান্ত স্বাভাবিক বৈকি! তবু এত জুলুম, অপমান সে হজম করে নিয়েছিল। কিন্তু বিবির দিকে কুনজর তার সহ্য হলনা। তাই অনিশ্চিত জীবনের দিকে সে পা বাড়াল। আর ধূর্ত্ত সুযোগ-সন্ধানী, কৌশলী পাইকার তার আদিম ক্ষুধার হাত থেকে তাকে রেহাই দিলনা।

সুযোগ এসে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। 'ডারকিনা'র থেকে বসির মাছ চুরি করে আনতে গেল রাগের মাথায় তার এতদিনের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে। আর পাইকার সেই সুযোগে তার বিবিসুদ্ধ নৌকা নিয়ে পালাতে লাগল। অসহায় বসির জলে সাপের কামড়ে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলে তার বিবি রোসেনাও কেঁদে উঠল। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় শয়তান পাইকার শান্ত স্বরে বলল 'কেঁদে আর কি করবে বিবিজান, মানুষতো আর চিরকাল বাঁচে না।'[১৫৪] দাম ঘাসগুলো হাওয়ায় দুলতে লাগল 'গোখরো সাপের কিলবিল একরাশ ছানার মতো।'[১৫৫] আর বিলের জল 'বাঘের চোখে'র মতো ঝলমল করতে লাগল।

এটি একটি সার্থক ছোটগল্প। চরিত্র-চিত্রণে, কাহিনীর ঠাস বুননে, সমাজ-সত্যের প্রতিফলনে গল্পটি জীবন্ত। 'পাইকার' চরিত্রটির স্বরূপ ফুটে উঠেছে লেখকের সামান্য ক' টি কলমের আঁচড়ে। চরিত্রটিকে গল্পের শুরু থেকে লেখক যেভাবে ক্রমশ মেলে ধরেছেন পাঠকের সামনে, তাতে পাঠক সাস্পেন্সে থাকে ও ভয়ঙ্কর কিছুর আশঙ্কা করে। তবু গল্পের শেষে এসে ভয়ে-ঘৃণায়-করুণায় পাঠকের হৃদয় আলোড়িত হয়। গল্পের শেষে পাইকারের শান্ত নির্লিপ্ত কথাতে, প্রকৃতির হিংস্র বর্ণনার মধ্যে ক্রুর শীতল সর্পের বিষ-নিঃশ্বাস পাঠক অনুভব করে, বাঘের হিংস্র চোখ বুকের রক্ত হিম করে আনে। আর গল্পটির সর্বপ্রধান সার্থকতা এইখানে যে, গল্পটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বুকের ভিতর একটি সত্য ক্রমাগত ঘা দিতে থাকে যে, বসির একা নয়, বসির হল সমগ্র হতভাগ্য মুসলমান 'ধাওয়া' জাতি যাদের মাটিতে 'শিকড়' নেই, 'হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শিমূল তূলো'র মতো যাদের জীবন, জলে ভেসে যাওয়া অবহেলিত 'তৃণে'র মতো যাদের জীবন যে জীবনে আছে শুধু ঘৃণা, অপমান, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা।

'তৃণ' গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে রবিন পাল বলেছেন — 'প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় চল্লিশের দশকের মুসলমান জীবন নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনার প্রবণতা এই উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি মমতা থেকে আসছে। এদিক থেকে অচিন্ত্যকুমারের প্রয়াসও মনে আসে।'[১৫৬] এছাড়াও দীনেশরঞ্জন দাসের 'মাটির নেশা', 'গাঁয়ের মাটি' প্রভৃতি গল্পেও জমিদারের অত্যাচারে অসহায় দরিদ্রের তৃণের মতো ভেসে বেড়াবার কাহিনী আছে। তাই গল্পগুলির সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটির বিশিষ্টতা এইযে, এতে এক সম্প্রদায়ের আরেক সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের কথা নেই। মুসলমান সমাজেরই অন্তর্গত 'ধাওয়া'দের মুসলমানরা কেমন অস্পৃশ্য মনে করে ও তাদের উপর অত্যাচার করে, তারই বাস্তব চিত্রায়ণ আছে এ গল্পে।

মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু—

এই গল্পে ছাত্র-সমাজের দীনতা— তাদের নানান্ সমস্যা ও অসুবিধার কথা আছে, যা সমাজ-উদ্ভুত। গল্পটি একটি চিঠির বয়ানে কথিত। পরীক্ষার খাতায় শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখেছে একটি দুর্ভাগা ছাত্র। এই চিঠিটিই গল্প। সমগ্র চিঠিটিতে ছাত্র- জীবনের মর্মান্তিক বেদনা ও ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে, যার জন্য দায়ী সমাজ। তাই এখানে ছাত্রটি একটিমাত্র ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমগ্র ছাত্র-সমাজের প্রতিনিধি।

ছাত্র স্বাধীনকুমার জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে স্বাধীন ভারতের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। ভারতের তথাকথিত স্বাধীন সমাজকে, 'অধ্যাপক বিবেককে' সে উপহাস করেছে। স্বাধীনতার শহীদ নিজের চাষী বাবার কথা ভেবে 'দিল্লী আলো করা নেতাদের' ওপর বিদ্রূপের তরবারি ঝলসে উঠেছে স্বাধীনকুমারের। স্বাধীনকুমার দরিদ্র চাষীদের করুণ জীবন ও তাদের শিক্ষার বিড়ম্বনার কথা তীব্র শ্লেষের সঙ্গে জানিয়েছে। বস্তুত, এ চিঠির প্রতিটি পংক্তিতে জীবন-বেদনা-জাত ব্যঙ্গ তীক্ষ্মমুখী ও শতধা।

স্কুলে স্বাধীনকুমার স্কলারশীপ পায় ও সেটাই তার 'কাল' হয়ে দাঁড়ায়। চাষীর ছেলে শুরু করে স্বপ্ন দেখতে। তার দুঃখিনী মাও আশা করে তার ছেলে 'স্বাধীন ভারতের কর্মী' হবে। কিন্তু স্বাধীন ভারত স্বাধীনকুমারের দায়িত্ব তুলে নেয়না— শিক্ষার পথ দেয়না খুলে। ফলে মরীয়া হয়ে ক্লাসমেটদের বই চুরি করতে শুরু করে সে। কত দুঃখে যে ছেলেরা বই চুরি করে, পরীক্ষায় নকল করে তা উপলব্ধি করে সে। বস্তুত, সমাজ-ব্যবস্থা না বদলালে এগুলি বন্ধ হওয়া অসম্ভব। আর এর জন্য ছাত্রদের দোষ না দিয়ে সমাজকেই দায়ী করা উচিত। কিন্তু এ সমাজের মানুষ বই-চোর, নকল-নবীশ ছাত্রদেরই ঘৃণার চোখে দেখে। স্বচ্ছল অধ্যাপকরা কখনো চিন্তা করেননা সামান্য একটা পাস-ফেলের ওপর একটি ছাত্রের জীবন কতটা নির্ভর করে।

পরীক্ষার ফী মেটাবার সাধ্য ছিলনা স্বাধীনকুমারের। কিন্তু অযাচিতভাবে সরকার বাড়ির কর্তা তাকে ফী মেটাতে সাহায্য করে। আর এই অযাচিত দাক্ষিণ্যের মাশুল দিতে হয় স্বাধীনকুমারকে। 'পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে রাত জেগে জেগে, ছিঁড়ে পড়া চোখ আর মাথায় বিশ মণ পাথরের ভার নিয়ে'[১৫৭] তাকে সরকার বাড়ির কর্তার ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার খাতা তৈরি করতে হয়। পড়ার সময় পায়না। তবু সে পরীক্ষা দিতে আসে। পরীক্ষায় নকল করতে চেয়েও শেষ অবধি পারেনা।

স্বাধীনকুমার স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন বাঁচতে পারলনা — হাজার হাজার ছাত্রদের পক্ষ থেকে সেই প্রশ্নই তুলে ধরেছে স্বাধীনকুমার। তার আত্মহননের সিদ্ধান্ত তাই পরাজয় নয়, প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে তার বাবা যেমন দেশের মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, তেমনি স্বাধীনকুমারও তার রক্ত দিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এক ইতিহাসের বৈপ্লবিক সূচনা করে যেতে চেয়েছে। তাই চিঠির শেষে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মিলিত অগ্নিশিখা ভবিষ্যতকে আলোকিত করেছে। চিঠিটির ভাবাবেগ অত্যাধিক বলে মনে হলেও একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এ চিঠি কোন স্থিতধী লেখক লেখেননি, লিখেছে এক হতভাগ্য দরিদ্র ছাত্র।

গল্পটি একমুখী এবং এতে প্রতীকীর সমগ্রতা রক্ষিত হয়েছে ছোটগল্পের সর্ত্তানুযায়ী। কিন্তু ভাবাতিবেগ ও অতি-নাটকীয়তা অনেক সময়ে গল্পটির সামঞ্জস্য ও নিটোল ভাব-গভীরতাকে বিনষ্ট করেছে। গল্পটিতে লেখকের সহানুভূতির ছায়া এত ব্যাপক যে, গল্পে যে নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্য ও ভাবনা থাকে, তার স্বাদ থেকে পাঠক বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ অবশ্য এ গল্পে যথাযথভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুনন্দর জার্নাল' এর অন্তর্গত 'কুকুর সংহার' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। সেখানে অধ্যাপক জোর গলায় বলেছেন— 'যদি সত্যিই ফেলের হার কমাতে চাও, সমস্ত এডুকেশন্যাল সিষ্টেমটাই বদলে দাও। ছাত্রদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করো ... শিক্ষার আবহাওয়া তৈরি কর।' ('সুনন্দর জার্নাল' প্রঃ প্রঃ ১৩৮৪, পৃঃ ৬৮) সেখানেও আমাদের সমাজে শিক্ষাজগতের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কথা আছে। এগল্পটির ব্যঙ্গাত্মক সুদীর্ঘ নামকরণই ~~(জোর প্রমাণ)~~ শিক্ষা জগতের অরাজকতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে।

রাজনৈতিক গল্প

সমাজ-সচেতন শিল্পী সমকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হন এবং দেশ ও জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে রাজনৈতিক গল্পের সৃষ্টি করে। বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত হয় এই জাতীয় গল্প এবং বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচার বা গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে গল্পটির গভীরে। প্রসঙ্গত, আঁদ্রেভের 'The seven who were hanged' গোর্কীর 'The Ninth of July' ; আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' সাম্প্রতিক কালে সমরেশ মজুমদার রচিত 'কালবেলা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর কিছু রাজনৈতিক গল্পগুলিতে। তাঁর কিছু রাজনৈতিক গল্প এবার আলোচনা করছি।

নীলা —

'নীলা'র রূপকে এ গল্পে ধনতন্ত্রের সঙ্গে শ্রমজীবী সাধারণ শোষিত মানুষের সংঘাতের কথা আছে ও সেই সঙ্গে আছে সাম্যবাদের প্রচার। পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ বাংলাদেশ ও তার দরিদ্র মানুষকে নির্বিচারে শোষণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই 'স্টার্ভিং বেঙ্গল'[১৫৮] এর পটভূমিতেই গল্পটি রচিত হয়েছে।

কারোর ভাগ্যে নীলা সয়, কারোরবা সয়না। যার সয়, তার চড়চড় করে উন্নতি হয়। আর যার সয়না, তার কাছে নীলা এক সর্বনাশা বিষ, যা 'স্পর্শ করলেই অপমৃত্যু।'[১৫৯] তাই এ গল্পের নামকরণ প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত ও ব্যঞ্জনাময়। এ গল্পে লাবণ্য-স্নিগ্ধ কুন্তলার চোখ নীলার মতোই উজ্জ্বল ও শাণিত। শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যে এই নীলা আশির্বাদ-স্বরূপ; আর বুর্জোয়া ভাস্করের কাছে এ এক অভিশাপ। তাই নারী-লোলুপ ব্যবসায়ী ভাস্কর সেক্রেটারী কুন্তলাকে তার নর্মাসহচরী করে তুলতে চাইলে, বুদ্ধিমতী, সাম্যবাদী কুন্তলা তার এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এর সদ্ব্যবহার করে। সে তার মোহিনী মায়ার জাল বিস্তার করে। ক্রমে অজগরের মতো পাকে-পাকে ভাস্করের বুর্জোয়া সত্তাকে বেঁধে ফেলে, সম্মোহিত ভাস্কর এর অনিবার্য পরিণতি জেনেও সরে যেতে পারেনা। তার অসহায় আশঙ্কা গল্পটির পরিণতির দিকে ছায়াপাত করে।

ক্রমে ভাস্করের ব্যক্তিসত্তাকে ছলনার জালে জড়িয়ে গ্রাস করে কুন্তলা। ভাস্করের শিরায় শিরায় রক্তের কলধ্বনি বেজে ওঠে জোয়ারের জলের মতো। শ্রমজীবী শোষিত দরিদ্রের স্বার্থে, শ্রমিক-নেতা কান্তিকে ভালবাসার তাগিদে কুন্তলা ভাস্করের শরীরের প্রান্তে সেতারের মীড়ের স্পন্দন জাগায়। আর এমন মধুর, রোমাঞ্চকর মুহূর্তে সে ভাস্করকে শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে অনুরোধ করলে মন্ত্র-চালিত পুতুলের মতন ভাস্কর তা পালন করে। গল্পের চরম-ক্ষণ আসে এখানেই।

কিন্তু ক্ষণিক পরে কান্তির জয়ধ্বনি আকাশ ছাপাতেই, মিলের লোহা-লক্করের বাস্তবতার সামনে এসে ভাস্করের মোহাচ্ছন্নতা কেটে যায়। তীব্র অনুশোচনায় ভরে ওঠে তার মন। এর অনিবার্য পরিণাম তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি বিদ্যুৎ চমকের মতো কুন্তলার আসল উদ্দেশ্য ও পরিচয় তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু কুন্তলার নীলার মতো মোহিনী দুটি চোখের মায়ায় এ চিন্তা বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। ভাস্কর সভয়ে আবিষ্কার করে যে, এমন চোখ সে দেখেছিল মাদুরায় নটরাজের তৃতীয় নেত্রে। কিন্তু সেই উজ্জ্বল অপরূপ হীরায় 'তীব্র বিষ সঞ্চারিত, স্পর্শ করলেই অপমৃত্যু।'[১৬০]

নটরাজের যেমন এক পায়ে ধ্বংস, আরেক পায়ে সৃষ্টি; কুন্তলার বিদ্রোহী সত্তারও তেমনি একদিকে শোষক ধনতন্ত্রের ধ্বংস, অন্যদিকে সাম্যবাদের সৃষ্টি। গল্পটির সমাপ্তি নাটকীয়, কিন্তু গল্পটির প্রতি ছত্রে এরই প্রস্তুতি ছিল। তাই সুপরিকল্পিত গঠন-কৌশলে গল্পটি গ্রথিত এবং ইঙ্গিতগর্ভ তাৎপর্যে অন্বিত। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণই গল্পটির প্রধান ও প্রাথমিক লক্ষ্য। তাই এটি একটি সার্থক রাজনৈতিক গল্প। এইধরনের রাজনৈতিক গল্প রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নারায়ণ বাবু স্বয়ং বলেছেন- 'সমস্ত

পৃথিবীর যে প্রবঞ্চিত মানব-সঙঘ আজ ধন-বন্টনের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, এদের এই অভিযান, এই আবেদনকে বাণী দেবে কে? এই বাণী ঝঙ্কারিত হবে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে, সাহিত্য গ্রহণ করবে যুগ-জাগরণ লগ্নে চারণ-কবির ব্রতচর্যা।'[১৬১] সুতরাং লেখকের রাজনৈতিক আদর্শবাদের ছায়া এ গল্পের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কার করা যায়।[১৬১]

দুঃশাসন —

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে যুদ্ধের সুযোগে কিছু অসৎ ব্যবসায়ী কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছিল। তার ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছিল কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্রসঙ্কট। এই বস্ত্রসঙ্কটের পটভূমিতেই 'দুঃশাসন' গল্পটি রচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেবল নারায়ণবাবু নন, সমকালীন আরও কিছু লেখককে এই বস্ত্রসঙ্কটের ভয়াবহ সমস্যা নাড়া দিয়েছিল। প্রসঙ্গত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি স্মরণীয়। কেবল গল্পের নামকরণে নয়, বিষয়বস্তুতেও গল্পদু'টির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। তবে মাণিকবাবু গল্পের পরিণতি টেনেছেন সরাসরি বিপ্লবের দিকে। আর নারায়ণবাবু ইঙ্গিত দিয়েছেন আসন্ন বিদ্রোহের। রবিন পালের ভাষায়— 'মাণিকবাবু যেখানে মূলত বিবরণধর্মী, নারায়ণবাবু সেখানে গল্পের গল্পত্বকে হরণ করেননি। প্রথমজনের লেখা নাটকীয়তাবর্জিত, দ্বিতীয়জনের নাট্যগুণান্বিত; প্রথমজন চরম নৈরাশ্যে গল্প শেষ করেছেন, দ্বিতীয়জন সেখানে শোষক শ্রেণীসমূহের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহাকে সংহত ভঙ্গিতে অপূর্ব রূপদান করেছেন।'[১৬২]

'দুঃশাসন' গল্পের দেবীদাস অসৎ বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিস্বরূপ গল্পে উপস্থাপিত, সে যুদ্ধের বাজারে উচ্চ মুনাফা লাভের জন্য দরিদ্র নগ্ন মানুষকে বঞ্চিত করে গুদামে কাপড় মজুত রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় নৈতিকতার অবনমন তার চরিত্রে স্পষ্ট। বিবেক ন্যায়-নীতিবোধের বালাই নেই তার। দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে সে টাকা খাইয়ে হাতে রাখে। এইভাবে 'প্রশাসনের সঙ্গে মজুতদারের অশুভ আঁতাত'[১৬৩] গল্পটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামের যোড়শী মেয়েকে নগ্না দেখে দেবীদাস চমকে ওঠে, ভয় পায়। তার কৃতকর্মের ফল দেখে সে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ওঠে। 'দুঃশাসনের রক্তপান' বলে যে যাত্রা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় তার রূপকে আজকের হাজার দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকারী অসংখ্য দেবীদাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির ভয়াবহ ইঙ্গিত বহন করে। দেবীদাসের ভাই গৌরদাস ভাবে — 'যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?'[১৬৪] বস্তুত এই প্রশ্নই এ গল্পের মূল সুর। তাই লেখক বলেছেন- 'যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার। তার সমস্ত লজ্জা, মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।'[১৬৫] আর এই সত্যটি উপলব্ধি করেই 'এযুগের দুঃশাসন' দেবীদাস শ্রমিকদের হাতে ধারালো হেঁসোতে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক বিদ্রোহের ঝলকানি দেখেছে আর ভেবেছে তাকেও কি রক্ত দিতে হবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঐ বস্ত্রহরণকারী দুঃশাসনের মতো?

গল্পটি সংক্ষিপ্ত এবং সুগ্রন্থিত। এর বক্তব্য ইঙ্গিতগর্ভ ও তাৎপর্যময়। 'ক্ষোভ-ঘৃণা-র্ভৎসনা জুগুপ্সার শতসঞ্চারীতে বিদীর্ণ পুঞ্জীভূত যুগের ক্রোধ'[১৬৬] এখানে যুগশিল্পী নারায়ণবাবুর লেখনীমুখে রাজনৈতিক বিদ্রোহের আসন্ন সম্ভাবনায় গর্জে উঠেছে। যাত্রার রূপকে এযুগের হীন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চক্রান্তের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর ফলে পাপী দেবীদাসতো বটেই, পাঠকও সচেতন হয়ে উঠেছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি-জাত সামাজিক সঙ্কটের মুখে গল্পটি রচিত হলেও লেখক কৌশলে প্রাচীন পুরাণ-মহাকাব্যের সঙ্গে (মহাভারত) এর অর্ন্তযোগ ঘটিয়ে গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছেন। ফলে গল্পটি তার সমস্যাকে সময়ের গণ্ডী পার করতে পেরেছে। গল্পটির চরিত্রগুলিও বাস্তব। ভাষা চরিত্রানুসারী। গল্পটি বাণের মতোই একলক্ষ্যভেদী। বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথ-ইঙ্গিত এ গল্পে স্পষ্ট।

কালনেমি —

একটি রাজনৈতিক বিদ্রূপাত্মক গল্প এটি। ইংরেজরা কিভাবে কূট রাজনৈতিক চক্রান্তের মধ্য দিয়ে ভারতের ভিতরকার শক্তিতে ফাটল ধরিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং ইংরেজদের ছোঁড়া চাবুক কেমন করে তাদের নিজেদেরই গায়ের উপর এসে পড়েছে- সেই কথা আছে এই গল্পে।

অ্যাঞ্জেল সাহেব প্রয়োজনে চমৎকার ভারত প্রেমের অভিনয় করতে পারে। কিন্তর তার চোখ 'বেড়ালের চোখের মতো ঝকঝক'[১৬৭] করে। এই একটিমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে লেখক ধূর্ত্ত শয়তান অ্যাঞ্জেল সাহেবের চরিত্রের স্বরূপকে মুহূর্তে উদ্ঘাটিত করেছেন।

ভারতের স্বাধীনতার খবর পেয়ে অ্যাঞ্জেল সাহেব বিমর্ষ হয়েছে, ভীত হয়েছে ভারত-শোষণের নিশ্চিন্ত সুখ হারাবার ভয়ে। ভেবেছে – 'সত্যিই কি চলে যেতে হবে? ভারতবর্ষের এই রসালো মাটিতে এই সহস্রমুখী শিকড়গুলোকে এক টান দিয়ে উপড়ে ফেলে দীনাতিদীনের মতো নত মস্তকে গিয়ে উঠতে হবে জাহাজে? এর চাইতে মৃত্যু ভালো, এ অপমান সইবার আগে

আত্মহত্যা করাও বুদ্ধিমানের কাজ। ওই লেবার পিপল্‌গুলোকে এখন একবার সামনে পেলে'[১৬৮] —ঘৃণায়, ভয়ে, হিংস্র আক্রোশে সাহেবের রাইফেলের ব্যারেল ঝিকিয়ে উঠে তার পরবর্তী হিংস্র কুটিল পদক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

জনস্টন সাহেবের কূট পরামর্শে কৌশলে নেপালকে স্বপক্ষে আনবার কূট চালে নিশ্চিন্ত হয়ে অ্যাঞ্জেল সাহেব ভারত-প্রেমের অভিনয় করেছে। বিড়ালতপস্বী অ্যাঞ্জেল সাহেব এখানে সমগ্র ইংরেজ জাতির কপটতা, ধূর্ত্ততার মূর্ত্ত প্রতিনিধি।

ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করে পাকিস্তানের সৃষ্টি করেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হয়নি। সুযোগ বুঝে নেপালে আসন গেঁড়ে বাঙালীদের উৎখাত করতে চেয়েছে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছে। কেননা বাঙালীর বুদ্ধি, সাহসকে তারা ভয় পায়। 'এককালে বাঙালীরাই ক্ষেপিয়েছে ভারতবর্ষকে'[১৬৯] —এ তথ্য তাদের অজানা নয়। প্রসঙ্গত নারায়ণবাবুর বাঙালী- প্রীতি এখানে স্মরণীয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

ইংরেজরা, নেপালীদের দিয়ে বাঙালীদের উৎখাত করতে চেয়েছে। নেপালে বাঙালী-বিক্ষোভ দেখা দিলে বাঙালীরা ব্যর্থ দরবার করেছে অ্যাঞ্জেল সাহেবের কাছে। তাদের মনে হয়েছে এর প্রতিকার করতে পারত একমাত্র কম্যুনিষ্ট নেতা পরিতোষ — যাকে বাঙালীরাই দূর করেছে। এই উক্তির মধ্য দিয়ে বামপন্থী লেখকের কম্যুনিজমের উপর আস্থা যেমন ফুটেছে, তেমনি বাঙালীর আত্মকলহের কথাও গোপন থাকেনি। বস্তুত কম্যুনিষ্টদের লাল ঝাণ্ডাকে মহাপ্রলয়ের আসন্ন সঙ্কেত মনে করে সাহেবরাও ভয় পেয়েছে।

নেপালীদের বাঙালী-আক্রমণ রুখতে গিয়ে ডাঃ তারাপদ বাবু গুরুতরভাবে আহত হলে সাহেব নির্বিকারভাবে শিকারে গেছে। 'কিন্তু সাহেবের কিছু জানবার বাকি ছিল তখনো'[১৭০]—এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকের মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছেন। আর গল্পের শেষে অপ্রত্যাশিত নাটকীয় চমকে রৌদ্ররস আর শাণিত বিদ্রূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সাহেবের ঘরের সবকিছু ভাঙচুর ওলোট-পালোট করে নেপালী নেতা ধনরাজ গুরুং তার দলবল নিয়ে স্ফূর্ত্তি করেছে। আর সাহেবকে দেখে তার চাপা নিষ্ঠুর ঠোঁটে হাসি ফুটেছে– 'ডোন্ট মাইণ্ড স্যার -- ইউ ব্রিটিশ পিপ্‌ল আর ফাইটিং ফর ডেমোক্রেসি'[১৭১] -- চাবুকের চেয়েও বেশি আঘাত করেছে এ বিদ্রূপ। এই বিদ্রূপের আকস্মিক স্পর্ধায় সাহেবের গুলি করতেও হাত ওঠেনি। আর ধনরাজের অট্টহাসি ইংরেজের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তাদের তাড়া করে ফিরেছে।

এই গল্পটি একটি সার্থক রাজনৈতিক গল্প। বিশেষ একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে, বিশেষ একটি রাজনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি রচিত। গল্পটির মধ্যে রাজনৈতিক কূট-কৌশল ও চক্রান্ত একটি বিরাট স্থান জুড়ে আছে। রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আসন্ন ছবিও এতে স্পষ্ট।

গল্পটি সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় গঠনযুক্ত। গল্পটির শেষে নাটকীয় চমক আছে এবং গল্পের অন্তিম মুহূর্তটিই গল্পটিতে চরমক্ষণের সৃষ্টি করেছে। গল্পটির চরিত্রগুলি অতি বাস্তব ও জীবন্ত। তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ গল্পটির ভাষাকে স্থানে স্থানে চাবুকে পরিণত করেছে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন -- 'আমার যদি কোনো দল থাকে—– সে আমার স্বদেশ, আমার যদি কোন রাজনীতি থাকে সে আমার ভারতবর্ষ এবং মানবতা, আমার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে তা এদের জন্যই নিবেদিত।'[১৭২] 'কালনেমি' গল্পটিতে লেখকের এই স্বদেশ প্রেমেরই পরিচয় মেলে। গল্পটির নামকরণও সার্থক। কালনেমি যেমন হনুমানকে মারবার আগেই লঙ্কাভাগ করবার অলীক কল্পনায় মেতেছিল, তেমনি, 'রামায়ণে'র সেই কালনেমির মতোই এ গল্পে সাহেবরা ভারত ভাগ করে ভোগ করবার মিথ্যে স্বপ্ন দেখেছে আগেভাগেই। তাই এই নামকরণ যেমন বিদ্রূপাত্মক, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ।

নিশাচর —

গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতায. যে ব্ল্যাক-আউট চলছিল, সেই বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত। গল্পটিতে কলকাতার একটি ব্ল্যাক-আউট রাতের বর্ণনা পাতা জুড়ে থাকলেও রাত-জাগা আশ্রয়হীন 'নিশাচর' এক স্বদেশীর কথাই মুখ্য। রাতের মহানগরীর বিচিত্র রূপ এ গল্পে নিখুঁত। আর সেই ঘোর অন্ধকার রাতের পটভূমিতে সাম্যবাদী রাজনীতিতে জড়িত স্বদেশী বাঙালীর জীবনের অনিশ্চয়তা বিস্তৃত। মনে রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ-শাসনের যুগে স্বদেশীর শাস্তি ধরা পড়লে কত নির্মম ছিল এবং ইংরেজরা কম্যুনিস্টকে ভয় পেত বলে তাদের শাস্তি আরও কত বেশি ছিল। বড় আদর্শের কাছে এই কম্যুনিস্টদের জীবন উৎসর্গীকৃত। তাই ঘরের নিশ্চিত সুখশয্যা ছেড়ে ব্ল্যাক-আউটের বিপদ-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফেরে বাঙালী যুবক। কখনো মাঠে খোঁড়া উনুনের গর্তে সে আশ্রয় নেয়, কখনো বারবনিতার ঘরে, কখনোবা মড়ার খাটিয়ায়। ভয়-সঙ্কোচ-ঘৃণা কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। হিমেল বাতাসের তীক্ষ্ণতা, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা, ক্ষুধা, অনিদ্রা— কিছুই তার পথরোধ করতে পারেনা। প্রাণের মায়া তার নেই। কিন্তু পুলিশের চোখ

এড়িয়ে সে বাঁচতে চায়। কারণ ইস্তাহারের কাগজ তাকে জনগণের হাতে পৌঁছে দিতেই হবে। সে জানে 'শুধু নিজের জন্যেই আজকে আমার জীবনের মূল্য নয়, বহুর জন্যে— বৃহত্তর পৃথিবীর, সমস্ত জগতের জন্যে।'[১৭৩] এই উক্তি থেকে আমার বুঝতে পারি যুবকটি শুধামাত্র স্বদেশী নয়। পতিতা নারীটি সে স্বদেশী কিনা জানতে চাইলে সে বলেছে 'অনেকটা তাই'।[১৭৪] আসলে সেও স্বদেশীদের মতো দেশকে ভালবাসে ও তার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। কিন্তু এই দেশ শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, পুরো পৃথিবীই তার কাছে যেন স্বদেশ। তাই ধনতন্ত্রের পৃথিবীজোড়া বিকার দেখে সে হাতে তুলে নিয়েছে কম্যুনিস্টের 'রক্ত পতাকা।'

আর সারারাত গল্পের নায়ক নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। সকাল হতেই গল্পটি শেষ হয়েছে। তাই গল্পটির 'নিশাচর' নামকরণ সার্থক। গল্পটি একটি যথার্থ রাজনৈতিক গল্প। কেননা, বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে গল্পটি রচিত। সাম্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এক যুবকের জীবন এক রাত্রির পটভূমিতে গল্পটিতে উদ্ভাসিত। সাম্যবাদী লেখকের বামপন্থী জীবনাদর্শের গল্পটিতে প্রতিফলিত। মাত্র একটি রাতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা, কৃচ্ছ্রতা, আর্দশ-প্রাণতা গল্পটিতে স্পষ্ট। এখানে যুবকটি সমস্ত বামপন্থীদের প্রতিনিধিস্বরূপ। গল্পটির চরিত্র-চিত্রণও বাস্তব। দরিদ্র মানুষ ও পতিতা নারীদের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি স্পষ্ট।

এ বিষয়ে রবিন পাল বলেছেন 'গল্পটিতে বিভিন্ন পরিবেশের বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব ও দরিদ্র মানুষগুলির প্রতি মমত্বই এখানে প্রধানত চোখে পড়ে।'[১৭৫] প্রসঙ্গত, তিনি গোর্কীর সঙ্গে নারায়ণবাবুর তুলনা করেছেন। গল্পটির সংলাপও চরিত্রোপোযোগী। তবে গল্পটির ত্রুটি নির্দেশ করতে রবিনবাবু ভোলেননি– 'নিশাচর নায়ককে কেন হ্যাণ্ডবিল নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে বা তার রাজনৈতিক জীবন ও ভাবনার স্বরূপই বা কেমন সে প্রসঙ্গ তোলার দিকে লেখক দৃষ্টি দেননি।'[১৭৬] আমরা দেখি গল্পটি ঘটনাবিহীন, কিন্তু নাটকীয় এবং ইঙ্গিতগর্ভ। গল্পটি যেন একটি চলচ্চিত্রের মতো— নৈশ অন্ধকারে কলকাতার বুকে এক তরুণ বিপ্লবীর সচল ছবি। গল্পটি পড়ে মনে হয় নারায়ণবাবুর অগ্রজ, গুপ্ত বিপ্লবী শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাব এতে পড়েছে।

তিতির —

১৯০৫ সালে কূটকৌশলী ইংরেজ এবং কিছু তাদের মদতদার মুনাফালোভী ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্তে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। মাতৃভূমির শব-ব্যবচ্ছেদ করে পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের সেই সুস্পষ্ট সীমানায় প্রহরারত দুই সীমান্তরক্ষীর আলাপচারিতার ভঙ্গিতে গল্পটি বিবৃত।

সুখলাল ও জুলফিকার দুই পৃথক দেশের সীমান্তরক্ষী। কিন্তু তাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর নেই। বিভেদের প্রাচীর আছে কেবল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে— তথা শোষক ও শোষিতের মধ্যে। তাই তারা পরস্পরকে 'ভাইয়া' বলে সম্বোধন করে। অতীতের বাল্যস্মৃতি, গ্রামের শান্ত, সুন্দর জীবনের কথা, তিতিরের ডাক— স্বপ্নের মতো মনে করে দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলুষিত স্মৃতি মনে করে তারা শিউরে ওঠে। দাঙ্গায় ভাইয়ের খুন, বোনের ইজ্জৎ খোয়ানোর কথা মনে করে অক্ষম আক্রোশে ওরা ফুঁসে ওঠে। ওরা জানে, এইসব অত্যাচারীদের কিছু হয়না–

'ওরা আরামসে আছে।'

'ওরাই থাকবে।'

'আমার ঘর নিল!'

'আমার ইজ্জত নিল।'

'ওদের জন্য দুসরা কানুন।'

'হ্যাঁ, ওদের কানুন আলাদা।'[১৭৭]

এই কথোপকথনের মধ্যে ঝরে পড়ে বর্তমানের নক্কারজনক রাজনীতির প্রতি ঘৃণা, তিক্ততা, ক্লান্তি, নিরাশা। ওরা জানে এসেমব্লীর নেতারা... 'আদমি মারে।'[১৭৮] আর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এইযে, এ সবকিছু জেনে শুনেও ওরাও মানুষ মারে— গরিব মানুষদের মারে। যারা অভাবের তাড়নায় 'আধাসের সুপারি ইয়া সেরভর কড়ুয়া তেল'[১৭৯] নিয়ে বর্ডার পার হতে যায়, ওরা তাদের সমগোত্রীয় হয়েও— বুকে ব্যথা টনটন করলেও গুলি মারে।

কারণ – 'নোকরি।'[১৮০]

ওরা জানে এই সীমান্তে অনেক সাপ আছে, তার বিষ উগরে দেয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তবু ওরা স্বপ্ন দেখে 'ঝুমঝুমিয়ায় আবার

কি বান ডাকবে কখনো? কোন নতুন বান?[১৮১]

এইভাবে আশাবাদী লেখক রাজনৈতিক বিপ্লবের আভাস দিয়ে গল্পটির সমাপ্তি টেনেছেন। গল্পটিতে চরমক্ষণ এসেছে গোখরোর ফণা তোলা এবং জুলফিকারের রাইফেলের কুদোর আঘাতে তার মৃত্যুবরণের মধ্যে। ঘটনাটি সাঙ্কেতিক। রাজনীতির পাকে পাকে যে বিষ তা সুখদেওদের মতো মানুষদের দংশন করে শেষ করে দিতে চাইছে। কিন্তু এই সর্বহারাদের হাতে হয়তো এমনি করেই এর অবসান হবে। গল্পটির নামকরণও সাঙ্কেতিক। 'তিতির' পাখি এখানে দুটি চরিত্রের অতীত সুখ-স্বপ্নের শান্ত সুন্দর জীবনের প্রতীক। গল্পটির ভাষা নাটকীয়, বিশেষত সংলাপ-প্রধান। গল্পটিতে ঘটনা বরং তেমনকিছু নেই। তাই বাঁধন একটু আলগা। কিন্তু যেভাবে দুই সীমান্তরক্ষীর কথোপকথনের মাধ্যমে বর্তমানের জটিল ক্রুর রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ও সাধারণ মানুষের বেদনা উৎসারিত হয়েছে, তা অবশ্য প্রশংসনীয়। রাজনৈতিক গল্প হিসেবে তাই এটি সার্থক।

ইতিহাস —

'ইতিহাস' গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাত গল্প। ১৩৫০ সালে 'এই গল্পটি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের জন্য ঘোষিত এক হাজার টাকার এক প্রতিযোগিতায় বিপুল ভোটাধিক্যে প্রথম স্থান লাভ করে।'[১৮২] 'মৌচাক' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা গল্পটি পড়ে তাঁদের ভোট পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং গল্পটির জনপ্রিয়তাও প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। তাছাড়া 'শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রদেব এবং শ্রদ্ধেয়া রাধারানীদেবী গল্পটি হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে এটি যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পাবে তা তাঁরা আগেই ধরে নিয়েছিলেন।'[১৮৩]

গল্পটি ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। দেশে সে সময় এক সংকটজনক পরিস্থিতি। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত, ১৯৪১ সালে কলকাতায় জাপানী বোমার আক্রমণের আশঙ্কায় জনহীন নীরবতা, ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লব এবং মেদিনীপুরে বন্যা, ১৯৪৩ সালে মন্বন্তর এবং ১৯৪৩-১৯৪৪ সাল অবধি কলকাতার বুকে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর লগ্নের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস গল্পটি লেখা হয়েছে। গল্পটির স্থানিক পটভূমি হল মেদিনপুর। ৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুরের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, তমলুক মহকুমার মাতঙ্গিনী হাজরা, সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই আন্দোলনের সূত্রে ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। ইতিহাস গল্পের প্রেক্ষাপটে আছে মেদিনীপুরের সেই তমলুক। আর ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে যে বন্যা হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে। ধ্রুব-গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'নারায়ণবাবু তমলুকের এই বন্যার বিধ্বংসী কলোরলের মধ্যে ভেসে ওঠার স্বপ্ন দেখেছেন লুপ্তপ্রায় তাম্রলিপ্ত বন্দরকে নিয়ে'.......[১৮৪] 'তাম্রলিপ্তের সমুদ্র মারাগাঙ কি আজ উতরোল হয়ে উঠল?'[১৮৫]

বিপদে মানুষ শত্রুতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়; ইতিহাসে এ বহু পরীক্ষিত সত্য। ইতিহাসের সেই রাখীবন্ধনের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা গেছে এই বন্যার পটভূমিতে। ইতিহাস-পূজারী অমরেশের একমাত্র বিপ্লবী পুত্রের ঘাতক দারোগাকে ও তার বিপন্ন পরিবারকে অমরেশ ও তাঁর কন্যা বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছেন। অমরেশ স্বপ্ন দেখেছেন 'চরম সর্বনাশের পটভূমিতে; চরম দুর্যোগের পরম লগ্নে সমস্ত জাতি আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীতে। যাহারা পরস্পরের বুকে আঘাত হানিতেছে মোহে অন্ধ হইয়া, স্বার্থে আত্মবিস্মৃত হইয়া— সেদিন সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাতে হইতে নিজেদের বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের হাতে হাতে রাখী বাঁধিতে হইবে। দেশে দেশে ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা।'[১৮৬] এইভাবে বন্যার সুতীব্র জল-কল্লোলের মধ্যে রাখী বন্ধনের মন্ত্রোচ্চারণ হয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে। গল্পটির শেষাংশে, দেশ ও জাতির চরম সঙ্কটের মুহূর্তে ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ অমরেশ ইতিহাসের থেকে যে রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তা সর্বকালে গ্রহণীয়।

স্থিতধী অমরেশের কাছে পুত্র স্নেহের চেয়ে ইতিহাসের রাজনৈতিক আদর্শ অনেক বেশি বড়। তাই বিপ্লবের বিপদ-সঙ্কুল পথে তিনি পুত্রকে যেতে নিষেধ করেননা, এবং মৃত পুত্র লোকেশকে তিনি খুঁজে পান সুদূর ইতিহাসের পৌণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ত, বিক্রমপুরের সেনাদলের মধ্যে। বহু বিপ্লবীর চোখের আগুনে মৃত পুত্রকে প্রত্যক্ষ করে তিনি অনুভব করেন লোকেশ আজ অক্ষয়, অভয় জগতের মৃত্যুহীন অভিযাত্রী।

অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক অমরেশ জানেন, রাজনীতি সর্বদা সঠিক পথ ধরে চলেনা। তাতে ভুল হয় বারবার, বারবার ঘটে পরাজয়। ইতিহাসে এমন ঘটেছে বহুবার, কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়— ''বারে বারে এমনি অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা পদচিহ্ন এঁকে যাই— আমাদের রক্তাক্ত পদলেখা জ্বলজ্বল করে জালিয়ানওয়ালায়, সেবাগ্রামে, কর্ণফুলীর তীরে, বুড়ী-বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরের রাঙা মাটিতে। ভাবীকালের পথনির্দেশ সেই রক্তলিপিতে।'[১৮৭]

'ইতিহাস'গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে ধ্রুবগোপাল মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন 'এর বিষয়বস্তু ও গঠনকৌশলে বাংলার আলোকোজ্জ্বল, শ্লাঘনীয় প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন ঝঞ্ঝাপীড়িত সংগ্রাম-উদ্বেল ইতিহাসকে এক রমণীয় শিল্প-কৌশলে বিশেষ জীবনের আলেখ্য নয়, এক কালের গেঁথে দেওয়া হয়েছে।'[১৮৮] এবং সেই কারণে, 'ইতিহাস' গল্পটি বিশেষ কালের

আধারে ধরে রাখা সংগ্রাম-উদ্বুদ্ধ মানবতার নিত্যকালের বন্দনাগান।'[১৮৯] বাস্তবিক, 'ইতিহাস' গল্পের গঠন-কৌশলে নারায়ণবাবুর মুন্সীয়ানা লক্ষ্য করবার মতো। 'ইতিহাস' চর্চায় নিরত অমরেশ যখন প্রাচীন বাংলার গৌরবময় যুগের পূর্বের দুর্যোগময় যুগ বর্ণনা করেছেন, তখনই সমকালীন বাংলাদেশের অস্থির সঙ্কটাকুল সমাজ তার সমান্তরালভাবে এসে পড়েছে। 'অতীত ও সমকালকে সুকৌশলে এমন মিশিয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতিবান গল্পকার ছাড়া সম্ভব নয়।'[১৯০]

গল্পটির মধ্যে লেখকের ইতিহাস-চেতনা রাজনৈতিক আদর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় এই রাজনৈতিক চেতনা 'সূর্যকিরণদৃপ্ত হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল ও উর্ধ্বালোকাচারী।'[১৯১]

'ইতিহাস' গল্পটির ভাষা প্রতীকী ব্যাঞ্জনা মণ্ডিত। 'অসাধারণ লিপিকুশলতা 'ইতিহাস' গল্পের কিছু জায়গায় নান্দনিক চিত্রকল্পরূপ নির্মাণ করেছে'[১৯২] বলে ধ্রুবগোপালবাবু দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত এ গল্পে প্রণতির চা বানাবার বর্ণনায় যে চমৎকারিত্ব ও সূক্ষ্মধর্মিতা আছে, তার উল্লেখ করা যায়। বাইরের প্রলয়তাড়িত, প্রভঞ্জনক্ষুব্ধ, সমাজ ও রাজনীতির পরিবেশ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে স্টোভের 'শোঁ-শোঁ' শব্দে। এই প্রতীকী ব্যাঞ্জনা সার্থকতম শিল্পরূপ লাভ করেছে প্রণতির 'দেবদূতের মৃত্যু' ছবিটি আঁকার মধ্যে দিয়ে।

গল্পটিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন স্পষ্ট। গণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও সাম্যবাদী বিপ্লবের পূজারী লেখকের রাজনৈতিক আদর্শ এই গল্পে ইতিহাসের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। লেখকের ইতিহাস-চেতনা ও আদর্শ-প্রাণতার প্রমাণ মেলে তাঁরই 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন-'ইতিহাসই নির্ধারণ করুক ভবিষ্যতের ছোটগল্প কোন লক্ষ্যকে বেছে নেবে। মনের জগৎকে সে তন্ন তন্ন করেই সন্ধান করুক— কিন্তু সামাজিক দায়িত্বও কি তার থাকবে না?'[১৯৩] তাঁর 'সাহিত্য ও আদর্শ' প্রবন্ধে নারায়ণবাবু স্পষ্টই বলেছেন 'সাহিত্য জাতীয়ই হোক, আর আন্তর্জাতিকই হোক, এই যুগ-সন্ধির লগ্নে তাকে আদর্শবাদী হতেই হবে, না হয়ে উপায় নেই।'[১৯৪] এই রাজনৈতিক আদর্শেরই বিকাশ ঘটেছে 'ইতিহাস' গল্পে।

পরিশেষে এই গল্পটি সম্বন্ধে জগদীশ ভট্টাচার্যের মূল্যবান অভিমতটি উদ্ধৃত করছি '...পতন-অভ্যুদয় পন্থায় ইতিহাস তার নিজের কাহিনী রচনা করে চলেছে; অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ। সেই চিরন্তন যাত্রা-পথে এক একটি ঘটনা এক একটি পদচিহ্নের মত। .... ভাবীকালের পথ-নির্দেশ সেই রক্তলিপিতে। সে রক্তলিপি রচনা করে চলেছেন ঐতিহাসিক অমরেশ। দেশজননীর পূজায় ঋত্বিক পুরোহিতের মত তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে মাতৃমন্ত্র। ইতিহাসের মহৎ প্রেরণা অপরাহ্নের উৎসাহের আনন্দরস হয়ে ক্ষরিত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠে। নিজের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে তিনি মাতৃপুজার পূর্ণাহুতি দিয়েছেন বলেই তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃবন্দনা মন্ত্র হয়ে উঠেছে।'[১৯৫]

আদর্শাত্মক —

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' নামক বইয়ে ছোটগল্পের বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে রাজনৈতিক গল্পকে ও আদর্শাত্মক গল্পকে একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন। কিন্তু এখানে রাজনৈতিক ও আদর্শাত্মক গল্পের পৃথক শ্রেণীবিভাগ করে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হল। কেননা, রাজনৈতিক গল্পে আদর্শ থাকে ঠিকই, তবে তা রাজনৈতিক আদর্শ এবং আদর্শাত্মক গল্পের বিশুদ্ধ আর্শবাদিতার সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্রব নাও থাকতে পারে। আদর্শাত্মক গল্পগুলিতে অবশ্যই আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকে। কখনো আদর্শবাদী মানুষকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখিয়ে আদর্শবাদিতার প্রতিষ্ঠা হয়। কখনো বা আদর্শহীনতা দেখে ব্যথিত লেখক তাঁর সেই অন্তর্বেদনাকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে আদর্শবাদিতার প্রতিষ্ঠা করেন— বিবেককে জাগিয়ে তোলেন। আদর্শের পূজারী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন- 'পরিচয় থেকে অপরিচয়ের পরপারে, পুঞ্জিত মিথ্যার অন্ধকার থেকে আলোকের কিরণোজ্জ্বল মুক্ত প্রকাশে এবং বর্ণাশ্রম থেকে বিংশ শতাব্দীর অভিমুখে চলেছে আদর্শবাদী মানুষের শোভাযাত্রা, আর সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের জয়শঙ্খ নির্ঘোষ যুগ-যুগান্তে মুখর হয়ে উঠেছে।[১৯৬] নারায়ণবাবু এইজাতীয় কিছু গল্প লিখেছেন। এইসব গল্পে তাঁর আদর্শপ্রিয়তা, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আদর্শহীনতার জন্য ঘৃণা থেকে বেদনা অনেক বেশি। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আদর্শের গুরুভার কখনো তাঁর গল্পগুলিকে পিষ্ট করেনি, বরং পুষ্ট করেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু আদর্শাত্মক গল্পের মধ্যে হেমিংওয়ের 'The old man and the sea' এবং গোর্কীর 'The Birth of a man' উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা আছে। যেমন - 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি। আর কল্লোলীয়রা বা সেই যুগের অধিকাংশ লেখকই এই আদর্শহীনতাকে ঘৃণা করেছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় তাই একধরনের নিষ্ঠুর পাশবিকতা ভর করেছে (যেমন 'সরীসৃপ' 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি গল্প)। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই যুগের হয়েও এর ব্যতিক্রম।

আমরা অতঃপর গল্প ধরে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

ভাঙ্গা চশমা —

'এটি একটি ভগ্নস্বপ্ন আদর্শচ্যুত স্কুল-মাস্টারের আত্মধিক্কারের কাহিনী।'[১৯৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কন্ট্রোল আর কালোবাজারির যুগে এই দরিদ্র স্কুলমাস্টার মাস্টারি ছেড়ে হয়েছেন সাব-ডেপুটি গ্রেডের হাকিম। রূপকথার আবু হোসেনের মতো ক্ষণস্থায়ী এ চোখ ধাঁধাঁনো ক্ষমতা ও মর্যাদা তাঁকে করেছে ব্রতচ্যুত। ক্ষমতার লোভ, অর্থলোভ, পদমর্যাদার মোহে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিদের সেলাম ও হ্যাটের ঔদ্ধত্যে প্রভুত্বের আস্বাদ 'নতুন রক্তখাওয়া বাঘের মতো'[১৯৮] তাঁর চেতনায় মত্ততা জাগিয়ে তুলেছে। শিক্ষকতার গৌরবকে বিস্মৃত হয়ে তিনি লোক-দেখানো বিলাসিতায় গর্ব অনুভব করেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর বিবেক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ছিন্নবস্ত্রা রমণীর উপর কর্মচারীর লোলুপ দৃষ্টি তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। মনে হয়েছে 'মানুষের চরম দুর্গতির সুযোগ কি আমরা সবাই নিচ্ছিনা? ষাট টাকা মাইনের স্কুলমাষ্টার থেকে হাকিমীর এই রাজতক্ত— মাঝখানের পথটা কিসে তৈরী?'[১৯৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজাত কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পর রিলিফের সরকারী ব্যবস্থা দেখে তাঁর মনে হয়েছে 'শ্মশানের ওপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করে কী লাভ।'[২০০] তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুভব করেছেন অনাহারে মায়ের বুকে শিশুর দল কিভাবে মৃত্যু বরণ করেছে 'ভাবী স্বাধীন ভারতের মানবকের দল।'[২০১] জটিল ও নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদের— পুঁজিবাদের কূট চক্রান্ত দেখে তাঁর নিজেকে 'প্রহসনের বিদূষক'[২০২] বলে মনে হয়েছে। তবু তিনি হাকিমির মোহ ছাড়তে পারেননি। আর তাঁর এইরকম মানসিক দ্বন্দ্বের সময়ে আবির্ভাব ঘটেছে এক ব্রতনিষ্ঠ আদর্শ পাগল স্কুলমাষ্টারের। সমাজে 'পাগল' আখ্যায়িত এই দরিদ্র স্কুলমাস্টার সারাজীবন ধরে তাঁর রক্ত দিয়ে— সাধনা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন স্কুল। তাঁর সেই একমাত্র আশা ও স্বপ্ন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে গেছে। ভাঙ্গা স্কুল, ছাত্র নেই – তবু পাগলের মতো পড়িয়ে চলেছেন তিনি পরম নিষ্ঠায়। পরম মমতায় আঁকড়ে আছেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া বিদ্যালয়কে। আর হাকিম চোরের মতন পালিয়ে এসেছেন সেই পবিত্র বিদ্যার তীর্থ থেকে। মাষ্টারের আদর্শোজ্জ্বল মূর্ত্তির পাশে নিজের কলঙ্কের কালিমাখা চেহারা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছে ' বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই— আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সবকিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।'[২০৩] এইভাবে এই গল্পে আদর্শচ্যুত মাস্টার তাঁর আদর্শহীনতার জন্য নিজেই লজ্জায়, ধিক্কারে, অনুশোচনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। আর পাঠককে আদর্শের মহানতা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। তাই গল্পটি একটি সার্থক আদর্শাত্মক গল্প। বিশেষত পাগল স্কুল মাস্টারের চরিত্রটি আমাদের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। স্কুল মাস্টারের জাতি গঠনের ক্ষেত্রে কতখানি ভূমিকা তা আমরা অনুভব করি। শিক্ষকের ত্যাগ, নিষ্ঠা, আদর্শ দেখে ভক্তিতে মাথা নত হয়।

গল্পটিতে নীতি থাকলেও ঢাক বাজিয়ে তার প্রচার নেই। অর্থাৎ গল্পটি আদৌ হিতোপদেশমূলক গল্প নয়। মানবতার আদর্শই এই গল্পের প্রাণ। আদর্শচ্যুত মানবের বিবেক-দংশন এ গল্পে প্রবল। আর আদর্শনিষ্ঠ মানবের করুণ পরিণতি এ গল্পে এক সম্ভ্রম-মিশ্রিত বেদনার উদ্রেক করেছে। বিশেষত আদর্শনিষ্ঠ মাষ্টারের পাশে আদর্শভ্রষ্ট হাকিমের কালিমা স্পষ্টতর হয়েছে। গল্পটিতে অবান্তর প্রসঙ্গ নেই, অতিকথন নেই। ভাষা ভাবোপযোগী। লেখক একদা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে গল্পটি উজ্জ্বল। গল্পের ক্লাইম্যাক্স এসেছে গল্পের শেষ মুহূর্ত্তে আদর্শনিষ্ঠ স্কুল মাষ্টারকে দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় হাকিমের পলায়নে। গল্পটির নামকরণ তাৎপর্যময়। 'ভাঙ্গাচশমা' এখানে মন্বন্তরে ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন ও আদর্শের প্রতীক। এ গল্পে লেখক নির্মম স্যাটায়ারিস্ট। মানস মজুমদারের ভাষায় ' যে মুষ্টিমেয় মানুষের চক্রান্ত-কৌশলে এই মন্বন্তরের সৃষ্টি, সেই মানুষগুলির বিরুদ্ধে আমরাতো সংঘবদ্ধ হতে পারিনি। ... এই নপুংসকতার বিরুদ্ধেই লেখকের ঘৃণা ও ক্রোধ।'[২০৪]

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, ব্রতচ্যুত শিক্ষকের প্রতি লেখকের সহানুভূতি আন্তরিক। তাই স্কুলমাস্টারের জবানীতে তিনি বলেছেন - 'স্কুলমাস্টার আমরা— ভাবীযুগের দেশনেতা, সমাজনেতা বুনো রামনাথের মতো তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়েই অবশ্য আমাদের মতো জ্ঞানতপস্বী আচার্যের খুশি হয়ে থাকা উচিত। কিন্তু দেখলাম কিছুতেই মানসিক প্রশান্তির ঐ স্তরটাতে নামা যাচ্ছেনা।'[২০৫] লেখকের এই ধারালো বিদ্রূপ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই 'একটি স্কুলের ছবি' শীর্ষক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি সরাসরি বলেছেন 'শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে নীতি সুধা বর্ষণের আর বিরাম নেই।' তাঁদের কর্তব্যবোধ ও আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করেন সবাই— সরকার, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক, দেশের চিন্তাশীলেরা— কে নয়?'[২০৬] অথচ— অবশেষে তিনি প্রশ্ন করেছেন 'চোরাবালির ওপর প্রাসাদমালা গড়তে চাইছি আমরা। টিকবে শেষ পর্যন্ত?'[২০৭]

সঞ্চার —

এটি একটি অসাধারণ গল্প। মনুষ্যত্বহীন; জোচ্চোর মানব চক্রবর্তী কিভাবে তার ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ভালমানুষ স্ত্রী শঙ্করীর সংস্পর্শে এসে হৃদয়বান মানুষে পরিণত হয়েছে এ তারই কাহিনী।

গল্পের শুরুতে মনে হয় মানব চক্রবর্ত্তীর 'মানব' নামটাই একটা প্রহসন। তিন-তিনটি বউকে সে পুরোনো জুতোর মতো ত্যাগ করেছে, তার নামে চারটে কেস ঝুলছে, এহেন মানব চক্রবর্তী, যে ফোর্ট উইলিয়ামে, নেভিতে, দমদম গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চাকরিতে ঢোকাবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোককে পথে বসায় তার মনও নরম হয়ে এসেছে তার চতুর্থা স্ত্রী শঙ্করীর সান্নিধ্যে এসে। সে অবাক হয়ে ভেবেছে 'নাকে ফুলপরা একটা গোলগাল কালো মেয়ে মা হতে গিয়ে যাকে আরো কুৎসিত দেখাচ্ছে ... তার জন্যে কোমল হয়ে উঠছে তার মন?'[২০৮]

আসলে শঙ্করী এক আশ্চর্য নারী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সে তার বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছে। আর এই অমানবিক নিষ্ঠুরতা তাকে যেন মূক করে দিয়েছে। তাই এই মর্মান্তিক আঘাতের পর আর কোনকিছুই তাকে বিচলিত করেনা। আসলে ভাগ্যের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেও সে ভুলে গেছে।

শঙ্করীর এই নীরব সহনশীলতা মানবের বুকে বরফের মতন চেপে বসে। সুদর্শন, সুসজ্জিত মানবের দিকে শঙ্করী মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকলে তার মনে হয় 'এই পোশাকে যেমন তাকে ঝকঝকে তকতকে একটি সহজ মানুষের মতো দেখায়, তেমনি হওয়া কি খুব অসম্ভব তার পক্ষে? শঙ্করী যা চায়, তা কি কোনমতেই হওয়া যায়না? যে পথ দিয়ে চলেছে এ পথ ছাড়া অন্য পথ কি কোথাও নেই?'[২০৯]

এভাবে শঙ্করীর প্রভাব ধীরে ধীরে মানবের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আর তার হাত এড়াতে মানব শঙ্করীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। তবু মানবের মনে ক্রমশ স্নেহ-মমতা-দয়া-মায়া আদর্শবাদ স্থান করে নেয়। নিরীহ আদর্শবান শিক্ষক করুণাময়-বাবুকে সুকৌশলে চমৎকার অভিনয় করে কথার পর কথা সাজিয়ে, তাঁর আত্মাভিমানে ঘা দিয়ে তাঁকে ফাঁদে ফেলবার আয়োজন সম্পূর্ণ করেও তাই থমকে দাঁড়ায় মানব চক্রবর্ত্তী। বিদেশী ট্যুশানির মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে ভালমানুষ মাস্টারের কলম, টাকা হাতিয়েও চশমা ভাঙার ফলে দৃষ্টিহীন মাস্টারকে ফেলে সে পালাতে পারে না। বরং তাঁর টাকা, কলম ফিরিয়ে দেয়, ট্যাক্সি ভাড়াও দিয়ে দেয়। আর সিদ্ধান্ত নেয় এই জুয়াচুরির পথ ছেড়ে স্টেশনে লজেন্স ফেরি করার।

এইভাবে মানবের ক্রমশ বদলে যাবার বিশ্বাসযোগ্য ধারাবাহিক ছবি লেখক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে মেলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আর এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষক করুণাময়বাবুর যে চরিত্রটি এঁকেছেন, তা হুবহু বাস্তব থেকে তোলা একটি আদর্শ স্কুল-শিক্ষকের চরিত্র। সম্ভবত শিক্ষকতায় রত থাকার ফলেই নারায়ণবাবু এমন জীবন্ত একটি চরিত্র সৃষ্টি করে পাঠকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পেরেছেন।

স্কুল-মাস্টার সম্পর্কে মানবের ধারণা থেকেই এ ধরনের চরিত্রের রূপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবের মতে, ঠকাবার জন্য স্কুল-মাস্টাররা আদর্শ। কেননা, 'বুড়ো বয়সেও একশো টাকা মাইনের চাকরি করতে করতে যারা রাস্তার ভিখিরিকে পয়সা দেয় আর তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলের মুখে সিগারেট জ্বলন্ত দেখলে এখনো যাদের ভুরু কুঁচকে ওঠে, তারা আজও নিরাপদ।'[২১০] বস্তুত এইটুকু কথার থেকেই আদর্শবান স্কুল টীচারদের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

করুণা ময়রা রাতারাতি বড়লোক হতে চাননা। ফাঁকি দিয়ে সুবিধে নিতে এঁদের বিবেকে বাধে। তাই বিদেশী ট্যুশনি পাবার সম্ভাবনায় কষ্টের সামান্য রোজগার থেকে দামী বই কিনে এনে লাল দাগ দিয়ে দেগে দেগে পড়েন। কৃতী ছাত্রকে গড়ে তোলার জন্য গর্ব অনুভব করেন। আর হারানো সন্তানের জায়গায় ছাত্রকে বুকে টেনে নিতে একটুও ইতস্তত করেননা। সরল-বিশ্বাসী, আদর্শবাদী, ও নিরীহ এই শিক্ষকটি পরম নিশ্চিন্তে ঠগ মানবের পাতা ফাঁদের দিকে যত এগিয়ে যান, পাঠকের সহানুভূতি-তত প্রবল হয়। অবশ্য শেষ অবধি মানবও তাঁকে ঠকাতে পারেনা। তবু এই ব্যাপারটা গল্পের শেষে মোটেও অতি-নাটকীয় লাগে না। কারণ, গল্পের শুরু থেকে প্রতিটি ছত্রে এরই প্রস্তুতি ছিল। মানবের এ পরিবর্তন একদিনে হয়নি, ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতরে তা হয়ে চলেছিল। তাই বলবো এ গল্পটি কেবল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। কেবল গল্পের গঠনগত দিক থেকেই নয়, ভাবের একমুখী ক্রম-সঞ্চারে গল্পটির নামকরণও সার্থক।

গিল্‌টি —

এই গল্পে হিমাংশু ঘোষালের স্ত্রী গৌরীর গিল্‌টি প্রেম কিভাবে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হল, তারই কথা আছে।

বাড়ি ও জমির দালাল হিমাংশুর অভাবের সংসার। নিজে সে কুশ্রী। কিন্তু তার স্ত্রী গৌরীর অসাধারণ রূপ দেখে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। আর এমন সুন্দর বউকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে রাখতে না পারায় তার আফশোস্ হয়। নিজের রূপ সম্বন্ধে গৌরীও অতিমাত্রায় সচেতন। হিমাংশুর কুশ্রী চেহারাকে, লালসাকে, তার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে গৌরী। হিমাংশুর হাতের আঙুলকে তার মাকড়শার ক্লেদাক্ত পায়ের মতো মনে হয়। আর নিজের শুভ্র হাত দিয়ে নিজেরই গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। চাঁদের আলোয় নিজের নিরাভরণ হাত ও নিরাভরণ শুভ্র দীর্ঘ গ্রীবাকে সে অনুভব করে পরম করুণায়। গয়নার কথা তুলে তার নারী-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে হিমাংশু।

তাদের বাড়ির ছাদের থেকে মল্লিকবাড়ি দেখা যায়। সেখানে একটি লোক সিগারেট ধরায়। সেই সিগারেটের 'আলোর বিন্দু ছড়ানো এই অন্ধকার একটা বিরাট জালের'[২১১] মতো করে জড়িয়ে ধরে গৌরীকে। কামনায় তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে আসে, দম আটকে আসে। চঞ্চল পায়ে শ্যাওলা-ধরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে তার মনে হয় যেকোনো সময় তার পা পিছলে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত তার পা পিছলেও যায়।

বাড়ি ফিরে হিমাংশু দেখে 'গৌরীর শঙ্খগ্রীবায় কী যেন ঝিকমিক করে জ্বলছে, চাঁদমালার মতো'[২১২] ... হিমাংশু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে 'হার পেলি কোথায়?'[২১৩] মুহূর্তের জন্য গৌরী যেন নিশ্চুপ পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয় কোন কদর্য কামনার পথে হারটা এসেছে ভেবে। তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়— 'ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি পাঁচ সিকে দিয়ে।''[২১৪] কথাটুকু বলতে গিয়ে গৌরী তার দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারেনা। বোঝা যায় লোভে পড়ে কামনার পঙ্কিলতায় অবগাহন করে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করছে।

হিমাংশু কিন্তু সরল বিশ্বাসে হারটা স্পর্শ করে। অপরাধিনী গৌরীর ভয় হয় হিমাংশু তার অপরাধ টের পেয়েছে। এখুনি হয়তো তার আঙ্গুলগুলো 'গলার নরম মাংসের মধ্যে সাঁড়াশির মতো চেপে বসবে।'[২১৫] হিমাংশু অবশ্য সগর্বে জানায় যে, হারটা খাঁটি সোনার যে নয়, তা সে টের পেয়েছে। তাই শুনে গৌরী অস্ফুট স্বরে শুধু প্রশ্ন করে 'খাঁটি সোনা বুঝি তুমি হাত দিয়ে দেখলেই টের পাও?'[২১৬] এই প্রশ্নের মধ্যে গৌরীর হৃদয়ের তিক্ততা মিশে থাকে। গৌরী যে খাঁটি সোনা নয়, তাতো হিমাংশু টের পায়নি!

রাতে গৌরীর গলায় গিল্‌টির হার দেখে হিমাংশুর মন বেদনায়— মমতায় ভরে ওঠে। সে ভাবে ' ও শুধু গৌরীর আত্মবঞ্চনাই নয়, ওর মধ্যে কেবল গৌরীর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার বেদনাই মিশে নেই। ও হিমাংশুরও চরম লজ্জা, তার অক্ষম পৌরুষের অবনামনা।'[২১৭] ঐ গিল্‌টির হার যেন মুহূর্তে তার মনের ভিতরে একটা সাপের ঝাঁপির ঢাকনা খুলে দেয়। অন্যায় পথে টাকা রোজগার করে গৌরীকে গয়নায় সাজাবার স্বপ্ন দেখে সে। কিন্তু হিমাংশু ওস্তাদ সাপুড়ে নয়, ছোবল তার নিজের হাতেই পড়ে।

লোক ঠকিয়ে একশ টাকা রোজগার করে রেসে সর্বস্বান্ত হয়ে সে বাড়ির পথ ধরে। আর প্রবঞ্চিত মানুষেরা তার উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরে। গল্পের এই চরমক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে গৌরী তার হারছড়া খুলে দিয়ে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। আদর্শচ্যুতা, নীতিহীনা স্ত্রী গৌরী আদর্শ স্ত্রীর মতোই স্বামীর জীবন রক্ষা করে। আর হিমাংশু যখন গিল্‌টি হারের স্বরূপ জেনে আক্রমণকারীরা ফিরে আসবে বলে ভয় পায়, তখন গৌরী তাকে বুক দিয়ে আগলে বলে '....তোমার ভয় নেই, আমি আছি।'[২১৮] গৌরীর পতি-প্রেম দেখে হিমাংশু ছেলেমানুষের মতন কেঁদে ওঠে 'তুই আমাকে এত ভালবাসিস গৌরী, আমি তোকে কিছুই দিতে পারলুম না, কিছুই না।'[২১৯] স্বামীর এই সহজ বিশ্বাস ও আন্তরিক ক্ষোভ গৌরীর বুকে যেন ছুরি বসায়। তীব্র অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে গৌরী ভেঙ্গে পড়ে— 'হারটা গিল্‌টির নয়। কিন্তু যে ভালোবাসার ভিতরে নিজেকে অসহায় শিশুর মতো ছেড়ে দিয়ে হিমাংশু এমন করে কাঁদছে, তার গিল্‌টি করা নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে'[২২০] গৌরীর চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

'সঞ্চার' গল্পে স্ত্রীর ভালবাসা স্বামীকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করেছিল। আর এ গল্পে স্বামীর ভালবাসা-বিশ্বাস-নির্ভরতা স্ত্রীকে অনুশোচনায় দগ্ধ করেছে। এই ভাবে লেখক ভালবাসার মধ্য দিয়ে মহৎ আদর্শের স্থাপন করেছেন গল্পগুলিতে। গল্পের চরিত্রগুলি বাস্তব। গৌরীর আত্মরূপ-মুগ্ধতা রবি ঠাকুরের 'কঙ্কাল' গল্পের রূপসী বিধবা রমণীর কথা মনে করায়। গল্পটিতে অহেতুক বর্ণনা নেই, বরং ইঙ্গিতগর্ভ বাক্য-বিন্যাস গল্পটিতে ধার এনে দিয়েছে। আর স্ত্রীর গিল্‌টি করা নকল ভালবাসার নিষ্ঠুরতাই গল্পটির নামকরণে সার্থকতা এনেছে।

দাম —

লক্ষ কোটি মণি-মানিক্য দিয়েও যার দাম হয়না, সেই দামের অতীত, অমূল্য স্নেহ-ভালবাসাকে অমর্যাদা করে তাকে মাত্র দশ টাকায় বিক্রি করবার শোচনীয় লজ্জা ও বেদনা এই গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বর্তমানে বাংলার অধ্যাপক ও ছোটখাটো লেখক সুকুমারবাবু তাঁর ছেলেবেলার গল্প লিখতে গিয়ে তাঁর বাল্যের অঙ্কের বাঘা মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতিতে কল্পনার খাদ মিশিয়েছিলেন। সদুপদেশ দিয়ে গল্পের মূল কথাটা এই বলেছিলেন যে - 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধাটাই পঞ্চত্ব পায়'[২২১] এবং তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তিনি নিজে। গল্পটি লিখে সুকুমারবাবু পত্রিকার পক্ষ থেকে দশ টাকা পেয়েছিলেন ; এবং এইটুকুকেই মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে 'নগদ লাভ'[২২২] মনে করেছিলেন। বর্তমানের জোরালো দাবির চাপে লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতে বসে তিনি যে লাভ-ক্ষতির অতীত এক অমূল্য সম্পদকে হারাতে বসেছিলেন, তা বুঝতে পারেননি।

বস্তুত পক্ষে ছেলেবেলায় অঙ্কের মাস্টারমশাই তাঁর কাছে ছিলেন জীবন্ত এক বিভীষিকা। মাস্টারমশাইয়ের প্রচণ্ড চড়-চাপড় আর হুংকার ছাড়া তাঁর আর কিছুই মনে ছিলনা। বাইরের বজ্র-কঠিনতার আড়ালে মাস্টারমশাইয়ের যে স্নেহ-কোমল, শ্যামল স্নিগ্ধ মেঘের মতো মনটি লুকিয়েছিল; তা তাঁর চোখেই পড়েনি। কতখানি ভালবাসলে যে অমন করে শাসন করা যায়, সে বোধ কখনো তাঁকে আলোড়িত করেনি। বরং মাস্টারমশাইয়ের শাসনের বিভীষিকা তাঁকে স্বপ্নের মধ্যেও তাড়া করে ফিরেছে। আর এই বিভীষিকারই ফলশ্রুতি হয়েছে ঐ গল্পটি।

গল্পটি লেখার সময়ে সুকুমারবাবু একবারও ভালবেসে তাঁর বাল্যের মাস্টারমশাইকে বুঝবার চেষ্টা করেননি। বরং ব্রতচ্যুত, আদর্শভ্রষ্ট, অকৃতজ্ঞ শিষ্যের মতো নিজের সামান্য রচনা-প্রতিভার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অনায়াসে সেই পরম শ্রদ্ধার্হ মাস্টার-মশাইকে, তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভকামনাকে অপমান করেছেন।

সুকুমারবাবুর এই ভুল ভেঙ্গেছে মফঃস্বলে একটি কলেজের বার্ষিক উৎসবে গিয়ে। সুকুমারবাবু এখানে অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা ব্যক্তিদের প্রতিভূ, যাঁদের লোক দেখানো জাঁক-জমকই বেশি। প্রবাদই আছে 'ফাঁকা কলসী বাজে বেশি'। তাই এই উৎসবেও সুকুমারবাবু যথারীতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্ধৃতির গোঁজামিল দিয়ে তাঁর সেই 'সর্বার্থ সাধক'[২২৩] বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, যা তিনি 'রবীন্দ্র জন্মোৎসব থেকে বন মহোৎসব পর্যন্ত'[২২৪] এদিক-ওদিক করে চালিয়ে দেন ও গর্ব অনুভব করেন। এখানে এধরনের বক্তাদের প্রতি লেখকের বিদ্রূপ স্পষ্ট। যাইহোক, এহেন মিথ্যা আত্মপ্রসাদ তথা আত্মবঞ্চনার সময় নাটকীয়ভাবে সুকুমারের মাস্টারমশাইয়ের আবির্ভাব ঘটেছে। সাদা চুলের মানুষটি যখন অন্ধকারের মধ্যে তাঁকে 'সুকুমার' বলে ডেকেছে, অমনি, 'স্মৃতির অন্ধকার থেকে একটা ভয়ের মৃদু শিহরণ'[২২৫] তাঁর বুকের মধ্যে বয়ে গেছে। মাস্টারমশাই কিন্তু তাঁর সেই ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ চড় তোলেননি। প্রশংসা করেছেন বরং সুকুমারের বক্তৃতার। তারপর জামার পকেট থেকে সুকুমারের সেই গল্প লেখা শতচ্ছিন্ন পত্রিকাটি সযত্নে বার করে বলেছেন — 'কতকাল হয়ে গেল, তবু সুকুমার আমাকে মনে রেখেছে, আমাকে নিয়ে গল্প লিখেছে। সকলকে এই লেখা আমি দেখাই, বলি, দেখো, আমার ছাত্র আমাকে অমর করে দিয়েছে।'[২২৬] একথা শুনে লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে সুকুমার মাটিতে মিশে গেছেন। আর মাস্টারমশাই বলেছেন — 'কীযে আমার আনন্দ হয়েছে সুকুমার, কী বলব! তোমার এই লেখাটা সবসময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দু' একজন বলে, যেমন ধরে ধরে মারতেন, তেমনি বেশ শুনিয়ে দিয়েছে আপনাকে। আমি বলি, শোনাবে কেন, কত শ্রদ্ধা নিয়ে লিখেছে, আর সত্যিইতো অন্যায় যদি করেই থাকি, ওরা ছাত্র—ওরা সন্তান। বড় হলে সে অন্যায় আমার শুধরে দেবে বইকি।'[২২৭] আবেগে-ভালবাসায়-মমতায় মাস্টারমশাইয়ের চোখে জল চলে এসেছে। আর তীব্র অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হয়ে সুকুমারের মনে হয়েছে '...... স্নেহ-ক্ষমা-মমতার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। ..... সেই মমতা যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি, আমি তাকে দশ টাকায় বিক্রী করেছিলুম। এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব!'[২২৮]

এ গল্পেও আমরা আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র পাই, যিনি স্নেহ-মমতা-ক্ষমা ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি। আর তারই পাশাপাশি পাই লোভী, কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ ছাত্রের ছবি। এখানেও ভালবাসা ঐ ছাত্রকে আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে তা ' সঞ্চার' কিম্বা ' গিল্‌টি'র মতো স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা নয়, বাল্য-শিক্ষকের নিঃস্বার্থ ভালবাসা। নারায়ণবাবুর অন্যান্য গল্পের মতো এখানেও শিক্ষকের চরিত্রটি অত্যন্ত বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী। এইখানেও দরিদ্র, বৃদ্ধ, লাঞ্ছিত শিক্ষকটির জন্য পাঠক সমবেদনা বোধ করে এবং শিক্ষকমহাশয়ের বিশাল হৃদয়ের স্নেহ-মমতার ধারা দেখে শ্রদ্ধা অনুভব করে। গল্পটি সুকথিত। ভাষা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। গল্পের বাঁধনও দৃঢ়। অবান্তর প্রসঙ্গ এসে কখনোই গল্পটিকে তার মূল ভাবকেন্দ্র থেকে চ্যুত করেনি। এ গল্পে মাস্টার মশাইয়ের ব্যক্তিত্ব যেন অসীম আকাশের মতো। আর তার সামনে সুকুমার একটি সাধারণ মানুষ মাত্র। আকাশ থেকে ঝরে পড়া স্নেহ-ধারার কণা থেকে তাই সে-ও বঞ্চিত হয়নি। প্রসঙ্গত, শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের প্রতি স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কেমন স্নেহশীল ছিলেন, সেকথা মনে পড়ে। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য নিজের ছাত্র-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে বলেছেন— 'ছাত্রদের তিনি নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।'[২২৯] নারায়ণবাবুর সেই স্নেহেরই শতধা প্রকাশ দেখা যায় এই গল্পে বৃদ্ধ শিক্ষকের চরিত্রে।

আতিথ্য —

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ আদর্শাত্মক গল্পে আমরা দেখি আদর্শভ্রষ্ট মানুষের আত্মগ্লানি ও সেই অনুতাপের অনলেই চোখে পড়ে অন্ধকারে সমুজ্জ্বল আদর্শের শুভ্র রূপ। এই গল্পেও এক ভারতীয় সৈনিক নীতিবোধ হারিয়ে, বিবেক বিসর্জন দিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে নেমেছে। আর পরে আত্মগ্লানিতে ও ঘৃণায় জ্বলে উঠে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। ঐ সৈনিকটির জবানীতেই গল্পটি কথিত।

জোয়ারে উন্মত্ত গঙ্গার বুক থেকে কে. পি. কে উদ্ধার করেছে আর. এন.। প্রাণ বাঁচানোর সূত্রে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হয়নি। ভারতবর্ষের দু'টি আলাদা প্রদেশের মানুষ হয়েও তারা মনের এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, দুজনেই দুই

প্রদেশের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে যেন নিজের চোখে দেখতে পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে জেনেছে ওদের মা, বোন ও প্রিয়তমার কথা।

কে. পি. আর. এন. কে বহুবার তার বাড়িতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। কে.পি.র বোন কে.পি.র মারফৎ তাকে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ করেছে। আর বাবার সঙ্গে বচসা করে ঘর-ছাড়া ছেলে আর. এন. গৃহ-সুখের জন্য, এতটুকু স্নেহচ্ছায়ার জন্য কাঙ্গাল হয়ে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাওয়া হয়নি। এর মধ্যে ম্যালেরিয়ায় কে. পি. মারা গেছে।

বন্ধুর জন্য শোকে আর. এন. পাগলের মতো হয়ে উঠেছে। অলক্ষ্য ভয়ঙ্কর শত্রু — মৃত্যুর বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সে অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তার চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে সেই গ্রামের নদী, খেয়াঘাট, পাহাড়, শাল অর্জুনের বন। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কে.পি.র মা, ভাই-বোনের মুখগুলি। কে.পি.র প্রিয়তমার নিবিড় সৌন্দর্য 'জলে আঁকা ছবির মতো'[২৩০] মিলিয়ে গেছে।

অর্থের প্রয়োজনে এরপর আর. এন. যোগ দিয়েছে আর্মিতে। আর্মির কড়া নিয়ম-শৃঙ্খলা তাকে দিয়েছে অন্য জগতের আস্বাদ। মৃত্যু সেখানে অতিথি। তার আসার কোন নির্দিষ্ট তিথি নেই। তাই সামনেই মৃত্যুকে দেখে সৈন্যদল মরীয়া হয়ে উঠেছে। যে 'অনিবার্য ভবিষ্যতের'[২৩১] জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছিল, তাতে মাদক উত্তেজনা 'অপরিহার্য' ছিল। তার ফলেই ঘটল সেই চরম ঘটনা। নিষ্ঠুর মৃত্যুকে ভুলতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বিভীষিকাকে অস্বীকার করে দু'দিনের ভোগ-সুখে মত্ত হয়ে কিছু সৈন্য গ্রামের একটি মেয়েকে অপমান করতে গেল। ফলে গ্রামের লোক তাদের শাস্তি দিল ভালরকম। গ্রামের লোকদের এই দুঃসাহস দেখে ন্যায়-নীতি-বিবেকহীন, আদর্শচ্যুত সৈনিকরা দল বেঁধে বেরোল জান্তব আক্রোশে প্রতিশোধ নিতে। পুরুষদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করল, আর নারী-মাংসকে ক্ষুধার্ত পশুর মতো ছিঁড়ে ফেলল। তারপর নেশার উত্তেজনা কেটে যাবার পর 'বিদ্যুৎচমকের মতো' আর. এন. এর খেয়াল হল এ গ্রাম কে. পি. র গ্রাম। 'সব মিলছে। সেই মাঠ, সেই খেয়াঘাট, সেই শিবমন্দির— দূরে পাহাড়ের গায়ে সেই অর্জুন আর শালের বন, তাহলে'[২৩২] তাহলেকি এইভাবে এতদিন পর সে কে.পি.র নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে? তার মায়ের আশীর্বাদ, বোনের হাতের ভাই-ফোঁটার এই প্রতিদান দিয়েছে? কে.পি.র মানসীর সঙ্গে কি এমনি করে পরিচয় হল তার? তীব্র আত্মগ্লানিতে, ধিক্কারে আর.এন. আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু হাত কেঁপে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সেরে ওঠার পর তার জেল হয়েছে। কিন্তু তখনো তার আত্ম-ধিক্কারে শেষ হয়নি। সে কেবলই বলেছে 'এর চেয়ে গুলি করে মারলেই আমি খুশি হতাম।'[২৩৩]

গল্পটিতে সেনাবাহিনীর যে নীতিভ্রষ্ট, আদর্শহীন কার্যকলাপের কথা আছে, তা বাস্তবে দুর্লভ নয়। আর. এন. এর মতো অনেক সৈনিকই হয়তো এমন কাজ ঝোঁকের মাথায় করে পরে অনুতপ্ত হয়। আদর্শচ্যুত-মনুষ্যত্বহীনতার লজ্জায় তাদের আত্মহননের পথই বেছে নিতে হয়। এইভাবে এই গল্পটিতে আদর্শচ্যুতিই বিবেককে জাগ্রত করে আদর্শের শুভ্রতার দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেছে। আর গল্পটি একটি সার্থক আদর্শাত্মক গল্পে পরিণত হয়েছে।

আর. এন. এর মুখে গল্পটি কথিত হওয়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা এসেছে বেশি। গল্পটির ভাষা ভাবানুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে। দুই বন্ধুর বন্ধুত্বে সে ভাষা যেমন কোমল যে দুর, পরে বিবেকহীন, নীতি-হীন পাশবত্বের সময় সেই ভাষাতেই এসেছে তরবারির ধার। আর গল্পের নামকরণ 'আতিথ্য' অবশ্যই ব্যঙ্গমূলক।

বিদ্রূপাত্মক গল্প —

বিদ্রূপাত্মক গল্পগুলি সাধারণত সামাজিক, রাজনৈতিক ও যৌন সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এই ধরনের গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্ষুরধার বক্র হাসির ঝলক ইঙ্গিতময়তায় ভাস্বর করে তোলে গল্পের মূল বক্তব্যকে। এ প্রসঙ্গে চেকভের 'বহুরূপী' (chamelon) , ও. হেনরির 'পুলিশ এবং ধর্মগীতি' (The Cop and The Anthem), দিদারোর 'সার্জন এবং ৪৬ নম্বর শব' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে প্রমথনাথ বিশী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) প্রভৃতির লেখাতেও বক্রহাসির ঔজ্জ্বল্যে শ্লেষের চাবুক সুমদ্যত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে এ ধরনের বিদ্রূপের চাবুক ঝলসে উঠেছে। তাঁর এই পর্যায়ের কিছু গল্প নিয়ে এবার আলোচনা করা হচ্ছে।

ইদু মিঞার মোরগ —

গল্পটি অসাধারণ। তাই ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে অনূদিত হয়ে গল্পটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। লঘু কৌতুকের ভঙ্গিতে গল্পটি লিখিত। কিন্তু এর মূলে আছে শাণিত বিদ্রূপের দ্যুতি। সেই দ্যুতিই গল্পটিকে উজ্জল করে তুলেছে, মূল সমস্যাটিকে আলোকিত করে তুলেছে।

আমাদের সমাজে পুলিশী-ব্যবস্থা যে কত বড় প্রহসন, তা এই গল্পটি পড়লে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। সামান্য একটি মোরগকে কেন্দ্র করে এখানে পুলিশী-ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচিত করা হয়েছে।

দরিদ্র ইদু মিঞার প্রাণাধিক প্রিয় মোরগটির দিকে লক্‌লকে লোভের জিভ বাড়িয়ে নাটকীয়ভাবে এগিয়ে আসে একের পর এক লোক এ গল্পে। প্রথমেই দবিরুদ্দিন দফাদার জোর করে দুটো টাকা ফেলে মোরগটাকে নিয়ে যায় পুলিশি মেজাজ দেখিয়ে। কিন্তু সেই হৃষ্টপুষ্ট মোরগের ওপর চোখ পড়ে দারোগার। তাঁর লালসার দৃষ্টিতে মোরগটার 'হাঁড়িকাবাবে' পরিণত হতে মুহূর্তমাত্র লাগে। চক্ষুলজ্জাহীন দারোগা মোরগটিকে তাঁর সাইকেলে বেঁধে দেবার হুকুম দেন। আর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ায় মরীয়া হয়ে দবিরুদ্দিন মোরগের দাম তিনটাকা চেয়ে বসে। দারোগা আশ্চর্য হয়ে যান দবিরুদ্দিনের এই দুঃসাহস দেখে— 'কুড়ি বছরের চাকরি জীবনে এ অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম।'[২৩৪] পুলিশরা চিরকালই জুলুম করে ও ভেট এবং ঘুষ নিয়ে অভ্যস্ত। সেখানে ন্যায্য দাবি করা দুঃসাহস বইকি!

অতঃপর দারোগা সাইকেলে মোরগ ঝুলিয়ে পথ চলেন। কিন্তু তিনি আবার মুখোমুখি পড়ে যান ইন্সপেক্টরের। মোরগের দিকে চোখ পড়তেই ইন্সপেক্টরের চোখ 'শেয়ালে'র মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। তিনি মোরগটাকে জীপে তুলে দিতে হুকুম দেন।। আর দবিরুদ্দিনের মতোই মরীয়া হয়ে দারোগা মোরগটার চার টাকা দাম চেয়ে বসেন। আর একটু আগে দবিরুদ্দিনের স্পর্ধা দেখে যেমন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন দারোগা, তেমনি অবস্থা হয় ইন্সপেক্টরের। কিন্তু এত করেও মোরগটা তাঁদের কারোর খাওয়া হয়না। আল্‌গা ফাঁস খুলে মোরগ পালায় ইদু মিঞার কাছে। 'আর তিনটে ছোট ছোট ঘটনা ঘটলো তারপরে।'[২৩৫] দারোগার রিপোর্টে দবিরুদ্দিন দফাদারের চাকরি যায়। আর ইন্সপেক্টরের মোরগের পিছনে ধাওয়া করে জখম পা সারে দেড় মাস পরে। তারপর ইন্সপেক্টরের অভিযোগে দারোগা সাসপেণ্ড হয়ে যায়।

গল্পটি শেষ হয়েছে খুব নাটকীয়ভাবে এবং খুবই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা বিস্তার করে। বিশেষত মাত্র চারটি পংক্তিতে অতি সংক্ষেপে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে ছোটগল্পের ছোট অথচ ইঙ্গিতগর্ভ হবার শর্তটি যথাযথভাবে পূরণ করে।

এই শেষের বাক্যক'টি যেন পুলিশের হাতের ছোট ছোট রুল, যা দেখতে ছোট কিন্তু গায়ে পড়লে টের পাওয়া যায় তার শক্তি। আর এখানে এই রুল পড়েছে পুলিশেরই গায়ে। নোলাসর্বস্ব, নীতিহীন, জুলুমবাজ পুলিশের যথেচ্ছাচারকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করেছেন সমাজ-সচেতন ও সুরসিক লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

একটি কৌতুকনাট্য —

গল্পটির নামকরণের মধ্যেই মিশে আছে বিদ্রূপ ও শ্লেষের ঝাঁঝ। আমাদের নষ্ট সমাজের ঘরে-ঘরে যে কৌতুক-নাট্য অভিনীত হয়, তাতে কৌতুকের মোড়কে ,যে গরল থাকে; তারই জ্বালা, বিদ্রূপের ঝাঁঝে রূপান্তরিত হয়েছে এ গল্পে।

মধ্যবিত্ত ঘরে এখনও মূল্যবান কিছু চুরি গেলে সন্দেহ করা হয় নিম্ন মধ্যবিত্তকে এবং আসল অপরাধী অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করে। সর্বোপরি অপরাধী যদি ঘরের কেউ হয়, তার দোষকে চাপা দিতে অন্যের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করতেও কারো বাধে না। এ গল্পেও তাই হয়েছে। অন্নপ্রাশনে ছেলের হার চুরি গেলে বাড়ির লোকরা সেইসব দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনদেরই সন্দেহ করেছে, 'যাদের মেয়েদের হাতে কাচ আর ব্রোঞ্জের চুড়ি'[২৩৬] যারা ফুটপাথ থেকে জামা-কাপড় কেনে এবং সিগারেট নয়, বিড়ি খায়। বস্তুত হার চুরির কথা জানাজানি হতেই বাড়িতে 'বিষাক্ত আবহাওয়া'[২৩৭] থ'মথম করছে। আত্মীয়-স্বজনরা মানে মানে কেটে পড়তে চেয়েছে। এ হেন অবস্থায় পরীক্ষায় বার তিনেক ফেল করা, ফুটবল ও ড্রামা ক্লাবের উৎসাহী শৌখিন সদস্য পোকেন ('মামার ছেলে') চোর ধরেছে। পাকিস্তানাগত এক বুভুক্ষু মানুষ, যে অন্নপ্রাশনের এঁটো পাত কুড়িয়ে খাচ্ছিল, তাকেই চোর বলে সাব্যস্ত করেছে পোকন। কেননা, নিজের অপরাধ ঢাকতে দরিদ্রের উপর অকারণ জুলুম করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর যে নিম্নবিত্ত আত্মীয়দের ওপর এতক্ষণ সন্দেহের বাণ বর্ষিত হচ্ছিল, তারাও সুযোগ পেয়ে গায়ের ঝাল মেটাতে এসেছে। সারাদিনের অপমানের জ্বালা তারা মিটিয়েছে তাদের চেয়েও দুর্বল এবং অসহায় মানুষটিকে বেদম পিটিয়ে। আর 'চোরের মায়ের বড় গলা' যে হয়, তাতো প্রবাদ-বাক্যেই আছে। তাই চোরের ওপর কারোর মায়া হলেই পোকন বড় গলা করে বলেছে 'তিন ভরির হার, তুমি সিম্প্যাথি করছ?'[২৩৮] নেংটি পরা, উপবাসী মানুষটির ওপর 'হাতের সুখ' চলেছে পুরোদমে। আর এইসময় পোকনের বাবা এসে মারধোর থামিয়েছেন । কিন্তু এক আশ্চর্য অমানবিক শাস্তি দিয়েছেন লোকটিকে। লেখকের ভাষায় 'এর চাইতে মারাত্মক শাস্তি পোকনও বোধহয় ভাবতে পারতনা।'[২০৯]

দীর্ঘদিনের অভুক্ত এই মানুষটিকে মামা এক সের সন্দেশ খাইয়েছেন। আর তারপর বুকে সন্দেশ আটকে শুকনো গলায় বিস্ফারিত চোখে লোকটা যখন জল খাবার জন্য আঁকুপাঁকু করেছে, তখন অদ্ভুত নিষ্ঠুর শীতলতায় তিনি বলেছেন 'হার কোথায় আছে না বললে জল দেওয়া হবেনা।'[২৪০] ফলে তেষ্টায় কাতর হয়ে লোকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো কবুল করেছে 'নিছি নিছি হার নিছি। এখন একটু জল দ্যান'[২৪১] — লোকটা থানা-পুলিশ সব করতে রাজি হয়েছে শুধু একটু জল খাবার বদলে।

মামা কিন্তু লোকটাকে ছেড়ে দিয়েছেন এসব ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে। লোকটাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়ায় 'ক্ষুধার্ত বাঘের মতো'[২৪২] জ্বলে উঠেছে পোকনের চোখ। কিন্তু তার বাবা যখন বলেছেন যে, হারটা তিনি ফেরত পেয়েছেন— চোরটা যাকে হারটা বেচেছিল, সেই এসে দিয়ে গেছে তাঁকে ডিস্‌পেন্সারিতে। তখন কেঁচোর মতন গুটিয়ে গেছে পোকন, পালিয়েছে বাড়ির ভীড়ের মধ্যে।

আর গল্পের শেষে পোকনের বাবা করুণ স্বরে বলেছেন 'যে দুদিন খেতে পায়না, তাকে একথালা সন্দেশ খাইয়ে জল না দিলে চুরিতো চুরি—তিনটে খুনও সে কবুল করত'।[২৪৩] বাড়ির কেলেঙ্কারি গোপন করার জন্য এর চেয়ে সহজ পথ আর কি-ই বা ছিল?

এখানে মামার গলার বিদ্রূপের ঝাঁঝ গ্লানিতে কোমল হয়ে এসেছে। হার চুরিকে কেন্দ্র করে সামান্য এই ঘটনাটুকুর মাধ্যমে লেখক যেভাবে আমাদের সমাজ, লোকলজ্জা প্রভৃতিকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আলোকে দেখেছেন, তা ধনী-দরিদ্র বৈষম্যে পীড়িত সমাজের মুখোশ খুলে দেয়। বস্তুত এটি 'কৌতুকনাট্য' নয়, প্রহসন মাত্র। গল্পে চরমক্ষণ এসেছে মামা পকেট থেকে সোনার হারটা বার করবার সময়। ঘটনা-সংস্থান ও রচনাশৈলীর গুণে— বিশেষত বাস্তব চরিত্র-চিত্রণের মুন্সীয়ানায় গল্পটি অনবদ্য।

ঁশ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু —

এটি আগাগোড়া একটি বিদ্রূপাত্মক গল্প। গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ছত্রে বিদ্রূপের ফুলঝুরি। ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের নিয়মানুযায়ী এখানে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়েছে অর্থলোলুপ গোপীবল্লভ কুণ্ডুর। বস্তুত, এই গল্পটি যেন একটি মূল্যবান জড়োয়ার গয়না; যার প্রতিটি পাথরে হীরা, চুনী, পান্নায় বিদ্রূপের দ্যুতি ঠিকরে পড়েছে।

ব্যবসায়ী ঁগোপীবল্লভ কুণ্ডুর শ্রাদ্ধবাসরে বক্তৃতা দেবার ছলে গল্পটি লিখিত। লক্ষণীয় এইযে, গল্পটিতে কোন ঘটনা নেই; তবু গল্পটি আর্কষণীয়। সামান্য একটি বক্তৃতার মাধ্যমে গোপীবল্লভ কুণ্ডুর চরিত্রটি উদ্‌ভাসিত হয়েছে যথাযথভাবে। এখানে গোপীবল্লভ কুণ্ডু ব্যক্তি বিশেষ নন, কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের তিনি প্রতিনিধি মাত্র। শৈশব থেকেই তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী এবং নির্লজ্জ। বক্তার ভাষায় 'ক্লাসের অন্য ছেলেরা প্রমোশন পেলেও তিনি পেতেন না কিন্তু সেজন্যে দুর্বলের মতো তিনি কোনোদিন অশ্রুমোচন করেননি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও তিনি ক্ষুণ্ণ হতেননা বরং সেইসময়ে নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করে তিনি ডাব পাড়তেন, ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন। শিশুকাল থেকেই তিনি এইরকম দৃঢ় চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন।'[২৪৪] এই প্রসঙ্গে বক্তা 'Morning shows the day' - প্রবচনটির যাথার্থ্য দেখে বিস্মিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে পাঠকরাও বিস্মিত হয়েছেন বৈকি; তবে গোপীবল্লভের চরিত্রবল দেখে নয়, তার অধঃপাতের সূচনা ও পরবর্তীকালে তার চরম রূপ দেখে। চৌর্য্যাপরাধে গোপীবল্লভ স্কুলে শাস্তি পান ও তার প্রতিবাদে মা তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে দেন। গোপী তাঁর পিতার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। কটু বাক্য বিস্তারের কৌশলে অল্প বয়সেই তিনি টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আবার চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হন। ভাইয়ের সঙ্গে মামলায় লড়েন এবং অল্পের জন্য কারাবাস থেকে রক্ষা পান। পিতৃ-সম্পত্তি থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। ফলে বক্তারই ভাষায় 'উদ্যোগী পুরুষসিংহ'[২৪৫] — এর মধ্যে তিনি কলকাতায় ভাগ্য পরীক্ষা করতে চলে আসেন ও শেষ অবধি তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে 'লক্ষ্মীর বর'[২৪৬] লাভ করেন। প্রথমে ফাটকা বাজারে তিনি কিছু অর্থদণ্ড দেন। তারপর পতিতালয়ে চরিত্রহীন মদ্যপদের অচেতন অবস্থায় 'শতমুদ্রা দিয়ে দশসহস্র মুদ্রার'[২৪৭] হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নেন। এভাবে তাঁর মহাজনী ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। বক্তার ভাষায় 'এই উপায়ে ক্রমে তিনি বহু চরিত্রহীন ধনী সন্তানকে অবিদ্যাগমনজনিত পাপ থেকে মুক্ত করেন'[২৪৮] এবং ' এর ফলে একদিকে যেমন মনুষ্যকুল—কলঙ্ক অপোগণ্ড ধনী সন্তানেরা পাপকার্যে অর্থব্যয়ে অপারগ হয়, অন্যদিকে পরম করুণাময় শ্রীশ্রী কৃষ্ণের কৃপায় গোপীবল্লভ কিছু সঞ্চয়েরও সুয়োগ পান।'[২৪৯] বৈষ্ণব ভেকধারী গোপীবল্লভ ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুমন্ত্র জপ করেন, 'মাদকদ্রব্য' স্পর্শ করেননা, তিনি 'জিতেন্দ্রিয়' পুরুষ; কিন্তু পাপপল্লীতে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য পরিভ্রমণ করতে তাঁর বাধেনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারায়ণবাবুর বহু গল্পে উপন্যাসে ভেকধারী বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্রূপ সোচ্চার। 'নক্রচরিতে'র নিশিকান্ত, 'মহানন্দা' উপন্যাসের ভণ্ড শ্বশুর (যতীশ) এছাড়াও তাঁর 'ভাঙা চশমা' গল্পে নিষ্ঠুর পণ্ডিতমশাই বেতে তুলসী পাতা বেঁধে তবে বেত্রাঘাত করেন। আসলে যে কোন বক-ধার্মিকের প্রতিই তাঁর বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে বিভিন্ন গল্পে-উপন্যাসে।

গোপীবল্লভ কুণ্ডু অতঃপর একটি কাপড় ও একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করে 'বাঙ্গালির বাণিজ্যক্ষেত্রে যুগান্ত সূচিত করেন।'[২৫০] শ্রমজীবী মানুষের ধর্মঘট রুখতে তিনি পুলিশী সাহায্য নিয়ে দু-চারটে লাশ ফেলতেও দ্বিধা করেননা। ফলে তাঁর ভাষণ 'শ্রমজীবীদের লোভ আজ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে— দেখবেন মৃত্যু তাদের অবধারিত'[২৫১] অবিলম্বে সত্যে পরিণত হয়ে তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ রাখে। শ্রমিকদের নায্য দাবি দেখে তিনি ব্যথিত হয়ে বলেন যে, 'এইজন্যেই বাঙালীর কিছু হয়না।'[২৫২] গোঁড়া গোপীবল্লভ স্ত্রী-শিক্ষাকে ব্যভিচার বলেই মনে করেন ও তার বিরুদ্ধে প্রচার চালান। ইংরেজকে তিনি 'রাজা' বলে মনে করেন ও বলেন— 'আমাদের শাস্ত্রে রাজদ্রোহিতা মহাপাতক'।[২৫৩] সুতরাং একান্ত ধর্মপ্রাণ গোপীবল্লভ স্বাধীনতা আন্দোলনের

বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির সময় বক্তার ভাষায়— 'সামান্য তিন লাখ'[২৫৪] টাকা তিনি ধান-চাল স্টক করে রোজগার করেন 'ন্যায্য প্রাপ্য'[২৫৫] হিসেবে। কিন্তু লঙ্গর-খানায় একহাজার টাকা চাঁদা দেন। মাল পাচার করতে গিয়ে তিনি বাঙালী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়ে বলেন 'বাঙ্গালি সবসময় বাঙালির সর্বনাশের চেষ্টা করে।'[২৫৬] তাই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কালোবাজারী, মাড়োয়ারীদের মতোই সভা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বক্তা উপসংহারে বলেছেন— 'তাঁর জীবনের আদর্শ ও সত্যকে অবলম্বন করে আমরাও যেন আমাদের উপযুক্তরূপে গড়ে তুলতে পারি— আজ এইমাত্র আমাদের কামনা। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি! শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু!'[২৫৭] এরচেয়ে চরম বিদ্রুপের চাবুকাঘাত করে গল্পের ছেদ টানা বোধহয় অসম্ভব ছিল। এইরকম হাজার গোপীবল্লভ কুণ্ডুকে আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, তাদেরও মৃত্যুর পর শোকসভা হয়। আর এ প্রহসনের অন্তরালে বিদ্রূপের চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে বিবেক। সভাশেষের হাততালিতে সেই বিদ্রূপেরই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে পড়ে।

এ গল্পটির ভাষা আগোগোড়া মিছরির ছুরি— সরস বিদ্রূপে উজ্জ্বল। গল্পটি ঘটনা-বিহীন কিন্তু বক্তার বাচনভঙ্গি এতই আকর্ষক যে, লেখক তাঁর নিপুণ রচনা-কৌশলে গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করেছেন। গল্পটিতে অবশ্য তথাকথিত কোন চরমক্ষণ নেই। কিন্তু গল্পটি যে ধরণের চরিত্রের মুখোশ খুলতে চেয়েছে, সেই উদ্দেশ্যের একমুখিতা আছে। গল্পটির নামকরণ সাদাসিধা এবং স্পষ্ট। ''ঁগোপীবল্লভ কুণ্ডু' কোন্ শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয়না।

'একটি শত্রুর কাহিনী' —

গল্পটিতে রাজনৈতিক জটিলতায়, যুদ্ধের দুর্দিনে ভারতের শত্রু-মিত্র নিরূপণের প্রশ্নটি খাপ-খোলা তরবারির মতো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

'পুতুল পূজোর' দেশ ভারতবর্ষে মহান খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসে পাদ্রী ডোনাল্ডস্ তিক্ত অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত। ভারতবর্ষের প্রতি ঘৃণা ছাড়া তাঁর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। স্বপ্নের জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড এখনও তাঁকে হাতছানি দেয়। আর ঐ পাদ্রীরই দীক্ষিত শিষ্য ডোঙা সাঁওতাল খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে 'জোসেফ ইম্যানুয়েল' নাম নিয়ে নিজেকে সত্যিকারের সাহেব ভেবে গর্ববোধ করে। নিজের তুচ্ছ ভারতীয় পরিচয়টা ভুলে যাবার জন্য তার চেষ্টার অবধি নেই। কিন্তু তার চিরশত্রু দেশের দুষ্ট ছেলের দল তাকে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলতে দেয়না। ''দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার মত 'ডোঙা ঠোঙা ঠোঙা' রবে তাদের বিদ্রূপবাণী অনুক্ষণ তার অভিজাত্য-চেতনাকে বিদ্ধ করতে থাকে।''[২৫৮]

এহেন পরিস্থিতিতে গল্পে আবির্ভাব ঘটে তরুণ জার্মান পাদ্রী হ্যান্সের। 'পাদ্রীর পোষাকটা তার ছদ্মবেশমাত্র। আসলে ম্যাকস্মূলারের গ্রন্থ পড়ে ভারতবর্ষকে সে ভালবেসেছিল।'[২৫৯] ভারতবর্ষকে চোখে দেখে এ ভালবাসা আরও নিবিড় হয়ে এল। ভারতের মন জয় করতে তার দেরি হলনা। তার ছেলেমানুষী কৌতুক-প্রবণতা সাঁওতাল জোসেফের সহ্য হলনা। হ্যানস্ যখন দুষ্ট-ছেলে- তাড়িত জোসেফকে দেখে বলল— 'ইয়োর রানিং ইজ ভেরী ইটারেস্টিং মিস্টার ঠোঙা!'[২৬০] জোসেফের 'ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোতে ঝকমক করে উঠল নরহত্যার অনুপ্রেরণা।'[২৬১] ফলে বুড়ো পাদ্রী ডোনাল্ডসের কাছে হ্যান্সের নামে নালিশ ঠুকতে দেরি হলনা। এমনিতেই ডোনাল্ডস্ হ্যান্সের ভারত-প্রেম দেখে বিরক্ত ছিলেন। সুতরাং 'গির্জার আকাশস্পর্ধী ক্রুশের আশ্রয়ে হ্যান্সের স্থান হল না।'[২৬২] শুরু হল যুদ্ধ। জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা। সুতরাং ইংরেজ-শাসিত ভারতেরও শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হল জার্মানীকে। তাই 'জার্মান' - এই অপরাধে শিবের গাজনমেলায় প্রেমাবেশে নৃত্যরত হ্যান্সকে বন্দী করা হল। পথে দেখল ইংরেজের যুদ্ধজয়ের কামনাতে কালীপুজো হচ্ছে। হ্যানস্ ফ্লাস্কের এক আঘাতে সেই মূর্তি চুরমার করে দিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বরে বলল 'নাউ আই অ্যাম এ ট্রু এনিমি অ্যাণ্ড এ ট্রু ইয়োরোপীয়ান। অ্যাম আই নট ?[২৬৩] এ প্রশ্ন যেন বিদ্রূপের এক চাবুক। যে ইংরেজ পুতুল পূজোর দেশকে ঘৃণা করে, তারা হল ভারতের পরম মিত্র! নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিমা পূজোর অভিনয় করতেও তাদের আটকায়না! আর যে হ্যানস্ এই দেশকে ভালবেসে— তার-ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে সেই কিনা দেশের চরম শত্রু? এর চেয়ে বড় প্রহসন কল্পনাও করা যায়না। তাই হ্যান্সের ঐ ফ্লাস্কের আঘাত কালীমূর্তিতে নয়, সেই আঘাত এসে লাগে নোংরা রাজনীতির জঘন্য চক্রান্তের বুকে। হ্যান্সের সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ বিদ্ধ করে এই মুখোশ পরা সমাজকে, মিথ্যা সংস্কৃতির প্রচারকে; বিবেকহীন এক রাজনৈতিক প্রহসনের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে এ প্রশ্ন। গল্পটির সমাপ্তি নাটকীয় এবং এর সমাপ্তিতে বিদ্রূপবাণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়েছে। ছোটগল্প যে একাগ্নী বাণ — সে সত্য এ গল্পে স্বীকৃত। স্থির লক্ষ্যে, বিদ্যুৎ গতিতে বিদ্রূপ-বাণ এ গল্পে বিদ্ধ হয়েছে। গল্পের ভাষা চরিত্রানুযায়ী যথাযথভাবে বদলেছে। চরিত্রগুলিও জীবন্ত। গল্পটির চরম মুহূর্ত এসেছে গল্পের শেষ মুহূর্তে হ্যান্সের ফ্লাস্ক ছোঁড়ার সময়ে। গল্পটির নামকরণ নিঃসন্দেহে ব্যঙ্গাত্মক। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন শত্রুর নয়, পরম মিত্রর কাহিনী। তাই গল্পটি সম্পর্কে মানস মজুমদারের উক্তিটিও স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন 'গল্পটি ইঙ্গিতগর্ভ ও শ্লেষাত্মক।'[২৬৪] যদিও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ''ভিখারী সাহেব' গল্পে এই শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই, তবু হ্যান্সের মানব-প্রেম ও ভারত-প্রীতি এই গল্পটির কথা মনে করায়।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ক গল্প

নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিচিত্র। কখনো এ সম্পর্ক প্রেমের, কখনো বা ঘৃণার, কখনো বিরহের, কখনো হিংসার এবং কামনার। কখনো এ সম্পর্কের মধ্যে খেলা করে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমাজ কখনো এ সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। এ সম্পর্কের খাঁজে খাঁজে জড়িয়ে থাকে কখনো রোম্যান্স, মনস্তত্ব কখনো এ সম্পর্কে সমস্যার সৃষ্টি করে, কখনো বা কাব্য-সৌন্দর্য একে ঘিরে থাকে ছায়ার মতো। স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'এ হল মানুষের সর্বাদি গল্প, সর্বশেষ গল্প, সবচেয়ে প্রিয়-গল্প— এর মধ্যেই বিষামৃতের একত্র মিলন।'[২৬৫] বস্তুত নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ছোটগল্প রচিত হয়েছে মানব-ইতিহাসে সাহিত্য- সৃষ্টির আদিযুগ থেকে এবং এর সমাপ্তি ঘটবে মানব-সভ্যতার অবসান ঘটলে। পৃথিবীর সব দেশের বিভিন্ন কালের লেখক এ বিষয়ে প্রচুর গল্প লিখেছেন। তাই আলাদা করে আর সে আলোচনা করা হলনা। এবার নারায়ণবাবুর লেখা নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ক কিছু গল্প আলোচনা করছি।

তমস্বিনী —

গল্পটিতে সমাজে নারীর স্থান কোন্‌খানে তা যেমন স্পষ্ট, সমাজ-শাসক পুরুষের চোখে নারীর স্থান ও পুরুষের প্রতি নারীর ঘৃণা এ গল্পে তেমনি স্পষ্ট। স্মৃতিচারিতার সূত্রে এ গল্পটি কথিত। কালিঘাটের এক ভিখারিনীকে দেখেই অন্তর মনে স্মৃতির দুয়ার গেছে খুলে ও পাঠকের কৌতূহলও সৃষ্টি হয়েছে গল্পরচনার এই কৌশলে। সর্বোপরি এভাবে কথিত হওয়ায় গল্পটির বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে প্রচুর। বক্তা-অর্থাৎ অন্তুর কৈশোর আর পারুল কাকীমা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কৈশোরের পদার্পণে যখন অন্তর জীবনের সামনে একটা অজানা উপকূল ছায়ার মতো ফুটে উঠেছে মনের রঙে মিশে; তখন গ্রামের বাঁশবনে হিংস্র বিড়ালের নখের আঁচড় পড়েছে, জাত গোখরো আর বেজীর মরণপণ ভয়াল আদিম সংগ্রাম চলেছে; আর সেই বাঁশের কাঁচা গন্ধে একরাশ রহস্য নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন পারুল কাকীমা।

পারুল কাকীমার স্বামী বলরামকাকার 'রোগা, হাড়-বের করা কালো চেহারা, শীতকালে হাঁপানির টানে কষ্ট পেতেন।'[২৬৬] হাতের আঙ্গুলগুলো তাঁর পানিজোঁকের মত অস্বস্তিকরভাবে কিলবিল করত। এই বলরাম কাকা খালি তামাক খান, উদ্ভট শ্লোক জিজ্ঞাসা করেন, আর তন্ত্রসাধনার মিথ্যা বড়াই করেন। বলাবাহুল্য, এই বর্ণনাটুকুর মধ্য দিয়ে মানুষ হিসেবে বলরাম কাকা কত নিম্নশ্রেনীর তা একনজরেই বুঝে ফেলা যায়। আর এই অন্তঃসারশূন্য মানুষটিকে অবিরাম তামাক জুগিয়ে যায় দূর সম্পর্কীয় সুন্দরী বিধবা 'তারা মাসীমা', তার চোখের তারায় 'নীলচে আভা'[২৬৭] — ঝকঝক করে, আর গলার স্বর তার আশ্চর্য 'কঠিন ও নীরস'।[২৬৮] এই বর্ণনাটুকুর মধ্য দিয়ে তারা মাসীমার হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জ্বলন্ত কামনার রূপ ফুটে ওঠে, পরিণামে যে আগুনে তার নিজেরই প্রাণ দিতে হয়। আর পারুল কাকিমার শান্তশিষ্ট গেরস্ত বউয়ের মতোই চেহারা, যার 'বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা।' এই চরিত্রটির অকস্মাৎ বদল-শান্ত ভীরু বউটির দুঃসাহসী হয়ে অনিশ্চিত জীবনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত দীর্ঘকালীন বেদনা ও ক্ষোভ, ঘৃণায় পরিণত হতে। এই চরিত্রটির বিবর্তন ও বদল লেখক এমন বাস্তব-সম্মতভাবে দেখিয়েছেন যে, একবারও তা অসম্ভব মনে হয়নি। বরফও একদিন গলে জল হয় জীবনের দুঃসহ উত্তাপে। আর তখনই আসে বন্যা, যা পারুল কাকীমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই মহাসমুদ্রের দিকে, যেখানে 'সব প্রাণ, সব ঋণ মুক্তি পায়।'[২৬৯]

বলরামকাকা আর তারা মাসীমাকে কেন্দ্র করে গ্রামে ছিল নানান্ কুৎসা। তার কতকটা কানে যেতেই মানুষের হৃদয়ারণ্যের জটিল অন্ধকার অন্তুর কিশোর-মনকে করেছিল আকৃষ্ট ও কৌতূহলী। সেই সঙ্গে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল বলরামকাকাকে, এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল তার মাসীমাকে, আর মমত্ববোধ করেছিল পারুল কাকীমার জন্য। তাই পারুল কাকীমার চিঠি-পত্র সে লিখে দিত, টুকি টাকি ফাই-ফরমাশ খাটতো। আর তাই দেখে তারা মাসীমার চোখের তারা হিংসায় দপ্‌দপ্ করত। আবার বলরাম কাকা ও তারা মাসীমার নিভৃতালাপের সময় অবহেলিত, অভিমানিনী, দুঃখিনী, পারুল কাকিমা ছায়ার মতো নিঃশব্দে সরে যেত।

কিন্তু ব্যাভিচারের ফল ফলতে দেরি হলনা। পারুল কাকিমার ভাষায় 'একজন না চাইতেই সন্তান পেল, তাই মরতে হল তাকে। আর একজন সাত বছর চেয়েও পেলনা তাই তাকে বেঁচে থাকতে হল, বেঁচে থাকতে হল মরবার সাহস নেই বলে।'[২৭০] তান্ত্রিকতার নাম করে তারা মাসীমাকে ভৈরবী বানিয়ে গর্ভসঞ্চার করেছিলেন বলরাম কাকা। তারা মাসীমা তাঁর কাছে ছিল ভোগের সামগ্রীমাত্র। তাই কাঁটা তুলতে তিনি দেরি করেননি। আর তাঁর সেই পাপকর্মের নীরব সাক্ষী হয়ে পারুল কাকীমাকে সারারাত কাচাতে হয়েছে খুনের রক্ত মাখা কাপড়, আর এই চরম ক্ষণের মুখোমুখি হয়ে পারুল কাকীমার এতদিনের সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। দুচোখে জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আর ঘৃণার আগুন। এই নরক থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কিশোর অন্তুর শরণ নিয়েছে পারুল কাকীমা। অন্তুর সাহায্যে গয়নার নৌকায় চড়ে মাঝরাতে পারুল

কাকীমা রওনা হয়েছে দেখতে যে, 'সব পুণ্যের বোঝা নামিয়ে মরে বাঁচতে পারা যায় কিনা।'[২৭১]

এই নগ্ন নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো মুখোমুখি হয়ে কিশোর অন্তুর মনে নদীর জলের ঢেউয়ে তারার ফুল যেন 'চাপ চাপ' রক্তে পরিণত হয়েছে। আর অজানা সমুদ্রের স্রোতে ভেসে গেছে পারুল কাকীমা।

বহুকাল পরে কালীঘাটে বৃদ্ধা ভিখারিণীর সঙ্গে পারুল কাকীমার মুখের সাদৃশ্য দেখে পরিণত অন্তুর মনে বিদ্রূপের ফলার মতন ঝল্সে উঠেছে এক প্রশ্ন 'তান্ত্রিক স্বামীর পুণ্য ফলইকি তাঁকে শেষকালে এখানে পৌঁছে দিয়েছে?'[২৭২] এ বিদ্রূপ সমাজের প্রতি, ব্যভিচারের প্রতি, বিবেকহীন রতিলিপ্সু পুরুষের প্রতি। কিন্তু এই বিদ্রূপই শেষ কথা নয়। জীবনের যে ঋণ শোধ করতে একরাতের অন্ধকারে পারুল কাকীমা নদী হয়ে বয়ে গেছিল, অন্তুর মন বলে সেই নদী বয়ে গেছে সেই সমুদ্রে, যেখানে 'সব জল, সব প্রাণ, সব ঋণ মুক্তি পায়।'[২৭৩]

গল্পের শেষে এইভাবে লেখক ছোটগল্পের ফ্রেমেও এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি, এক বিষণ্ন দার্শনিকতা এনেছেন, যা গল্পটিকে কাব্য-সাহিত্যের দুয়ারে রসোত্তীর্ণ করেছে।

গল্পটির ভাষা ইঙ্গিতগর্ভ ও ব্যঞ্জনাধর্মী। ভাব একমুখী। নর-নারীর জটিল সম্পর্কের ত্রিভুজ, তাদের কামনা-হিংসা-ঘৃণার কুটিলতা ফণা বিস্তার করেছে গল্পটির ভাঁজে ভাঁজে। কিশোর— মনের আলো-ছায়ার আলপনায় নর-নারীর জটিল সম্পর্ক কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাও এই গল্পে স্পষ্ট। গল্পটিতে চরমক্ষণ আছে পারুল কাকিমার ঘর ছাড়ার মুহূর্তে, এবং নাটকীয়ভাবেই গল্পের শুরু ও শেষ। কিন্তু লেখকের উপস্থাপন-কৌশলে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। আর গল্পের নামকরণও সার্থক বৈকি, জীবনের এক অন্ধকার তমসাতেইতো ঘর ছেড়ে 'তমস্বিনী' হয়েছিল পারুল কাকীমা।

সেই পাখীটা —

গল্পটিতে পুরুষের কামনা ও নারীর ঘৃণা আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে পুরুষটি নীড়হারা পাখির মতো কুলায় প্রত্যাশী হয়েছে। আর সুদীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর নারীর মমতা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। এ গল্পে তাই ঘৃণার চেয়ে মমতা বড়। ছয়মাস স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে অন্যাসক্তা সঞ্জীবকে কারাবরণ করতে হয়েছিল, আর মেয়েটি করেছিল আত্মহত্যা। ফলে বেদনায়, ঘৃণায় বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করেছিল সঞ্জীবের স্ত্রী সুনন্দা।

দীর্ঘদিন পরে ভগ্ন-হৃদয় ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য সঞ্জীব ছুটে এসেছিল প্রাক্তন স্ত্রীর কাছে এতটুকু আশ্রয়ের আশায়। বিপজ্জনক পাহাড়ী পথে, তুষার-ঝরা হিম-শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সে কৃতাঞ্জলিপুটে এসে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দার ঘরে। কিন্তু সুনন্দা ঘরের দরজা খুললেও মনের দরজা খোলেনি। ব্যাভিচারী স্বামীকে— বিশ্বাসঘাতক প্রেমিককে সে ক্ষমা করতে পারেনি। কেননা নারীরা একটি পুরুষের জন্য হাজার দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করতে পারে; কিন্তু ভালবাসার ছলনা তারা সহ্য করতে পারেনা। তাই 'আপনি' সম্বোধনে সুনন্দা তৈরী করেছে এক দূরত্বের আবহ। ভাঙা শরীর নিয়ে ক্লান্ত সঞ্জীব কোমল শয্যার উষ্ণ উত্তাপ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঘরের উত্তাপ, কোমলতা যার জন্ম দেয়— 'প্রেম'; আজ দুজনেই সেকথা কল্পনাও করতে পারেনি। নিশ্চল সুনন্দা পাথরের মূর্ত্তির মতো নিষ্প্রাণ, নিরানুভব, ঠাণ্ডা হয়ে থেকেছে। প্রবল ক্লান্তিতে সঞ্জীব কুণ্ডলী পাকিয়ে আশ্রয়প্রার্থী কুকুরের মতো চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তে চেয়েছে। কিন্তু সুনন্দা মনে করিয়ে দিয়েছে যে, এইটুকু দাবিও আজ তার আর নেই। কারণ, তার আদরের 'নন্দিনী আজ মৃত।'[২৭৪] (বিয়ের পর সঞ্জীব রবি ঠাকুরের 'রক্তকরবী'র নন্দিনী'র নামে তাকে আদর করে ডাকতো।) সঞ্জীব মরীয়া হয়ে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। একটা বোঝা-পড়ায় আসতে চেয়েছে। তাতে ক্রোধে সুনন্দার চোখের তারা হয়েছে পিঙ্গল, কণ্ঠস্বর হয়েছে ধারালো। অসহ্য ঘৃণায় সে সঞ্জীবকে 'খুনী' বলে অভিযুক্ত করেছে। শেষে বাক্যবাণে বিদ্ধ সঞ্জীব মরীয়া হয়ে তার আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার কথা জানিয়েছে, কিন্তু পরিবর্তে হৃদয়হীন পরিহাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। তবু সঞ্জীব ভিক্ষুকের মতো এতটুকু আশ্রয়, বেঁচে ওঠার আরেকটু সুযোগ প্রার্থনা করেছে। কিন্তু সুনন্দার দৃষ্টি হয়েছে ঠাণ্ডা, হিংস্র সাপের মতো নিষ্পলক। সঞ্জীবের জন্য ঘর ও জীবনের এতটুকু উত্তাপ সে আর অপচয় করতে চায়নি।

বাইরে শীতের অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে নীড়হারা একটা পাখিও ঠিক সঞ্জীবের মতো সুনন্দার জীবনোত্তাপে ভরপুর জানলায় মাথা খুঁড়েছে। কিন্তু সুনন্দা নরম হয়নি। পাখীটাকে দেখে সঞ্জীবও বুঝেছে তার এখানে আশ্রয়ের আশা দুরাশামাত্র। তবু বেঁচে থাকার জান্তব তাগিদে সে বসে থেকেছে।

এতক্ষণে সুনন্দাও তার ঘৃণার আড়াল সরিয়ে মানুষটার দীন-হীন রুগ্ন অবস্থাকে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সঞ্জীবের হীনতা তার ক্রমসঞ্চিত করুণার কণাকে হৃদয়-জ্বালায় পরিবর্তিত করেছে। সে সঞ্জীবকে চরম আঘাত হেনে দূর করতে চেয়েছে মিথ্যার অস্ত্রে— 'আমার স্বামীর ফেরার সময় হয়ে গেছে।'[২৭৫] একদিন সঞ্জীব তাকে অবহেলা করে পরকীয়া লীলায় মেতেছিল, তাই

আজ সুনন্দা তাকে বোঝাতে চেয়েছে যে, সঞ্জীবের জীবনে যেমন দুজন নারী এসেছে, তার জীবনেও তেমনি আরও পুরুষ এসে থাকতে পারে। এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয়ে সে যেন মনের জ্বালা মিটোতে চেয়েছে। কিন্তু শীতল মৃত্যুর মুখে প্রত্যাখ্যাত সঞ্জীব যখন টলতে টলতে এগিয়ে গেছে, তখন সুনন্দার এতক্ষণের জোর করে চেপে রাখা নারীর কোমল হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। সে বলেছে 'ফিরে এসো, আমি নন্দিনী তোমায় ডাকছি।'[২৭৬] তাই গল্পের শেষে আলো-উত্তাপের আহ্বানে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে 'সেই পাখিটা'। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মানতে হবে যে, গল্পটির সমাপ্তি অতিনাটকীয় ও সুনন্দার আহ্বান অতিরিক্ত আবেগ ও কাব্যময়তার দোষে দুষ্ট।

এ গল্পে পাখি সঞ্জীবের রূপক মাত্র। আশ্রয়প্রার্থী গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা, মান-অভিমান, লম্পট স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা আর সেই ঘৃণা ও অভিমানের আড়ালে লুকোনো মমতা-চিরন্তন নারী প্রকৃতির জয়ের কথাই ঘোষণা করেছে।

গল্পটিতে চরিত্র মাত্র দু'টি। ঘটনা বহুলও নয় গল্পটি। তাই গল্পটি একঘেয়ে। কিন্তু হৃদয়-দ্বন্দ্বই গল্পটিকে টেনে নিয়ে গেছে। গল্পটিতে চরম মুহূর্তে এসেছে সঞ্জীবকে ডেকে আশ্রয় দেবার সময়। আর গল্পের নামকরণ অবশ্যই রূপক-সাঙ্কেতিক।

সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে —

সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে উতরোল সাগরের সৌন্দর্যকে পাগলের মতো ভালবাসা যায়। কিন্তু সাগরের গভীর জলে গিয়ে পড়লে, কোন কূল, কোন তল খুঁজে পাওয়া যায়না।

এই গল্পে ঠিক এমনই ঘটেছে। বিয়ের আগে পর্যন্ত দূর থেকে যে সম্পর্ক ছিল সুন্দর, মধুর; বিয়ের পর সেখানে এসেছে অনিশ্চয়তা, ভীতি। বিশাল ধনীর পুত্র অংশু তার বাবার অধীনে কর্মরত এক সামান্য কর্মচারীর কন্যা হিমানীকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে যখন তারা বেরিয়েছে, তখন আমের মুকুল যেন সোনা হয়ে গেছে, নিমপাতা সোনার কুচির মতো ঝরে পড়েছে মনের রঙে মিশে। কিন্তু এ রঙ মিলাতে সময় লাগেনি। হিমানীর সংশয়াকুল মনে প্রশ্ন জেগেছে 'কতক্ষণ থাকবে এই সোনা?'[২৭৭] সে শিউরে উঠেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের পরে সে দেখেছে লোহার শক্ত রেলিং ও তার ওপারে কঠিন, উদ্ধত, হৃদয়হীন বাস্তব কলকাতা। তাই স্বপ্নের ঘোর কাটতে দেরি হয়নি। উৎসব-মুখর শৌখিন রেস্তোরাঁতে বসেও চা রুটি ছাড়া আর কিছুই তার গলা দিয়ে নামেনি।

নির্জনতা পেতেই পুরুষ অংশু হিমানীর হাত টেনে নিয়েছে নিজের মুঠোর উত্তাপে।

কিন্তু নিজের অজান্তেই হিমানী কথা দিয়ে আঘাত করেছে অংশুকে। ফলে স্বপ্নের ঘোর কেটে গিয়ে অংশুরও মুখের রং বদলেছে, কপালে পড়েছে ছায়া, মুঠো এসেছে আলগা হয়ে। তবু হিমানী যখন তাদের জীবনের আসন্ন ঝড়ের কথা বলেছে, অংশু তার পৌরুষ দিয়ে প্রাণপণে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি জোর দিয়ে, ঠিক যেমন জোর দিয়ে সে বিয়ের ফর্মে সই করেছিল। আসলে সে এই বিশেষ দিনটিতে নিজেকে অনেক বেশি স্পর্ধার সঙ্গে 'পৃথিবীর কাছে ঘোষণা'[২৭৮] করতে চেয়েছে। নিজের সীমিত শক্তির সীমাবদ্ধতা জানে বলেই প্রাণপণে জোর করে অস্বীকার করতে চেয়েছে। কিন্তু বিয়ের ফর্মে সই করবার পরই সে অনুভব করেছে অসীম ক্লান্তি, অবসাদ ও নিরুপায় শক্তিহীনতা। উদ্দাম শক্তির যে উন্মাদনা তাকে এতদিন দৌড় করিয়েছিল, তা নিঃশেষিত হয়ে গেছে শিথিল অবসাদে। লেখকের ভাষায় 'যেন অনেকখানি পথ উল্কাবেগে ছুটে গিয়ে একটা দুরন্ত বুনো ঘোড়া এখন থুবড়ে পড়েছে মাটিতে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে তার।'[২৭৯] মোহভঙ্গ হয়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে অংশু অনুভব করেছে যে, সাজিয়ে কথা বলার, রাঙিয়ে কথা বলার দিন গেছে ফুরিয়ে।

তবু অংশু আবেগ ও কামনায় জ্বলে উঠে হিমানীকে নিয়ে রাত কাটাতে চেয়েছে দামী হোটেলে। কিন্তু তার এই প্রস্তাবে অমানুষিক ভয়ে শিউরে উঠেছে হিমানী। তার এই ভয় অংশুর ভিতরকার সমস্ত আবেগ ও আবেশকে মুহূর্তে নষ্ট করে দিয়েছে। নির্মম বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে সে। বাড়ি না ফিরলে বাবার ব্যাকুলতা, হোটেলের বয়দের চোখে অশ্লীল কৌতূহল এসবের কথা ভেবে অক্ষম ক্রোধে সে ফেটে পড়েছে। বাড়িতে কৈফিয়ৎ দেবার ভয়ে হিমানী তার স্বামীর দেওয়া গয়না বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়নি। হতাশ অংশু হিমানীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে অপরিসীম ক্লান্তিতে স্টেশনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর রিক্সা করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হিমানী হঠাৎ এক চরম সত্যকে আবিষ্কার করেছে— ভয় তাদের অভিভাবক, সমাজ বা শাণিতচক্ষু পৃথিবীকে নয়, ভয় 'তার আর অংশুর নিজের মধ্যেই।'[২৮০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যর মতো সেও বুঝেছে, অনেক মানুষের ভীড়ে তারা এতদিন দুজনে দুজনাকে সম্পূর্ণ করে দেখেনি। সেই না দেখাটুকুকে ঘিরেই স্বপ্নের মোহজাল বিস্তার করেছে। কিন্তু আজ যখন সমস্ত আড়াল সরিয়ে দুজনে একান্ত হয়েছে, হিমানীর আশঙ্কা হয়েছে তাদের এই আড়ালহীন, বাধাহীন একান্ত নগ্নতাকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তারা সহ্য করতে পারবে কিনা।

গল্পের শেষে একটা অনিশ্চিত সত্য বা সম্ভাব্য আশঙ্কাকে লেখক ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন হিমানীর সিঁদুর

মোছার সাথে সাথে যন্ত্রণার বিদ্যুৎ-প্রবাহে।

গল্পটিতে পুরুষ-নারীর জটিল সম্পর্ক— জটিল মনস্তত্ব বর্ণিত। বিবাহের আগে ও পরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপান্তর এ গল্পে স্পষ্ট। সেইসঙ্গে নারী-পুরুষের সম্পর্ক গঠনে সমাজের প্রভাব অবশ্যই কাজ করেছে। গল্পের গঠন সুদৃঢ়, ভাব একমুখী. নামকরণ ব্যঞ্জনাময়। গল্পটি নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও সম্পর্কের সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত। গল্পটির ভাষা সহজ-সরল-সাবলীল। গল্পটির নামকরণ ইঙ্গিতগর্ভ। সমুদ্রের মতো জীবনেরও মনের রহস্যময়তা এবং সমাজের অজানা বিপদের তরঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে অসহায়ের মতো এ গল্পের নায়ক-নায়িকা।

কাণ্ডারী —

দাম্পত্য জীবনের জটিলতা, হীনমন্যতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস— সব এই গল্পে ধুয়ে মুছে গেছে ছোট্ট একটি ব্যাপারে; দুর্গম পথের কাণ্ডারী অখিল ঘোষ স্ত্রীর অনুরোধে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে মুহূর্তে অনুভব করেছেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর জীবন-তরীরও কাণ্ডারী।

কুশ্রী বয়স্ক অখিল ঘোষ মনে করতেন তাঁর সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর ভালবাসা তিনি পাননি। চেহারা ও বয়স সম্পর্কিত হীনমন্যতাবোধ এই ধারণার পেছনে অবশ্যই কাজ করত। যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করে সর্বদা মনে করতেন যে, এমন রূপসী, যুবতী স্ত্রীর ভালবাসা পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এইখানেই ভুল করেছিলেন অখিল ঘোষ। তিনি বোঝেননি যে, ভালবাসা কোন যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া তাঁর নিজের কিছু গুণ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অচেতন। শুভদৃষ্টির সময় তাঁর কুৎসিত চেহারা দেখে স্ত্রী অলকা কেমন আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছিল, সেই স্মৃতি অখিল বাবুকে যন্ত্রণা দেয়। তবু বৃথাই ঐশ্বর্যে স্ত্রীর মন ভোলাবার চেষ্টা করেন অখিলবাবু। আর হতাশ হয়ে এ সত্য টের পান যে, টাকা দিয়ে পেশাদারী প্রেম কেনা যায়, পরস্ত্রীর অনুগ্রহ পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে পাওয়া যায় না। 'সংসারে নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়া বোধহয় সবচাইতে কঠিন।'[২৮১] কেননা, সংসারে অভ্যাসের স্বীকৃত চুক্তি চলে, কিন্তু অনিচ্ছুক দাম্পত্য-জীবনে জ্যোতির্ময় স্নিগ্ধ প্রেম আসে না।

তাই নিরুপায় আক্রোশে অখিল ঘোষের গাড়িটাকে পাহাড়ী খাদে উল্টে দিয়ে তাঁর স্ত্রী অলকা, জ্ঞাতিভাই প্রতাপকেও নিজের সঙ্গে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে। নিজের স্ত্রী ও প্রতাপকে তিনি সন্দেহ করতে চান। কিন্তু জানেন এ সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই। তাই তাঁর যন্ত্রণা আরও বাড়ে। সন্দেহ করতে পারলে আত্মদহনের সাথে সাথে আত্মতৃপ্তিও হত। তুচ্ছতম উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর আদিম নিষ্ঠুর পৌরুষকে স্পর্ধার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু এভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার উপায়ও তাঁর নেই অলকার কাছে। অখিলবাবু জানেন, প্রতাপকে অলকা কখনো ভালবাসবেনা। কিন্তু প্রতাপের অপরাধ এইযে, তার বয়স কম, চেহারা সুদর্শন, গানে গলা মিষ্টি এবং সে টেনিস-প্লেয়ার। তাই অখিল ঘোষের আশঙ্কা অলকা হয়তো পাশাপাশি তাদের দুজনকে দেখে তাদের চেহারা, বয়স, কালচারের তুলনা করে মনে মনে স্বামীকে ঘৃণা করছে। তাই গাড়ি এ্যাক্সিডেন্ট করে তিনজনকে তিন তাল মাংসপিণ্ডে পরিণত করার ইচ্ছে অখিলবাবুর বারবার হয়। কিন্তু তিনি ভালো ড্রাইভার। পাহাড়ী রাস্তার দুর্গম পথেও গাড়ি চালান 'নিখুঁত শিল্পী'র[২৮২] মতো। তাই স্বামী অখিল ঘোষ যা চান, শিল্পী অখিল ঘোষ তা পারেননা। ইতিমধ্যে গাড়ি গরম হয়ে গেলে প্রতাপ জল আনতে যায়। আর ভীত স্ত্রী অলকা পাহাড়ী পথের ভয়ঙ্করতার কথা বলে। এইসময় অখিল ঘোষ প্রশ্ন করেন 'শুধু ভয়ানকটাই দেখলে? এর রূপটা দেখতে পেলেনা?'[২৮৩] এ যেন অখিল ঘোষের তাঁর নিজের সম্পর্কেই প্রশ্ন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে রবি ঠাকুরের 'রাজা' নামক রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের কথা। সেখানেও রাণী সুদর্শনা রাজার বাইরের বীভৎস চেহারা দেখে শিউরে উঠেছিল।

প্রতাপ ও অলকার ছোট-খাটো রসিকতা অখিলবাবুকে বিদ্ধ করে। কিন্তু এরপর প্রতাপ নিজে গাড়ী চালাবার প্রস্তাব করলে অলকা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর প্রতাপ যখন অ্যাক্সিডেন্ট করতে করতে কোনরকমে সামলায়, অলকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে -'খালি টেনিস খেলতে পারলে আর গান গাইলেকি সব পারা যায় সংসারে? ও যার কাজ তার হাতেই দাও ঠাকুরপো।'[২৮৪]

তাঁর প্রতি স্ত্রীর এই নির্ভরতা, তাঁকে নিয়ে স্ত্রীর এই গর্ব দেখে চমকে ওঠেন অখিল ঘোষ। তাঁর চোখ থেকে 'ছানির মতো কী যেন'[২৮৫] সরে যায়। এতদিন সন্দেহে, সঙ্কোচে, ঈর্ষায় তাঁর চোখের দৃষ্টি আবিল হয়েছিল। আজ এই একটিমাত্র কথায় তাঁর চোখের দৃষ্টি হয়ে ওঠে স্বচ্ছ। অখিল ঘোষ এসে বসেন কেবল গাড়ির চালকের আসনে নয়, স্ত্রীর জীবন-পথের চালকের 'কাণ্ডারী'র আসনে।

গল্পটিতে নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। কিন্তু এ গল্পের মতো নারায়ণবাবুর একাধিক গল্পে এ সমস্যাও জটিলতার জট খুলেছে চরম বিপদের মুহূর্তে নারীর নির্ভরতা ও পুরুষের ত্রাতার ভূমিকায়। নারায়ণবাবুর 'ধস্' গল্পতেও বেকার স্বামীর হীনমন্যতাজনিত নার্ভাস ব্রেকডাউন সেরে গেছে, তার পৌরুষ জেগে উঠেছে ধস্ নামার সময়ে তার স্ত্রীর আর্তনাদে। সে অবতীর্ণ হয়েছে ত্রাতার ভূমিকায়। আর বিশাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও তার স্ত্রীর প্রতি কামনাময়

রণজিৎ কিন্তু এই ত্রাতার ভূমিকায় নামতে পারেনি। কারণ, 'দাম্পত্য-জীবনের যে প্রেম তিলে তিলে সংগ্রহ করেছে সূর্য আর নক্ষত্রের অগ্নিকণা তাই এখন বজ্রপ্রদীপ হয়ে জ্বলছে ভবতোষের রক্তে। কিরণলেখাকে সে-ই বাঁচাবে, সে-ই শুধু বাঁচাতে পারে।'[২৮৬] এ সত্য উপলব্ধি লুকিয়েছিল কিরণলেখার হৃদয়ের গভীরেও। তাই পুরুষালী চেহারার, শক্তির দম্ভে ভরপুর কিরণলেখা বিপদের সময় তার স্বামীকেই স্মরণ করেছে। মুহূর্তে কেটে গেছে তাদের দাম্পত্য-জীবনের দীর্ঘ শীতলতার অধ্যায়। পুরুষের প্রতি নারীর নির্ভরতা, আর নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ববোধ- যথাক্রমে নারীর নারীত্ব ও পুরুষের পৌরুষত্ব জাগিয়ে তুলেছে এসব গল্পে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভূমিকম্প' নামক গল্পটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সেখানেও ভূমিকম্পের সংকটময় পটভূমিতে নারী-পুরুষের প্রেম বিশ্বাস - নির্ভরতা ও দায়িত্ববোধ জেগে উঠেছে। 'কাণ্ডারী' গল্পটিতে ভাবের একমুখিতা রক্ষিত হয়েছে। দাম্পত্য-সমস্যা ও তার সমাধানের দিকে ক্রমে অগ্রসর হয়েছে গল্পটি। অবশ্য এই সমাধান ঘটেছে নাটকীয়ভাবে। গল্পটির ভাষা সুন্দর — তাৎপর্যময়। গল্পটির নামকরণও যথাযথ। প্রতিটি স্বামীই তাদের স্ত্রীদের জীবনের 'কান্ডারী' — এই ইঙ্গিতগর্ভ সত্যটিই এগল্পের নামকরণে ফুটে উঠেছে।

বনবিড়াল —

এ গল্পে সমাজ-শাস্ত্রকে অস্বীকার করে বন্য প্রেম মাথাচারা দিয়ে উঠেছে পুরুষ ও নারীর মধ্যে। তাই স্বামী মাখনের ঘর ছেড়ে দুলারী বরণ করেছে বীরুয়াকে। চোর মাখনকে ঘৃণা করে একদিন দুলারী ঘর ছেড়েছিল, অথচ সেই দুলারী তার প্রেমিক বীরুয়াকে মাংসের সুরুয়া খাইয়ে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পায়রা চুরি করেছে। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম — সবকিছুর ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নর-নারীর প্রেম।

যখন চোর মাখনের ঘর করতে চায়নি দুলারী, তখন শিক্ষিত যুবক রঞ্জন হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে, আর্যধর্মের সারগর্ভ সম্পর্কে দুলারীকে সচেতন করতে চেয়েছে স্ত্রী হিসেবে তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে। কিন্তু 'বিদ্রোহিনী' তাতে কিছুমাত্র টলেনি। আর শিক্ষিত যুবক রঞ্জন আর্যত্বের ভুয়ো নৈতিকতাকে ব্যঙ্গ করে ভেবেছে, দুলারী অনার্য নারী বলেই 'আমাদের আত্মঘাতী নেশাগুলিকে'[২৮৭] আয়ত্ত করেনি, ওর সহজ সরল প্রাণশক্তিকে পরকালের বিভীষিকা দেখিয়ে ভূপতিত করা যাবে না। দুলারীর প্রাণশক্তিকে সত্যিই ধরে রাখা যায়নি। সে স্বামীকে ছেড়ে বাঁদর-নাচিয়ে বীরুয়ার সঙ্গে ভেগেছে। ব্যাপার দেখে রঞ্জন ভেবেছে 'ভালবাসার ধর্মইতো এই। চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই উদ্‌যাপিত হয় তার অতি কঠিন ব্রত। মাখনের কাছে থাকলে অন্নবস্ত্রের ভাবনা ছিলনা। কিন্তু ওর নারীত্ব পদে পদে খর্ব হত, লাঞ্ছিত হত। তাই সমাজ সংসার জাতি-ধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে সর্বত্যাগের মধ্যে ওর নারীত্ব মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছে।'[২৮৮]

এ গল্পে চোর, নোংরা পিচুটি-মাখা, মেয়েলী কান্নার ছলনায় অভ্যস্ত স্বামী মাখনের প্রতি দুলারীর ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। অন্যদিকে বীরুয়ার শৌখিনতা, সাহস-পৌরুষ তাকে আকর্ষণ করেছে। নিরাপত্তা, সুনাম, জাতি-ধর্ম সব ছেড়ে নারীরাই অমন করে পুরুষকে ভালবাসতে পারে। আর এ ভালবাসা এমনই প্রবল হয়েছে যে, যে চুরিকে ঘৃণা করত, বীরুয়ার শরীর সারাবার জন্য সেই চুরি করতেও তার বাধেনি। বনবিড়াল ভেবে রঞ্জন তাকে গুলি করলে সে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। আসলে বড় প্রেমের কাছে তার সব আদর্শই ভেসে গেছে। নারীর প্রেমান্ধ রূপটি এ গল্পে স্পষ্ট। এ গল্পেও নর-নারীর প্রেমের ত্রিভুজ আছে। স্বামী মাখন মেয়েদের মতো কেঁদে দুলারীকে ফেরাতে চেয়েছে। কিন্তু বীরুয়ার আকর্ষণ দুলারীকে চুম্বকে লোহা টানার মতো টেনে নিয়েছে। পুরুষ-নারীর চিরন্তন আকর্ষণ এ গল্পে স্পষ্ট। পৌরুষের জোরহীন মেয়েলী পুরুষের প্রতি নারীর ঘৃণাও সুস্পষ্ট। দুলারীর রূপান্তর এ গল্পে ঘটেছে অনিবার্যভাবেই। সমাজ ও শাস্ত্র-কথিত নিয়ম-ন্যায়-নীতির অনেক উপরে নর-নারীর-প্রেম এ গল্পে প্রতিষ্ঠিত। উত্তম-পুরুষে কথিত হওয়ায় গল্পটির বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। গল্পটিতে চরম মুহূর্তে এসেছে বন্দুকের গুলির আঘাতে দুলারীর আর্তনাদের সময়।

'বনবিড়াল' নামকরণের মাধ্যমে দুলারীর সমাজের বাধা নিষেধ না মানা বন্য-প্রেমের স্বরূপই উদ্ভাসিত হয়েছে।

ছলনাময়ী —

গল্পটিতে রহস্যময়ী নারী কিভাবে পুরুষের জীবনকে বারবার বদলে দেয়, তারই কাহিনী আছে। এ গল্পে নারীকে কেন্দ্র করেই দুই ভণ্ড সন্ন্যাসীর মিলন হয়েছে, আবার নারীকে কেন্দ্র করেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে।

গল্পের প্রথমে নারীর ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘর ছেড়ে একই দুঃখে দুঃখী হয়ে, একই ঘৃণায় জ্বলে উঠে ভৈরবানন্দ ও ভূমানন্দের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে দেরি হয়নি। আবার গল্পের শেষে এক ভৈরবীর মোহে পড়ে খুনোখুনি কাণ্ড করে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হিংসায় জ্বলে উঠে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেও তাদের সময় লাগেনি। ছলনাময়ী নারী তাদের বারবার বিভ্রান্ত করেছে।

আসলে নারীর দ্বারা প্রতারিত হয়েও পুরুষের শিক্ষা হয়না। নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সহজাত। আদিম কামনা তাদের

বারবার বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয়। ছলনাময়ী নারীর হাতছানিতে সাড়া না দিয়ে পুরুষ পারেনা।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের এই অমোঘ সত্যটিকে খুব লঘু কৌতুকের ছলে এ গল্পে প্রকাশিত করা হয়েছে। ভৈরবানন্দ ও ভূমানন্দের ভণ্ডামির প্রতি লেখকের কটাক্ষ অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু সহজ কৌতুকের জাদুস্পর্শে এ কটাক্ষ সরোষ নয়, সুরস কটাক্ষে পরিণত হয়েছে। গাঁজা, মদ, মেয়েমানুষ সবকিছুর প্রতি এই দুই সন্ন্যাসীর আকর্ষণ। মড়ার খুলি খেতেও তাদের অরুচি নেই। মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে— গাঁজায় দম দিতে দিতে তারা শ্মশানঘাটে অর্ধনগ্না নারীর স্নান দৃশ্য উপভোগ করে। নবাগতা ভৈরবীকে দেখে এই দুই সন্ন্যাসীর মেয়ে-মানুষের প্রতি ঘৃণা গেছে চলে, পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে তারা আবার নারীর মোহজালে আট্‌কা পড়েছে। আর তাদের এতকালের ঘণিষ্ঠ বন্ধুত্ব গেছে টলে। ভৈরবীকে কেন্দ্র করে চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে। ফলে একজন ভৈরবীর সঙ্গে রঙ্গ-রসালাপ করলে অন্যজন কটমট করে তাকিয়েছে ও পরিশেষে ভৈরবানন্দ হিংস্র জন্তুর আদিম ক্ষুধা নিয়ে ভৈরবীকে রাতের অন্ধকারে ভোগ করতে চাইলে ভূমানন্দ তার ওপরে লাফিয়ে পড়ে খুনোখুনি বাধিয়ে দিয়েছে। আর গল্পের শেষে লেখক বলেছেন— 'নারী ছলনাময়ী। ইহাদের দুইজনকে যত সহজে কাছে টানিয়া আনিয়াছিল, তত সহজেই অবলীলাক্রমে আবার দূরে সরাইয়া দিল।'[২৮৯]

লক্ষণীয়, গল্পটি সাধুভাষায় লেখা। আসলে সাধুভাষার গুরুগম্ভীর চালে কৌতুকের রস উপ্‌চে পড়ে বেশি; যেমন ভারি জুতার চাপে বৃষ্টিতে কাদায় জমা জল ছিট্‌কে পড়ে বেশি তীব্র বেগে, তেমনি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রায় সকল সুরসিক লেখকই সাধু ভাষার সাহায্যে কৌতুক-রস পরিবেশন করেছেন।

গল্পটির চরিত্রগুলি জীবন্ত। ভাব একমুখী। কাহিনী কখনো মূল বিষয় থেকে সরে যায়নি। ঘনগম্ভীর গুরু মেঘের ঘনঘটায় চপলা বিদ্যুৎ যেমন মুহূর্তে চতুর্দিক আলোকিত করে তোলে, তেমনি সাধুভাষার গুরুগম্ভীর চালে পরিবেশিত চপল কৌতুক-রস মুহূর্তে গল্পের মূল বক্তব্যকে— নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিশেষ দিকটিকে আলোকিত করেছে। সমস্ত ভণ্ড সন্ন্যাসীর স্বরূপও এ গল্পে উদ্‌ঘাটিত। সরল অথচ রসসিক্ত এ গল্প কৌতুকে রঞ্জিত, বিষয়-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। গল্পটির নামকরণও সার্থক। 'ছলনাময়ী' নারীই এ গল্পের ঘটনার নিয়ন্তা। আর নারীর 'ছলনাময়ী' রূপতো যুগে যুগে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'এই নামে তারাশঙ্করেরও একটি গল্প আছে। পরিবেশ ও চরিত্রগত পার্থক্য থাকলেও বক্তব্যগত মিল দুর্লক্ষ্য নয়।'[২৯০]

উৎসপঞ্জী

১। সুস্নাত দাশ ঃ 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ৭১

২। অলোক রায় ঃ 'গল্পের সন্ধানে গল্পকার' ঃ ঐ পৃঃ ১৫

৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কী নিয়ে কাকে নিয়ে গল্প' ঃ 'অমৃত' পত্রিকা, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭; ১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড

৪। সুস্নাত দাশ ঃ 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ৬৬

৫। বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' ঃ ঐ পৃঃ ৮৪

৬। সুচিত্রা সেনচন্দ্র ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ঃ 'সময়ের দর্পণ' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত ' সাহিত্য ও সংস্কৃতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৪৪১

৭। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৯, পৃঃ ৬১৬

৮। নৃপেন্দ্র গোস্বামী ঃ 'পরিচয়' ঃ চৈত্র, ১৩৫৩

৯। গোপাল হালদার ঃ 'কালি ও কলম' অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এর ভূমিকা ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ৬

১১। বারীন্দ্রনাথ দাশ ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সেই কবেকার কথা' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত ঃ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা, — মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮

১২। অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত ঃ 'কল্লোলযুগ' ঃ প্রঃ প্রঃ ১৩৫৭, পৃঃ ৩২৭ থেকে সংগৃহীত

১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্যে ছোটগল্প' ঃ প্রঃ প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ২৮৪

১৪। ঐ পৃঃ ২৯১

১৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আলেয়ার রাত' ঃ রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩১৫, পৃঃ ৩৪৭

১৬। ঐ

১৭। ঐ পৃঃ ৩৫২

১৮। ঐ পৃঃ ৩৫৮

১৯। ঐ পৃঃ ৩৬৭

২০। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩; পৃঃ ২২

২১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বনজ্যোৎস্না' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭, পৃঃ ৪৯৮

২২। ঐ পৃঃ ৪৯৯

২৩। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৩; পৃঃ ২২

২৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বনজ্যোৎস্না' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭, পৃঃ ৫১১

২৫। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৩, পৃঃ ২২

২৬। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শ্রাবন-আশ্বিন ১৩৭৭, পৃঃ ২৬১

২৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি চিঠি' ঃ রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১, পৃঃ ৩৬৪

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'বিষবৃক্ষ' ঃ প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রঃ প্রঃ ১৩৬০ পৃঃ ১৮৮

২৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি চিঠি' ঃ রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১, পৃঃ ৩৬৪

৩০। ঐ পৃঃ ৩৬৫

৩১। ঐ পৃঃ ৩৬৬

৩২। ঐ পৃঃ ৩৬৬

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'চন্দ্রশেখর' ঃ প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রঃ প্রঃ ১৩৬০, পৃ ঃ ৩০১

৩৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শুভক্ষণ' ঃ রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩৯১, পৃ ঃ ৩৮২

৩৫। ঐ পৃঃ ৩৮২

৩৬। ঐ পৃঃ ৩৮৫

৩৭। ঐ পৃঃ ৩৮৫

৩৮। ঐ পৃঃ ৩৮৭

৩৯। ঐ পৃঃ ৩৮৯

৪০। ঐ পৃঃ ৩৮৮

৪১। রথীন্দ্রনাথ রায় ঃ 'ছোটগল্পের কথা' প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯; পৃঃ ১৭৫

৪২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সুখ' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড; প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ৩৩১

৪৩। ঐ পৃঃ ৩৩০

৪৪। ঐ পৃঃ ৩৩১

৪৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'প্রতিপক্ষ' ঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩৯৪; পৃঃ ১৫৩

৪৬। ঐ পৃঃ ১৫৫

৪৭। ঐ পৃঃ ১৫৬

৪৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আত্মহত্যা' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৪২৬

৪৯। ঐ পৃঃ ৪৩৪

৫০। ঐ পৃঃ ৪৩৪

৫১। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এর ভূমিকা ঃ প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ১১

৫২। ঐ পৃঃ ১২

৫৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দুর্ঘটনা' ঃ জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ' প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ১৭২

৫৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'অমনোনীতা' ঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন ১৩৯৪, পৃঃ ১৯৪

৫৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কুয়াশা' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ২৮০

৫৬। ঐ পৃঃ ২৮৪

৫৭। ঐ পৃঃ ২৯০

৫৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উর্বশী' ঃ 'সঞ্চয়িতা' প্রঃ প্রঃ পৌষ ১৩৩৮, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২৫০

৫৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শেষচূড়া' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪; পৃঃ ২৫৪

৬০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শেষচূড়া' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ২৫৬

৬১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'লাল ঘোড়া' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ পৃঃ ২৪৭

৬২। ঐ পৃঃ ২৪৪

৬৩। ঐ পৃঃ ২৪৬

৬৪। ঐ পৃঃ ২৪৭

৬৫। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭; পৃঃ ২৬০

৬৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আমার কথা' ঃ 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য' প্রথম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জানুয়ারী ১৯৭৮, পৃঃ ৩

৬৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'রিবনবাঁধা ভালুক' ঃ রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ভাদ্র ১৩৯১, পৃঃ ২৮৪

৬৮। ঐ পৃঃ ২৮৯

৬৯। ঐ পৃঃ ২৮৯

৭০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কালপুরুষ' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯০, পৃঃ ৫৭২

৭১। ঐ পৃঃ ৫৬৭

৭২। ঐ পৃঃ ৫৭০

৭৩। সুচিত্রা সেনচন্দ্র ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ 'সময়ের দর্পণ' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৪৪১

৭৪। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৩, পৃঃ ২১

৭৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ভাঙ্গা বন্দর' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬, পৃঃ ৩৫৭

৭৬। ঐ পৃঃ ৩৫৯

৭৭। ঐ পৃঃ ৩৬৫

৭৮। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, নারায়ণ গাঙ্গুলি স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭ পৃঃ ২৬১

৭৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'উস্তাদ মেহের খাঁ' ঃ রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, পৃঃ ৪২১

৮০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'- এর ভূমিকা ঃ প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ১৫

৮১। ঐ পৃঃ ১৪

৮২। ঐ পৃঃ ১৫

৮৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'মমি' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬; পৃঃ ৪৯৭

৮৪। ঐ পৃঃ ৫০০

৮৫। ঐ পৃঃ ৫০৪

৮৬। ঐ পৃঃ ৫০৫

৮৭। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা ঃ প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১; পৃঃ ১৪

৮৮। ঐ পৃঃ ১৪

৮৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সৈনিক' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫৭৬

৯০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সৈনিকি' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫৭৫

৯১। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা ঃ প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ১৩

৯২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'মর্গ' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৮৭; পৃঃ ৪০৫

৯৩। ঐ পৃঃ ৪০৯

৯৪। ঐ পৃঃ ৪১১

৯৫। ঐ পৃঃ ৪১১

৯৬। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭, পৃঃ ২৬১

৯৭। সুচিত্রা সেনচন্দ্র ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ঃ সময়ের দর্পণ' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮ পৃঃ ৪৪১

৯৮। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ পৃঃ ১০

৯৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বনতুলসী' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৮৭ পৃঃ ৫২০

১০০। ঐ পৃঃ ৫২১

১০১। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১; পৃঃ ১৭

১০২। ঐ পৃঃ ১৮

১০৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হাত' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৮৭ পৃঃ ৪৭৪

১০৪। ঐ পৃঃ ৪৭৮

১০৫। ঐ পৃঃ ৪৭৮

১০৬। ঐ পৃঃ ৪৭৯

১০৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্যে ছোটগল্প' প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন ১৩৬৫, পৃঃ ২৮৬

১০৮। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭, পৃঃ ২৬০

১০৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বীতংস' ঃ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫১৯

১১০। অলোক রায় ঃ 'গল্পের সন্ধানে গল্পকার' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ১১

১১১। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ পৃঃ ৯

১১২। অলোক রায় ঃ 'গল্পের সন্ধানে গল্পকার' ঃ তাপস ভৌমিক প্রমুখ সম্পাদিত 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ১১

১১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হাড়' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫২৭

১১৪। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭; পৃঃ ২০

১১৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হাড়' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫২৫

১১৬। মানস মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর চিত্র' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮ পৃঃ ৪১৮

১১৭। ঐ পৃঃ ৪১৮

১১৮। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ৯

১১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'নক্রচরিত' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৪২১

১২০। অলোক রায় ঃ 'গল্পের সন্ধানে গল্পকার' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা ১৯৯২ পৃঃ ১২

১২১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নক্রচরিত' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ পৃঃ ৪২২

১২২। ঐ পৃঃ ৪২২

১২৩। মানস মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর চিত্র' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৪১৫

১২৪। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ৮

১২৫। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' ঃ গীতা দাশ সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকা, নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭, পৃঃ ২৬০

১২৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তীর্থযাত্রা' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৩৭৯

১২৭। ঐ পৃঃ ৩৮৩

১২৮। ঐ পৃঃ ৩৮৩

১২৯। ঐ পৃঃ ৩৮৫

১৩০। ঐ পৃঃ ৩৭৯

১৩১। ঐ পৃঃ ৩৭৯

১৩২। ঐ পৃঃ ৩৮৫

১৩৩। ঐ পৃঃ ৩৮৫

১৩৪। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' পত্রিকা, প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩; পৃঃ ২২

১৩৫। ঐ পৃঃ ২২

১৩৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'এক্‌জিবিশান' ঃ রচনাবলী ১১খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন ১৩৯৪, পৃঃ ১৭৩

১৩৭। ঐ পৃঃ ১৭৫

১৩৮। ঐ পৃঃ ১৭৫

১৩৯। ঐ পৃঃ ১৭৫

১৪০। ঐ পৃঃ ১৮০

১৪১। ঐ পৃঃ ১৮১

১৪২। ঐ পৃঃ ১৮১

১৪৩। ঐ পৃঃ ১৮২

১৪৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হলদে চিঠি' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ২৯৭

১৪৫। ঐ পৃঃ ২৯৮

১৪৬। ঐ পৃঃ ২৯৮

১৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'বাঁশি' ঃ 'সঞ্চয়িতা' প্রঃ প্রঃ পৌষ, ১৩৮৮, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৬৫০

১৪৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হলদে চিঠি' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ৩০২

১৪৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তৃণ' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫৪৮

১৫০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তৃণ' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫৫০

১৫১। ঐ পৃঃ ৫৫১

১৫২। ঐ পৃঃ ৫৫২

১৫৩। ঐ পৃঃ ৫৫৩

১৫৪। ঐ পৃঃ ৫৫৭

১৫৫। ঐ পৃঃ ৫৫৭

১৫৬। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' পত্রিকা, প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩ পৃঃ ২০

১৫৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' ঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন ১৩৯৪ পৃঃ ১৬৪

১৫৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নীলা' ঃ রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫৩৩

১৫৯। ঐ পৃঃ ৫৩৯

১৬০। ঐ পৃঃ ৫৩৯

১৬১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ প্রবন্ধ ঃ 'সাহিত্য ও আদর্শ' ঃ (রচনাটি কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপির আকারে প্রাপ্ত, রচনাকাল অজ্ঞাত।)

১৬২। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' পত্রিকা, প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৩

১৬৩। মানস মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর চিত্র' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য

ও সংস্কৃতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮

১৬৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দুঃশাসন' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৪৪৫

১৬৫। ঐ পৃঃ ৪৪৫

১৬৬। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ৮

১৬৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কালনেমি' ঃ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯০, পৃঃ ৪২৭

১৬৮। ঐ পৃঃ ৪২৮

১৬৯। ঐ পৃঃ ৪৩১

১৭০। ঐ পৃঃ ৪৩৮

১৭১। ঐ পৃঃ ৪৩৯

১৭২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ প্রবন্ধ ঃ 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ঃ 'দেশ' পত্রিকা ১৩৬৯, ২০শে পৌষ পৃঃ ১৪৭

১৭৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নিশাচর' রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬, পৃঃ ৫৬২

১৭৪। ঐ পৃঃ ৫৬২

১৭৫। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ লীনা দত্ত সম্পাদিত 'উদিত' পত্রিকা, প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৯৩, পৃঃ ২১

১৭৬। ঐ পৃঃ ২১

১৭৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তিতির' ঃ রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩৯১; পৃঃ ৩৭৮

১৭৮। ঐ পৃঃ ৩৭৫

১৭৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তিতির' ঃ রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩৯১; পৃঃ ৩৭৪

১৮০। ঐ পৃঃ ৩৭৫

১৮১। ঐ পৃঃ ৩৮০

১৮২। আশাদেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'গ্রন্থ পরিচয়' ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ বৈশাখ ১৩৮৭

১৮৩। ঐ

১৮৪। ধ্রুবগোপাল মুখোপাধ্যায় ঃ 'ক্রান্তিকালের কথাশিল্পী' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৩৯২

১৮৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ইতিহাস' ঃ রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৮৭; পৃঃ ৫০৭

১৮৬। ঐ পৃঃ ৫০৮

১৮৭। ঐ পৃঃ ৫০৪

১৮৮। ধ্রুবগোপাল মুখোপাধ্যায় ঃ 'ক্রান্তিকালের কথাশিল্পী' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮ পৃঃ ৩৯১

১৮৯। ঐ পৃঃ ৩৯১

১৯০। ঐ পৃঃ ৩৯৪

১৯১। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৯, পৃঃ ৬১৬

১৯২। ধ্রুবগোপাল মুখোপাধ্যায় ঃ 'ক্রান্তিকালের কথাশিল্পী' ঃ সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতি-সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৩৯৪

১৯৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্যে ছোটগল্প প্রঃ প্রঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৩৯৩

১৯৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ প্রবন্ধ ঃ 'সাহিত্য ও আদর্শ' (রচনাটি কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপির আকারে প্রাপ্ত, রচনাকাল অজ্ঞাত)

১৯৫। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ১৬

১৯৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্য ও আদর্শ' ঃ (হরপ্রসাদ মিত্রের কাছে পাণ্ডুলিপির আকারে প্রাপ্ত)

১৯৭। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১; পৃঃ ১২

১৯৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ভাঙা চশমা' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৪৬৬

১৯৯। ঐ পৃঃ ৪৬৯

২০০। ঐ পৃঃ ৪৬৭

২০১। ঐ পৃঃ ৪৬৭

২০২। ঐ পৃঃ ৪৬৭

২০৩। ঐ পৃঃ ৪৭৩

২০৪। মানস মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর চিত্র' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৪২২

২০৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ভাঙা চশমা' ঃ রচনাবলী ২ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৪৬৫

২০৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ প্রবন্ধ ঃ 'একটি স্কুলের ছবি' ঃ 'সুনন্দর জার্নাল' প্রঃ প্রঃ ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৬

২০৭। ঐ পৃঃ ৫৭

২০৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সঞ্চার' ঃ রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩৯১; পৃঃ ৩০৪

২০৯। ঐ পৃঃ ৩০৫

২১০। ঐ পৃঃ ৩০৬

২১১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'গিলটি ঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩৯৪; পৃঃ ১৯৮

২১২। ঐ পৃঃ ২০১

২১৩। ঐ পৃঃ ২০১

২১৪। ঐ পৃঃ ২০২

২১৫। ঐ পৃঃ ২০২

২১৬। ঐ পৃঃ ২০২

২১৭। ঐ পৃঃ ২০২

২১৮। ঐ পৃঃ ২০৪

২১৯। ঐ পৃঃ ২০৪

২২০। ঐ পৃঃ ২০৫

২২১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দাম' ঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩৯৪; পৃঃ ২২৩

২২২। ঐ পৃঃ ২২৩

২২৩। ঐ পৃঃ ২২৪

২২৪। ঐ পৃঃ ২২৪

২২৫। ঐ পৃঃ ২২৫

২২৬। ঐ পৃঃ ২২৫

২২৭। ঐ পৃঃ ২২৫

২২৮। ঐ পৃঃ ২২৫

২২৯। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ঃ 'মাষ্টারমশাই ঃ ব্যক্তিগত ফাইল থেকে' ঃ 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা ১৯৯২, নারায়ণ গঙ্গোপধ্যায় সংখ্যা, পৃঃ ২২

২৩০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আতিথ্য' ঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩৯৪; পৃঃ ২০৯

২৩১। ঐ পৃঃ ২১০

২৩২। ঐ পৃঃ ২১১

২৩৩। ঐ পৃঃ ২১১

২৩৪। নারায়ণ গঙ্গোপাদ্যায় ঃ 'ইদু মিঞার মোরগ' ঃ রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩৯৮; পৃঃ ১৯২

২৩৫। ঐ পৃঃ ১৯৬

২৩৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি কৌতুকনাট্য' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪; পৃঃ ৩১৫

২৩৭। ঐ পৃঃ ৩১৪

২৩৮। ঐ পৃঃ ৩১৫

২৩৯। ঐ পৃঃ ৩১৭

২৪০। ঐ পৃঃ ঐ

২৪১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি কৌতুকনাট্য' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪; পৃঃ ৩১৮

২৪২। ঐ পৃঃ ঐ

২৪৩। ঐ পৃঃ ৩১৯

২৪৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' ঃ রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, পৃঃ ৪০৬

২৪৫। ঐ পৃঃ ৪০৭

২৪৬। ঐ পৃঃ ঐ

২৪৭। ঐ পৃঃ ৪০৮

২৪৮। ঐ পৃঃ ঐ

২৪৯। ঐ পৃঃ ঐ

২৫০। ঐ পৃঃ ঐ

২৫১। ঐ পৃঃ ঐ

২৫২। ঐ পৃঃ ৪০৯

২৫৩। ঐ পৃঃ ঐ

২৫৪। ঐ পৃঃ ৪১০

২৫৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' ঃ রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, পৃঃ ৪১১

২৫৬। ঐ পৃঃ ঐ

২৫৭। ঐ পৃঃ ঐ

২৫৮। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা ঃ প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ১৫

২৫৯। ঐ পৃঃ ১৫

২৬০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি শত্রুর কাহিনী' ঃ রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৮৭, পৃঃ ৪৮৮

২৬১। ঐ পৃঃ ৪৮৮

২৬২। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা ঃ প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃঃ ১৫

২৬৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি শত্রুর কাহিনী' ঃ রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ বৈশাখ ১৩৮৭, পৃঃ ৪৯৪

২৬৪। মানস মজুমদার ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর-চিত্র' ঃ সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃঃ ৪২৪

২৬৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্যে ছোটগল্প' ঃ প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন ১৩৬৫, পৃঃ ২৮৭

২৬৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তমস্বিনী', রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ পৃঃ ২৬১

২৬৭। ঐ পৃঃ ২৬২

২৬৮। ঐ পৃঃ ২৬২

২৬৯। ঐ পৃঃ ২৭১

২৭০। ঐ পৃঃ ২৭০

২৭১। ঐ পৃঃ ২৭১

২৭২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তমস্বিনী', রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ পৃঃ ২৭১

২৭৩। ঐ পৃঃ ২৭১

২৭৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সেই পাখিটা' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ৫০৬

২৭৫। ঐ পৃঃ ৩১২

২৭৬। ঐ পৃঃ ৩১৩

২৭৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে' ঃ রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃঃ ২৭২

২৭৮। ঐ পৃঃ ২৭২

২৭৯। ঐ পৃঃ ২৭৮

২৮০। ঐ পৃঃ ২৭৯

২৮১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কাণ্ডারী' ঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন ১৩৯৪, পৃঃ ১৬৬

২৮২। ঐ পৃঃ ১৬৯

২৮৩। ঐ পৃঃ ১৬৯

২৮৪। ঐ পৃঃ ১৭১

২৮৫। ঐ পৃঃ ১৭১

২৮৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ধস্' ঃ রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ বৈশাখ ১৩৮৯, পৃঃ ১৬২

২৮৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বনবিড়াল' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৪৭৫

২৮৮। ঐ পৃঃ ৪৭৮

২৮৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ছলনাময়ী' ঃ রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯৬

২৯০। রবিন পাল ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' ঃ 'উদিত' প্রবন্ধ-সংখ্যা, বিষয় ঃ ছোটগল্প, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৯৩, পৃঃ ২২

চতুর্থ অধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্প

কিশোরদের জন্য গল্প রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। যখন তিনি বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প লিখে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তখন হঠাৎ ছোটদের পত্রিকা 'মৌচাক'-এর জন্য তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় — 'বড়দের জন্যই গল্প লিখছিলাম, হঠাৎ একদিন বিশু মুখোপাধ্যায় এসেই ফরমাস করলেন 'মৌচাকে' গল্প লিখতে ছোটদের জন্য। ...... সে দু'একবার লিখেছি কৈশোরে। সে মন কোথায় পাব — ছেলেবেলার সেই খুশির জগৎটাই বা কোথায় পাই। তবু চেষ্টা করা গেল। ... তখন নিজের ছোটবেলায় ফিরে এলাম। স্মৃতির ভেতর থেকে খুঁজে আনতে লাগলাম সেইসব ঘটনাকে — যাদের কথা ভাবলে এখনো তরল হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোনায়। এমন একটি গল্প দিলাম বিশুদাকে। সেই যে মনের ভেতর হাসির স্রোত বইল আজও তা থামল না।'[১]

বস্তুত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোরদের জন্য লিখিত গল্পে হাস্যরসের ধারা পাহাড়ী কোনও নদীর মত। মনের সমস্ত ময়লাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় হাস্যরসের সেই স্রোতধারা, আর পাথরের নুড়িতে লেগে নদীর স্রোত যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি গল্পের বিশেষ বিশেষ অংশে বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশের স্পর্শে হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। নদীর জলে যেমন মানুষের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি বিভিন্ন চরিত্রের ছায়া পড়ে এই হাস্যরসের স্রোতধারায়। জলের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে এই চরিত্রগুলির ছবিও কাঁপে — টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন বহুখ্যাত টেনিদারই টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি মেলে ফুচুদা, হলধরদা প্রভৃতি চরিত্রে।

ফুচুদার চেহারা অবশ্য পিলে-বার-করা প্যালারামের মত; কিন্তু ভোজনরসিক হিসেবে সে টেনিদার কথাই স্মৃতিপটে আনে। বিশেষ করে, ' পরস্মৈপদী লুচি পান্তুয়া'র দিকে তার নজর টেনিদার মতই তীক্ষ্ণ। তাই 'অথ নিমন্ত্রণ ভোজন' গল্পে ফুচুদা পেটপুরে নেমন্তন্ন খাবার জন্য খাওয়া কমিয়ে, শরীর-চর্চ্চা করে খিদে চাগিয়ে তোলে; কিন্তু নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে তাদের দুর্দশার শেষ থাকে না। বর্ষার প্যাঁচপেঁচে কাদায় 'রাধিকাপুরের চম্'-এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে 'দম্' করে ফুচুদা, প্যালা আর ন্যালা— তিন মূর্ত্তি আছাড় খেয়ে ভূত হওয়ার ঘটনা স্বতস্ফূর্ত হাসির ফোয়ারার উৎস খুলে দেয়। সেই হাস্যরসের হিল্লোল তোলে ফুচুদার রচিত অভিনব সংস্কৃত শাস্ত্র 'পেটার্থসংহিতা'। গল্পের শেষ মুহূর্তে কুকুরের আবির্ভাবে এই তিন ব্রাহ্মণের খাওয়া নষ্ট হয়ে তাদের কি করুণ অবস্থা হয়, তা লেখক নির্মল হাস্যরসের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এই গল্পে ব্রাহ্মণদের মিথ্যা আচারের ভড়ং ও ভোজনের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণকে লেখক সকৌতুক কটাক্ষ করতেও ভোলেন নি।

ফুচুদার গল্পের ব্যাপারে একটি কথা অবশ্যই চোখে পড়ার মত। প্রথমে প্যালারামের মত চেহারা হলেও, পরে ফুচুদার চেহারা হয়ে উঠেছে টেনিদার মতোই ব্যায়ামপুষ্ট, আর টেনিদার মতোই সব ব্যাপারে জোর ফলানো এবং মুখে বড় বড় বোল-চাল মারা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রসঙ্গত গল্পকার নারায়ণবাবুর পিসতুতো ভাই ফুচুদার কথা মনে পড়ে। স্বয়ং লেখকের ভাষায় এই ফুচুদা, অর্থাৎ মহেন্দ্রবাবু 'সাহেবী মেজাজের লোকটি, দার্জিলিং- এ বাস। সুট পরে থাকেন এবং মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।'[২] লেখক তাঁর প্রথম গল্পতে 'পাশাপাশি'তে এক স্থানে মাংসের কচুরির কথা লিখেছিলেন। তাই শুনে তাঁর পিসতুতো ভাই হাসতে হাসতে বলেছিলেন তাঁকে টিট্‌কিরি দিয়ে -- 'মাংসের কচুরি! তাও কি হয়? ননসেন্স এ্যাণ্ড এ্যাবসার্ড, রাবিশ''[৩] লেখকের গল্পের ফুচুদারও বড় বড় কথার ফাঁকা আওয়াজ (ফাঁকা আওয়াজ' বলার কারণ এই যে, মাংসের কচুরি সত্যিই তৈরী করা হয়) ও সাহেবী মেজাজ দেখাবার মত। তাই পেট রোগা প্যালাকে 'ছাগল' বলতে তার বাধে না বা দরাজ গলায় তিন-শো ডন বৈঠক দেবার উপদেশ দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। এমনকি, প্যালারামের অঙ্ক মেলাবার অজুহাতে তাকে 'ফ্রেশ এয়ার' খাওয়াতে জোর করে মোটর সাইকেলে তুলে নেয় আর তাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে বলে —''তোর ইচ্ছে করুক আর না করুক, তাতে কার কী এসে যায় রে? ভারি আমার ওস্তাদ এসেছেন।'[৪] ''দুর্দ্ধর্ষ মোটর সাইকেল'' গল্পে ফুচুদার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের আসর জমজমাট হয়ে ওঠে। ফুচুদা তার নতুন মোটর সাইকেলে চড়িয়ে আশ্বাস দেয় — ''জ্বরে না মরে অন্যভাবে মরলে এমনকিছু লোকসান হবে না''।[৫] অতঃপর দু'বার মোষের গাড়ি ও লরির সঙ্গে এ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে কোনরকমে বাঁচে তারা। তারপর প্রথমে কুকুর ও পরে মোষের তাড়া খেয়ে আশ্রয় নেয় পচা ডোবায়। ক্রুদ্ধ মোষের দল ওদের না পেয়ে বাইকটাকে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে। এই হাস্যকর ও নাকাল পরিস্থিতিতেই গল্পটি শেষ হতে পারতো, কিন্তু সুরসিক লেখকের রস পরিবেশন করতে আরও একটু বাকি ছিল। দুষ্টুবুদ্ধি প্যালারাম তার পা মচ্‌কেছে, এই অজুহাতে ফুচুদার মোটর সাইকেলে চেপে বসে তাকে দিয়ে সেই গাড়ি ঠেলিয়েছে। আর প্যালারামের মতে -- ''এতক্ষণে সত্যি বলতে কী, মোটর সাইকেল চরাটা আমার মন্দ লাগলো না।''[৬] গল্পের এই উপসংহার যেন ভোজের শেষে পাতে টক-মিষ্টি চাটনি।

''রোমাঞ্চকর বন্দুক' গল্পের হলধরদাও হাবে-ভাবে, আচার-আচরণে টেনিদারই সমগোত্রীয়; তবে চেহারা তার 'রোগা

ডিগডিগে'। এমনই দুর্বল চেহারা তার যে, প্যালারাম পর্যন্ত তার পিলে-জ্বরে-ভোগা চেহারা নিয়ে হলধরদাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে। অবশ্য সেই ইচ্ছা প্যালারাম কখনো করে নি; বরং হলধরদার বন্দুকটি হাতে পাওয়ার লোভে তাকে মিথ্যে তোষামোদ পর্যন্ত করেছে, — এমনকি আমসত্ত্বের আচার চুরি করে তাকে খাইয়েছে। কিন্তু টেনিদার মতই আমসত্ত্ব আত্মসাৎ করে বন্দুক ছুঁড়তে দেবার কথা বেমালুম ভুলে গেছে হলধরদা। টেনিদার মতই মেলা গুল-গপ্পো করেছে সে এবং শিকারে ব্যর্থ হয়ে ক্যাবলাকেই দোষারোপ করেছে। বড় শিকারীদের নকল করে হামাগুড়ি দিতে গিয়ে সে বিছুটির জ্বালায় নাকাল হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাখি ভেবে গুলি করে মাকাল ফলের রসে নিজের টাক ভিজিয়েছে এবং অবশেষে বক মারতে গিয়ে বন্দুকের প্রবল ধাক্কা খেয়ে প্যালাকে শুদ্ধ নদীতে পড়ে হাবুডুবু খেলে সত্যি 'বক দেখা'র অবস্থা হয়েছে। অতঃপর 'হতচ্ছাড়া' 'রোমাঞ্চকর' বন্দুককে হলধরদা নদীতে বিসর্জন দিয়ে বেঁচেছে। যে বন্দুকের পদে পদে এমন রোমাঞ্চ, সেই বন্দুক না থাকাই ভাল বলে মনে হয়েছে তার। এই গল্পে হাস্যরস পাহাড়ী রাস্তার মতো পাক খেতে খেতে একেবারে চূড়ায় এসে পৌঁছেছে গল্পের শেষে।

তাঁর কিশোরদের জন্য লেখা গল্পে এরকম দাদাদের প্রচুর ভীড়। উঠ্‌তি বয়সের ছেলেমেয়েদের কোনো-না-কোনো দাদার প্রতি আকর্ষণ আমরা হামেশাই দেখতে পাই। সুদীপ বসুর ভাষায় — 'দৃষ্টির আশ্চর্য তীক্ষ্ণতায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর কিশোর পাঠকদের মনোধর্মকে। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের হিরো ওয়ারশিপের ইচ্ছা তাই তাঁর রচনায় টেনিদা চরিত্র হয়ে উঠেছিল''।[৭]

কিশোরদের জন্য রচিত গল্পের অন্যান্য দাদাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে টেনিদা প্রসঙ্গে আসছি। বল্টুদা টেনিদার মতই খাদ্যরসিক, বাক্যবাগীশ। খেলায় ইষ্টবেঙ্গল হারলে মন খারাপ করে চুপচাপ বসে থাকে। 'লঙ্কানাথম্ কটুসুন্দরম' গল্পে দেখি সে বাঁদরকে খাওয়ানোর জন্য কলা, মূলো, জিলিপি-এমনকি আলুর চপ পর্যন্ত দিয়েছে। সেকথা বলতে গিয়ে তার জিভে জল চলে এসেছে, কিন্তু বাঁদর তার দেওয়া খাবার স্পর্শ করেও দেখেনি। বাঁদরের নাম আবিষ্কারের জন্য বল্টুদা বাংলা অভিধান খুলে 'অ' থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত আউড়ে গেছে! কিন্তু বাঁদর কোনও সাড়া দেয়নি। এমনকি বল্টুদা বাঁদরকে দেড়শো গানের রেকর্ড শুনিয়েছে — খেয়াল থেকে কালীকীর্তন পর্যন্ত কিছু বাদ রাখে নি, তবু চিঁড়ে ভেজে নি। অগত্যা সে উদাস মুখে প্যালারামের শরণাপন্ন হয়েছে। যে বল্টুদা নাট্যাভিনয়ে 'অশ্ব কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না' বলতে গিয়ে ভুল করে 'মহারাজ কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না' বলে লজ্জিত না হয়ে আস্ফালন করে- 'বেশ করেছি, আরো একশো বার বলব',[৮] যে বল্টুদা প্যালাকে ধমকে বলে 'ইচ্ছে করে তোর পিঠে সুতো বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিই'[৯] — তার এহেন হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থা উপভোগ করার মতই। আর মজার কথা এই যে বল্টুদার সঙ্গে টেনিদার আদায় - কাঁচকলায় সম্পর্ক। বল্টুদা যদি বলে ''....রামো-রামো - টেনি আবার একটা মানুষ''[১০] ('ভুতুড়ে কামরা') তাহলে টেনিদা বলে — 'বল্টে ওটা একটা গোভূত! ('ব্রহ্মবিকাশের দন্তবিকাশ')।[১১]

টেনিদার মাসতুতো ভাই ন্যাংচাদা 'বাগবাজারের ছেলে — তুখোড় চীজ'।[১২] সিনেমা দেখে ভাবের জগতে বিরাজ করার ফলে সে বাজারে কাঁচকলা দেখেও কাব্য করে, আর পরীক্ষায় সব বিষয়ে ফেল করে মনের দুঃখে 'দি গ্র্যাণ্ড আবার খাবো' রেস্তোরাঁয় ঢুকে টেনিদার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিচয় দেয়। অবশেষে ফিল্‌মে অভিনয় করার লোভে ভুল করে পাগলা-গারদে ঢুকে ন্যাংচাদার প্রচণ্ড হয়রানি হয়। পাঁচিল টপ্‌কানো থেকে সুরু করে দু'পা তুলে দাঁড়াবার প্রাণান্তকর চেষ্টা — নাচ, গান, ডোবার পচা জলে সন্তরণ, কিছুই আর বাকি থাকেনা। শেষে সে আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে-'বাঁচাও ..... বাঁচাও..... আমাকে মেরে ফেললে .... আমি আর ফিলিমে পার্ট করবো না ...।'[১৩] ন্যাংচাদার এই করুণ হাহাকার 'ন্যাংচাদার হাহাকার' গল্পে কিন্তু হাস্যরসেরই সৃষ্টি করে।

ঘন্টাদাও আর একটি আকর্ষণীয় চরিত্র। তার পক্ষে অসাধ্য কোনও কাজ নেই। সে পাটের দালালি থেকে শুরু করে ঝোলা গুড়ের ব্যবসা, সিনেমায় জনতার দৃশ্যে অভিনয়, বাজী রেখে কাঁচা ডিম খাওয়া, ভূতুড়ে বাড়িতে ভূত দেখতে গিয়ে ভির্মি খাওয়া — প্রায় কিছুই বাকি রাখেনি। 'ঘন্টাদার কাবলু কাকা' গল্পে ঘন্টাদা তার কাবলু কাকাকে জব্দ করবার জন্য ছারপোকাওয়ালা বিছানায় শুতে দিয়েছে। ভোজন-রসিক কাকাটিকে বাড়ি থেকে বিদেয় করার জন্য ঘন্টাদার এই ব্যবস্থা। কিন্তু গল্পের শেষে ছারপোকার কামড় খেয়ে যখন কাকা বলছেন '' ....কাল সারারাত কারা যেন মোলায়েম ভাবে গা চুলকে দিয়েছে। সে কি আরাম! ..... তিন দিন কেন, মাসখানেকই থেকে যাবো তোর ওখানে''[১৪] তখন ঘন্টাদা মূর্ছা না গিয়ে আর কি-ই বা করবে!

চালিয়াতিতে ভোম্বলদা আবার টেনিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ফুলুপিসীর দেওঘরে বিয়ে — এই গুল্পট্টিটুকু মেরে সে চাল দেখিয়ে বলে যে, সে এর আগে সাতবার দেওঘর গেছে। প্যালা তার এ কথার প্রতিবাদ করলে সে-ই উল্টো প্যালাকে দেওঘর সম্পর্কে জেরা করে, প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে তোলে। আর শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ভোম্বলদা বলে যে, পরীক্ষায়

'ভ্রমণ কাহিনী' রচনা আসতে পারে বলে সে কায়দা করে দেওঘরের কথা জেনে নিলো এতক্ষণ। ভোম্বলদার এই চালাকি, প্যালাকে না দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে লজেন্স খাওয়া, জোর করে প্যালার ট্যাক্সিতে চেপে বসা আর মাছি তাড়ানোর মত করে ফুলুপিসী, দেওঘর – সবকিছুর কথা অস্বীকার করা — বার বার টেনিদার কথাই মনে করায় 'রচনার রহস্য' গল্পে।

'বেয়ারিং ছাঁট' গল্পে হুলোদার দেখা মেলে। এই হুলোদা খুব কৃপণ। কামাতে খরচ হয় বলে দাড়ি রাখে; চুল ছাটে দেশোয়ালী ভাইয়ার অভিনয় করে নাপিতের কাছে বিনা খরচে। কাপড়-জামা কাচে মাসে একবার, চান করে বছরে চারবার। পশ্চিমী হিন্দুস্তানী ভাষায় জমিয়ে আলাপ করে বিনা পয়সায় চুল কাটানো তার অভ্যাস হলেও, তার জন্য কেমন করে তাকে বিপাকে পড়তে হয়েছে, তারই কৌতুককর বর্ণনা আছে এই গল্পে। নাপিতের অনুরোধে দেশোয়ালী ভাইয়াদের মাথা কামাতে গিয়ে আনাড়ি হুলোদা অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছে। তখন তাকে ভুতে পেয়েছে মনে করে ওঝা ডেকে এনে রীতিমত অত্যাচার করা হয়েছে। দাড়ি, চুল – এমকি ভুরু পর্যন্ত কামানো অবস্থায় হুলোদার সত্যি ভূত পালিয়েছে ঘাড় থেকে – কিপ্টেমির ভূত!

বাগবাজারের বেচারাম গড়গড়ি – ওরফে 'মাকুদা' আবার টেনিদাকেও টেক্কা দিয়েছে। নিজেকে হনলুলুর অধিবাসী এবং ভূ-পর্যটক রূপে পরিচয় দিয়ে নিজের খুশি মতো বানানো জাপানী, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি বিদ্‌ঘুটে ভাষা বলে সর্বভাষা- বিশারদ টেনিদাকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আর অন্য দেশগুলির আদর-যত্নের সঙ্গে তুলনা করে ভারতের নিন্দা বইয়ে ছাপবার হুমকি দিয়েছে। ফলে 'চারমূর্তি'র দেশপ্রেম জেগে উঠেছে। ট্যাঁক খালি করে তারা মাকুদাকে কাট্‌লেট, মাংস, পোলাও, পুডিং, খাইয়েছে। গল্পের শেষে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে ধাপ্পাবাজ মাকুদা কেটে পড়েছে।

কিশোরদের জন্য রচিত গল্পে নারায়ণবাবুর টেনিদা চরিত্র অসাধারণ সৃষ্টি এবং নারায়ণ বাবুর কিশোর-সাহিত্যে জনপ্রিয়তার মূলে এই চরিত্রটি। ভাবতে অবাক লাগে, এই টেনিদা চরিত্রটি সৃষ্টির মূলে রয়েছে, যে বাসাবাড়িতে লেখক ভাড়া থাকতেন তার দোতলার দুই মহিলার বিচিত্র সংলাপ। তাঁরা একে অপরকে বলতেন – " আমার টেনু যখন ছোট ছিল তখন কাঁথা-চাপা দিয়ে রোদে শুইয়ে রাখতাম, তখন আর কিছু দেখা যেত না, শুধু খড়্গের মতো একটা নাক"।[১৫] টেনিদার বিশাল নাকের জন্ম সম্ভবত এর থেকেই। দুই মহিলার এই টেনুর গল্পে হাস্যরসেরও ঘাটতি ছিল না। তাঁদের টেনুকে জব্দ করার জন্য বাড়িওয়ালা টুলে উঠে লম্বা টেনুর কান ধরতো। সুতরাং এই টেনিদাই যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত রসিক-জনের লেখনীতে পাঁচ হাত লম্বা 'টেনিদা' হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বয়ং লেখকের সহধর্মিনী শ্রীমতী আশা দেবীর ভাষায় – "এইসব গল্পই হয়তো পরোক্ষভাবে ওঁর মনে দাগ কেটেছিল। ..... কল্পনা আর বাস্তব মিশে একটা নতুন মানুষ সৃষ্টি হলো যাকে বাস্তবের টেনিদা বললেও ভুল হবে, আবার সম্পূর্ণ কল্পনা বললেও ভুল হবে।"[১৬]

আশা দেবীর লেখার এই সূত্র ধরে বাস্তবের সেই টেনিদা বেঁচে আছেন কিনা খোঁজ করতে করতে আমি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্যদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা হাতে পাই। ঐ পত্রিকা থেকে জানতে পারি যে "সত্যিই বইয়ের পাতার বাইরে নিজস্ব জীবন যাপন করছেন কেবল টেনিদাই"।[১৭] এরপর আমি ঠিকানা যোগাড় করে বাস্তবের টেনিদার সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু তথ্য পাই। টেনিদার ভাল নাম প্রভাত মুখার্জী। তাঁর ডাক নাম 'টেনি'ই-যা গল্পে গৃহীত হয়েছে। গল্পের টেনিদার মতই তিনি পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের বাসিন্দা। আর গল্পের টেনিদার চেহারার বর্ণনা পড়ে গেলে এই বৃদ্ধ বয়সেও টেনিদাকে চিনে নিতে বিশেষ সময় লাগে না। বাস্তবের এই টেনিদার দু'ভাইয়ের নাম ক্যাবলা ও হাবুল- এই প্রকৃত নামই গল্পের চারমূর্তির দুটি চরিত্রের নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর বাকী থাকলো একা প্যালারাম। গল্পগুলিতে কথকের ভূমিকায় প্যালারাম স্বয়ং লেখকের প্রতিভূ। 'চারমূর্তির অভিযান' গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক প্যালারামের জবানীতেই ছোট ছোট কিশোর বন্ধুদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ছেলেবেলায় লেখকও পেটরোগা ছিলেন এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলেন প্যালারামের মতই। 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'আমার কথা' অংশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— 'কাঁঠাল সম্পর্কে বাড়ীর কারুর কার্পণ্য ছিল না এবং ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখে ছেলেবেলায় এত ভুগতে হয়েছিল যে সকলে আমাকে ঈশ্বরের করুণার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন" (পৃঃ-৪)। প্যালার মত গল্প বলার ক্ষমতা তাঁর ছোটবেলা থেকেই। অবশ্য প্যালার মত খারাপ ছাত্র তিনি মোটেই ছিলেন না।

আমরা জানি, শিশু সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে নারায়ণবাবু প্রথম ছোটদের জন্য কলম ধরেছিলেন। স্বয়ং লেখকের ভাষায় – "বড়দের জন্য গল্প লিখছিলাম। হঠাৎ একদিন বিশু মুখোপাধ্যায় এলেন। .... এসেই ফরমাস করলেন, 'মৌচাকে' গল্প লিখতে হবে ছোটদের জন্য"।[১৮] এতো গেল লেখকের কিশোর-সাহিত্যে আবির্ভাবের ইতিহাস। তাঁর টেনিদাকে নিয়ে গল্প লেখার পিছনেও ইতিহাস আছে, যা বাস্তবের টেনিদার মুখ থেকেই শুনেছি। একদিন ঘরোয়া আসর জমাতে টেনিদা 'তিন ডাকাত আর তিন ভাই' -এর একটা গল্প বানিয়ে বলেছিলেন নারায়ণবাবুকে। সেই গল্পে তিন ভাইয়ের নামকরণ 'বিঁটলে', 'বাঁটুল' আর 'ব্যাঙা'। সাহিত্যিক বিমলচন্দ্রের খুব ভাল লাগায় তিনি ঐ নাম তিনটি তাঁর সাহিত্য রচনায় ব্যবহার

করতে চেয়েছিলেন। আর টেনিদার আসর-জমানো বানানো গল্পে মুগ্ধ হয়ে নারায়ণ বাবু কথা দিয়েছিলেন — ''টেনিদা আপনাকে আমি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করে যাবো।''[১৯] অতঃপর টেনিদার আবির্ভাব ঘটেছে নারায়ণ বাবুর কিশোর সাহিত্যে। বাস্তবের টেনিদার জীবনের কোনও কোনও ঘটনা অনেক সময় তাঁকে গল্পের ইন্ধন যুগিয়েছে। যেমন 'ঢাউস' গল্পের মত 'ঢাউস চ্যাঙ্ ঘুড়ি' ওড়াতে টেনিদা সত্যি গিয়েছিলেন। তবে ঘুড়ির সঙ্গে টেনিদার উড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা লেখকের রঙিন কল্পনার পক্ষ-বিস্তার মাত্র। তাই বাস্তবের টেনিদা, গল্পের 'টেনিদা' চরিত্রটি নির্মাণের প্রেরণাস্থল হলেও একথা মনে রাখা দরকার, এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি বাস্তব উপকরণকে ছাড়িয়ে গেছে। বস্তুত বাস্তবের টেনিদা চরিত্রটি থেকে লেখক শুধুমাত্র প্রতীতি আহরণ করেছেন। তারপর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী তাতে তাৎপর্য আরোপ করেছেন, অবশেষে সেই তাৎপর্য-মণ্ডিত প্রতীতিকে নিজ ব্যক্তিত্বের পরশ পাথর ছুঁইয়ে গল্পে শিল্পরূপ দান করেছেন। বাস্তবের টেনিদাকে যদি ঘুড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে লেখক লাটাই হাতে এই ঘুড়ি যেমন খুশী উড়িয়েছেন কাহিনীর সুতোয় বেঁধে। দোকানের সাধারণ মূল্যের ঘুড়িটি সাহিত্যাকাশে অসীম ব্যঞ্জনার বিস্তারে ভেসে উঠে হয়ে উঠেছে অসাধারণ ও অমূল্য।

আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ধরণের গল্পগুলি ঘিঞ্জি গলি-ঘুঁজির শহরে বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর মত। ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় মুক্ত নীলাকাশে নানা রঙের ঘুড়ি ওড়ে, শহরের আবর্জনা তাদের নাগাল পায় না। হাওয়ার গতিবেগের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়িগুলিও ওঠে, নামে, পাক খায়; তেমনি নারায়ণবাবুর কিশোর গল্পের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ভাষাও নাচানাচি করে। কখনো কখনো ঘুড়িতে ঘুড়িতে প্যাঁচ লেগে যায়, সেই রকম গল্পে ক্লাইম্যাক্সের মুহূর্তে হাস্যরসও চরমে ওঠে। তারপর যে কোনও একটি চরিত্রের ভোঁ-কাট্টা অবস্থা হলে হাসি আর থামায় কে ! 'ঢাউস' গল্পে ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ির মতন টেনিদাকে স্ট্র্যাণ্ড রোডে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করি আমরা গল্পের উপসংহারে।

গুল-গপ্পো ওস্তাদ টেনিদার পরিচয় মেলে ''ক্যামোফ্লেজ'' গল্পটিতে। এ গল্পে টেনিদা চা খেতে খেতে, ঝিমোতে ঝিমোতে, এমনকি ঘুমোতে ঘুমোতে যুদ্ধে জাপানী মারার বড়াই করেছে। সুপ্রিম কম্যাণ্ডার মিস্টার বোগাসের পরামর্শে টেনিদার নাকে শিশের গুলি ঢুকিয়ে তার আঘাতে জাপানীদের ঠাণ্ডা করার পরিকল্পনা যেমন কৌতুকপ্রদ তেমনি অভিনব। গাছের ছদ্মবেশে জাপানীদের টেনিদাকে হরণ বিস্ময়কর; কিন্তু এই বিস্ময় ও হাস্যরস চরমে ওঠে যখন জানা যায়, টেনিদা কুকুরের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং কুকুর টেনিদার ছদ্মবেশ নিয়ে জাপানীদের ঠকিয়েছিল। টেনিদার ভাষায় — 'এখানেও ক্যামোফ্লেজ!'[২০] এই গল্পটি যেন হাসির ফুলঝুরি। এর হাজার স্ফুলিঙ্গে রং-বেরঙের হাসির চমক।

ভোজন-রসিক, বাক্যবাগীশ টেনিদার পরিচয়তো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। 'মৎস্য পুরাণ' গল্পের সূচনায় পেটরোগা প্যালাকে বাঁচাবার মহৎ উদ্দেশ্যে টেনিদা প্যালার ভাগের রাজভোগগুলো সাবাড় করেছে। প্যালা যখন তার সঙ্গে যেতে চায়নি তখন নিজস্ব বিদ্‌ঘুটে সংস্কৃত ভাষায় বলেছে — 'চালাকি না চলিষ্যতি'।[২১] ক্যাবলা, প্যালা প্রভৃতি সঙ্গীর ভাগের খাবার (কুলপী, রাজভোগ, আলু-কাবলী প্রভৃতি) আত্মসাৎ করা টেনিদার গল্পে সাধারণ ব্যাপার। তাছাড়া তার গুল-গল্পের সত্যতায় কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে টেনিদা 'পোলাপান'কে 'জলপান' করে ফেলার হুমকি দিয়েছে। 'দি গ্রেট ছাঁটাই' গল্পে টেনিদা বিনা নিমন্ত্রণে প্যালার সঙ্গী হতে চেয়েছে ভোজনের আশায়। আর নাপিত যখন টেনিদার নির্দেশ মত প্যালার চুল কাটতে অস্বীকার করে বলেছে 'ওইসা নেহি হোতা' তখন টেনিদা গর্জন করে উঠেছে ''সব হোতা। আকাশে স্পুটনিক হোতা — মাথামে টাক হোতা — মুরগী আজ ঠ্যাং নিয়ে চলে বেড়াতা কাল সেই ঠ্যাং প্লেটমে কাটলেট হো যাতা। সব হোতা, তুম নেহি জানতা।''[২২]

এই টেনিদার জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। তার মুখের ভাষা আজ প্রায় প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। এমন কি টেনিদাকে মধ্যমণি করে 'চারমূর্তি' নামক চলচ্চিত্রও তৈরী হয়েছে। এই টেনিদা চরিত্রের প্রভাব উত্তরকালের কিশোর-সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নারায়ণবাবু যে বছর ইহলোক ত্যাগ করেন সে বছরই সর্বজিৎ সেন 'জীবে দয়া' নামে টেনিদাকে নিয়ে একটি গল্প লেখেন বাংলা সাহিত্যে টেনিদাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।[২৩] অবশ্য গল্পটি নারায়ণবাবুর দুর্বল অনুকরণ মাত্র। অধুনা নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'নকুলমামার কীর্তিকলাপ' গল্পটির কথাও স্মরণ করা যায়। কেবল ঘটনাগত বা চরিত্রগত সাদৃশ্যই নয়, নারায়ণ বাবুর ভাষাগত প্রভাবও এই গল্পে সুস্পষ্ট। টেনিদার চ্যালা হাবুলের মত এই গল্পে হারুর মুখে 'বাঙাল ভাষা' দেওয়া হয়েছে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য। কান্তি পি. দত্তের 'ভজুদার হিমালয় যাত্রা' গল্পে টেনিদার সঙ্গে ভজুদার চরিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং তারও তিন চ্যালা — বিল্টু তিলু ও বিচ্ছু।

'আরাধনা' পত্রিকায় ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'পিনডিদার মেনু' গল্পেও টেনিদার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বীরু চট্টোপাধ্যায়ের 'গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প' গুলির উৎসমূলেও টেনিদার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নারায়ণবাবুর টেনিদার গল্পের শিল্প-সুষমা অনেক বেশী, মানের দিক থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বস্তুত নারায়ণবাবুর শূন্য আসন পূর্ণ করার মত কোনও ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয় নি বলেই টেনিদার পর্যায়ের আকর্ষণীয় চরিত্র আজও গড়ে ওঠেনি বাংলা সাহিত্যে। টেনিদার গল্প পড়ে কেবল ছোটরাই আনন্দ পায়নি, বড়রাও ঐ গল্পগুলির রসাস্বাদ পেয়েছেন।

সরল দে-র ভাষায়— ''সাহিত্যে যে ক'টি সার্থক টাইপ চরিত্র আছে, টেনিদা তাদের অন্যতম। শুধু ছোটরা কেন, আমি জানি, বড়োরাও টেনিদার গল্প পেলে ছাড়ে না।''[২৪]

একটা বিষয় টেনিদার গল্পে আমরা লক্ষ্য করি যে, সব গল্পের কথকই প্যালারাম। পরীক্ষায় গাড্ডা খাওয়া, পেটরোগা, হ্যাংলা, ভীতু প্যালারাম বাঙালির ঘরে সহজেই চোখে পড়ে। সুতরাং তার মুখের গল্প বাঙালী ছেলেদের মনের গল্পতো বটেই। প্যালা যে চোখ দিয়ে আর তিনটি চরিত্রকে দেখেছে ও ঘটনার রসগ্রহণ করেছে, যে কোনও বাঙালী কিশোরই সেই দৃষ্টি ও রসবোধের অধিকারী। তাই গল্পের কথক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাই। যদি লেখক মেধাবী ক্যাবলাকে গল্পের কথকের ভূমিকা দিতেন, তাহলে বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের বুদ্ধি ও মানসিক দূরত্ব রসগ্রহণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। হাবুল গল্পের কথক হলে তার 'বাঙাল ভাষা' সকলের বোধগম্য হত না এবং ঐ ভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণের ভঙ্গীজাত হাস্যরসের স্বতস্ফূর্ততা হ্রাস পেতো। আর টেনিদা স্বয়ং গল্পের কথক হলে টেনিদার বর্ণনা, তার হাবভাব, বিভিন্ন কথায় তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া অন্যের চোখে কেমন দেখায়, সেসব আমরা কিছুই জানতে পেতাম না। টেনিদার 'নিজস্ব আভিধানিক' শব্দগুলির মজাও বহু-ব্যবহারে কমে যেত। তাই দূরদর্শী লেখক সঠিক গল্পের কথক নির্বাচন করেছেন। ফলে গল্প বলার ভঙ্গিই টেনিদার গল্পগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

নারায়ণবাবুর কিশোর-গল্পে কেবল 'দাদাদের' ভীড় নয়, 'মামা'রাও বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করেছে। 'ঘোড়ামামা', 'পচামামা', 'কুট্টিমামা','শিবুমামা', 'গাবলুমামা' — এমনকি 'পিসেমশায়ের মামার গল্প' পর্যন্ত আছে। প্রথমেই ঘোড়ামামার কথা বলি। ঘোড়ামামার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক 'ঘোড়ামামার অবদান' গল্পে বলেছেন — ''ঘোড়ামামা আসলে কারো মামা নন'' আর 'ঘোড়াতো তিনি নিশ্চয়ই নন'[২৫] তবু সবাই তাকে আড়ালে 'ঘোড়ামামা' বলে ডাকে। আসলে ঘোড়ামামার একটি ঘোড়া রোগ হলো রাস্তার আবর্জনা ঘেঁটে বেড়ানো। তাঁর আশা — '' আজ জুতোর সোল পেলাম, কাল খানিক চামড়া পাব, পরশু একটা ফিতে পাব .... ব্যস, বিনি পয়সায় জুতো হয়ে যাবে।'[২৬] ঘোড়ামামার দু'টি স্বাধীন মতামত আছে। প্রথমত, তিনি দাড়ি কামান না; দ্বিতীয়ত, তিনি চান করেন না। কারণ, দাড়ি নাকি মুখের 'বেউটি', আর রোজ চান করলে জলে ভেজা গামছার মতই নাকি শরীর 'পচে যাবে।'[২৭] তার উচ্চারণে গণ্ডগোল থাকায় 'হাতি'কে বলেন 'হেতি', 'বিউটি' তার মুখে 'বেউটি' তে পরিণত হয়েছে। এ জাতীয় আধ-পাগলা চরিত্রের মানুষকে কখনো কখনো আবর্জনা ঘাঁটতে দেখতে পাওয়া যায় বৈকি কলকাতার রাস্তাঘাটে। সাধারণ মানুষ এঁদের লক্ষ্যই করে না, আবার দেখলেও ঘৃণা করে। কিন্তু রসিক গল্পকার এরূপ একটি চরিত্রকে কৌতুকরসের আধারে পরিণত করে তুলেছেন এবং সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন।

এহেন ঘোড়ামামার পাল্লায় পড়ে 'পেলারামের' যে দুরবস্থা হয়েছিল তা বর্ণিত হয়েছে 'ঘোড়ামামার অবদান' গল্পে। 'কেঁচাগোল্লা' 'তালশাঁস সন্দেশ' 'ছেনার জিলিপির' লোভ দেখিয়ে তিনি প্যালারামকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন আবর্জনা কুড়োতে কুড়োতে। ক্লান্ত প্যালা যখন তাঁর কাছে মিষ্টি খেতে চেয়েছে, তখন হাড়কঞ্জুষ ঘোড়ামামা তাকে সুতোয় বাঁধা একটি নেংটি ইঁদুর দিয়ে বলেছেন — 'ইটাকে নিয়ে তোমাদের ভাঁড়ারে ছেড়ে দাও। অনেক বাচ্চা হবে, উৎপাত করবে, তখন তোমার বাবা বেড়াল নিয়ে আসবে। বেড়ালকে দুধ খাওয়াতে হবে। তোমার বাবা গরু কিনবে। সেই গরু দুধ দিবে, সেই দুধে সন্দেশ হবে, কেঁচাগোল্লা হবে, ছানার জিলিপি হবে ....''[২৮] গল্পের শেষে এ হেন আশ্বাসবাণী শুনে হাসি চেপে রাখা যায় না।

টেনিদার মামা কুট্টিমামা টেনিদার মতই খাদ্য-রসিক, ভীতু এবং বাক্-সর্বস্ব। তাই 'কুট্টিমামার দন্ত কাহিনী' গল্পে সাহেবরা শিকারে যেতে বললে কুট্টিমামা শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে প্রচুর খাবার খেয়ে ঝর্নার ধারে গিয়ে মহাভারত পড়তে বসেছেন। তিনি মহাভারতের সেই জায়গাটা বেছে পড়ছেন, যেখানে ভীম বকরাক্ষসের সব খাবার খেয়ে নিচ্ছে। সেই সব খাবারের কথা ভেবে তাঁর চোখে জল এসেছে, আর এমন সময় সেখানে হাজির হয়েছে বাঘ। ভয়ে দ্রুত কুট্টিমামা গাছে উঠেছেন এবং তাঁর কম্পমান হাত থেকে মহাভারতটি পড়ে গেছে। সেই ভারী মহাভারতের আঘাতে বাঘের সব দাঁত পড়ে গেছে। সেই ভাঙ্গা দাঁত দেখিয়ে বাক্যবাগীশ কুট্টিমামা সাহেবদের কাছে হিরো হয়েছে। এই হাস্যরস চরমে পৌঁছেছে যখন কুট্টিমামার বাঁধানো দাঁত অবিশ্বাস্যভাবে বাঘের মুখে খুব ভালো ফিট করেছে ও সেই দাঁত মুখে পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘ 'বাঘা' হাসি হেসেছে। অবশেষে পেস্ট ও টুথব্রাশ নিয়ে বাঘের হাওয়া মানে 'উইণ্ড' হয়ে যাওয়া হাসির লহর তুলেছে। কুট্টিমামার অভিনব ইংরাজী ''নো ফোক্‌লা দাঁত উইল ডু''[২৯], ''টাইগার কাট ডাউন''[৩০] প্রভৃতি পাঠককে দমকে দমকে হাসির তরঙ্গে উদ্বেল করেছে। এই প্রসঙ্গে নারায়ণবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলেছেন ''মনে হয় নারায়ণের মধ্যে একটি সহজ সরল ছেলেমানুষ শেষদিন পর্যন্ত মিশেছিল। যে সহজে হাসে, সহজে ভালবাসে, স্বল্পে তুষ্ট হয় অথচ যার কৌতুহলের সীমা নেই। বিদ্বান, পণ্ডিত, চিন্তাশীল, রসস্রষ্টার পাশাপাশি একটি চির-কিশোর পাঠকদের সঙ্গে খেলা করে বেড়িয়েছে। তাদের হাসিয়েছে, ছুটিয়েছে, লম্ফেঝম্পে বীরত্বের অংশ নিয়েছে।'[৩১]

শিবুমামা হলেন একজন সখের ম্যাজিসিয়ান। ভয়ঙ্কর ম্যাজিক দেখিয়ে অন্যকে ভীতিগ্রস্ত করাতেই ও রাগানোতেই তাঁর

আনন্দ। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর হর্ষবর্ধনের মত তাঁর বিশাল ভুঁড়ি। 'ওস্তাদের মার' গল্পে তিনি ঐ বিশাল ভুঁড়ির জন্য অসুবিধায় ট্রেনে ঘুমুতে পারেন নি; তাই অন্য লোকের আরামের ঘুম তাঁর সহ্য হয় নি। তাই তিনি ঘুমন্ত ছোক্‌রার সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়ে ম্যাজিকের পর ম্যাজিক দেখিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। প্রথমে নিরামিষাশী ছেলেটির বালিশের ভিতর থেকে ডিম বের করেছেন, তারপর তার চশমা 'ভ্যানিশ' করেছেন; সবশেষে নিজের খুনের দৃশ্য দেখিয়ে ছেলেটির অবস্থা 'টাইট' করেছেন। কিন্তু ছেলেটি প্রতিশোধ নিয়েছে শিবুমামার এ্যাটাচি, স্যুটকেশ ভ্যানিশ করে। চুরি যাওয়া জিনিষপত্রের শোকে শিবুমামা দু'চোখে সর্ষেফুল দেখেছেন। শেষ রাতে ছেলেটি প্রকৃতই 'ওস্তাদের মার'ই দেখিয়েছে। তাই গল্পের নামকরণ নিঃসন্দেহে সার্থক। শিবুমামার ছোট ছোট ম্যাজিকগুলিকে কেন্দ্র করে ছেলেটির সঙ্গে কথাকাটাকাটির সংলাপ স্বতস্ফূর্তভাবেই পাঠকের মনে কৌতুকরসের উৎসকে নাড়া দিয়েছে, আর গল্পের পরিণতিতে পাঠক বিমল কৌতুকানন্দ উপভোগ করে।

পচামামাও টেনিদার 'বিশ্বময় মামা'দের একজন। টেনিদার ভাষায় তার মামাদের সংখ্যা 'ফাইভ ফিফটি পাইভ'। পচামামা হলো 'মা-র পিসতুতো ভাইয়ের বড় শালার মেজ ভায়রা,' অথবা তার 'কাকিমার খুড়তুতো ভাইয়ের —' এককথায় এই মামারা হলো রেকারিং ডেসিমেলের মতো — মানে শেষ নেই।'[৩২] ''কাঁকড়াবিছে'' গল্পে এইসব তথ্যের ভিত্তিতে পচামামাকে টেনিদার মামা হিসেবে মেনে নিতেই হয়। বিশেষ করে, এই পচামামার সঙ্গে টেনিদার প্রবল সাদৃশ্য দেখে মেনে নিতেই হয় — 'নরানাং মাতুলক্রম'। টেনিদা যেমন বছরের পর বছর ফেল করে একই ক্লাসে 'মনুমেন্টের মতো' গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে, পচামামা ও তেমনি সাতবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছেন। আট বারের বার যখন তিনি টেস্টে এ্যালাও হতে পারেন নি, তখন বারবার চড় খেয়ে উদাস হয়ে দেশান্তরী হয়েছেন। ইচ্ছে থাকলেও কমলালেবুর লোভে পচামামা ভুটানে গিয়ে আর সন্ন্যাসী হতে পারেন নি। সেখানে শিরিং সাহেবকে টেনিদারই মত ভুজুং ভাজুং দিয়ে, নিজেকে মিথ্যে এম্. এস. সি বলে পরিচয় দিয়ে কেমিষ্ট হিসেবে অভিনব সুস্বাদু অরেঞ্জ জুস তৈরীর প্রতিশ্রুতি পচামামা দিয়েছেন। একমাস ধরে 'পরস্মৈপদী রাজভোগ' খেয়ে অবশেষে পচামামা মধু, আদা, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর পিঁপড়ের ডিম মিশিয়ে এমন 'অরেঞ্জ কোয়াশ' তৈরী করেছেন যা টেনিদার ভাষায় — 'এক চামচে খেয়ে মনে হল যেন পোলাও, পায়েস, ছানার ডালনা, আলুকাবলি, বেলের মোরব্বা, দরবেশ, রাবড়ি — মানে যত যত ভালো খাবার জিনিস রয়েছে, সব যেন কে একসঙ্গে তার মুখে পুরে দিলে।''[৩৩] তবু শেষ রক্ষা হল না। লোভী বাবুর্চিসেই সুস্বাদু পানীয় চুরি করে পান করে নকল সরবৎ তৈরী করে রাখলো বোতলে। ফলে শিরিং সাহেব সপরিবারে এই সরবৎ খেয়ে একেবারে চিৎপাত। ভয়ে পচামামা পালালো; কিন্তু এই বিপদের সময়েও টেবিলে যা পেল দু'পকেটে বোঝাই করতে ভুললো না টেনিদার মত। সেই খাবারের লোভে দু'পকেটে কাঁকড়াবিছে ঢুকে শিরিং সাহেবের পাঠানো গুণ্ডাদের জব্দ করলো। আর পচামামা 'একটা চিতাবাঘের পিঠের ওপর হাইজাম্প দিয়ে একটা পাইথনের ল্যাজ মাড়িয়ে, ডজন পাঁচেক শেয়ালকে আঁতকে দিয়ে' কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলো। সেই প্রতিভাধর পচামামা এখন লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে মুদিখানার দোকান চালায়। পচামামার এই করুণ পরিণতি ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ির কথাই মনে করায়।

টেনিদার গাবলু মামাও পড়াশুনোয় টেনিদারই মতন। তিন বার আই. এ ফেল করেছে, কিন্তু টেনিদার ভাষায় — ''ওই গাবলু মামা-টামা বুঝলি, ওরা ভীষণ ডেঞ্জারাস হয়।''[৩৪] 'পেশোয়ার কি আমীর' গল্পে টেনিদার দৌরাত্ম্যতে অতিষ্ঠ হয়ে গাবলু মামা তার কান মুলে দিয়েছিল। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে টেনিদা সাঙঘাতিক টক্ আম 'পেশোয়ার কি আমীর' গাবলুমামার ঝুড়িতে রেখে দিয়েছিল মিষ্টি বোম্বাই আমের বদলে। আর মজার কথা এই যে এক সাহেবকে ঐ টক্ আম খাওয়ানোর দৌলতে বেকার গাবলুমামা চারশো টাকার চাকরী পেয়ে গিয়েছিল। কারণ, ঐ টক আম খেয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সাহেবের বহুদিনের বাত সেরে গিয়েছিল। তারই পুরস্কার গাবলুমামার এই চাকরী। গল্পের প্লটটি যেমন কৌতুককর, তেমনি হাস্যকর গাবলু মামার নিজস্ব ইংরেজী। এই ইংরেজি হাস্যরসে টইটুম্বুর — 'মাই গার্ডেনস্ ম্যাংগো স্যার। ভেরি গুড স্যার। ফর ইয়োর ইটিং স্যার'[৩৫] ইত্যাদি। এ জাতীয় ভাষা কুট্টিমামার ইংরাজির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সবশেষে আসছি 'পিসেমশায়ের মামা'র গল্পে। বক্তার নাম নেই, আগাগোড়া কথোপকথনের ভঙ্গিতে গল্পটি রচিত। গল্পের কথকের ভাষায় এই পিসেমশায়ের মামা ছিলেন ''বনেদী জমিদার। চপ্‌চপে ঘি দিয়ে পোলাও খেতেন; আস্তো আস্তো পাঁঠা খেতেন,' টগ্‌বগিয়ে ইয়া বড়া বড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া হাঁকাতেন আর ভেলভেটে মোড়া মস্ত তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবতেন।''[৩৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পিসেমশায়ের মামাও টেনিদার মতন ভোজন-রসিক ব্যক্তি ছিলেন, সেই সঙ্গে ছিলেন আয়েসী ও খেয়ালী। টেনিদার মতই তাঁর বিদ্যার দৌড় — 'কোনোমতে খবরের কাগজটা পড়তে পারতেন।'[৩৭] কিন্তু তাঁর এক্সপেরিমেন্টগুলো যথাযথই অভিনব এবং ভয়াবহ ছিল। 'নেপোয় মারে দই'—এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা আবিষ্কার করতে তিনি ভাইপো নেপোকে জোর করে পাঁচ সের দই খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন। ভাইপো নন্দকে ন্যাড়া করে বেলতলায় বসিয়ে 'ন্যাড়া কেন বেলতলায় যায় না' তা বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন।' 'পরের হাতে তামাক খেতে' কেমন লাগে দেখতে গিয়ে হুঁকো ধরা কষ্টটুকুও নেই দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু তামাক খাওয়ার সময় পিঁপড়ের কামড়ে চাকরের হাত থেকে জ্বলন্ত তামাক তাঁর টাকে গিয়ে পড়তেই এক্সপেরিমেন্টের ভূত নেমে গিয়েছিল তাঁর মাথা থেকে।

কথকের ভাষায় — " কারণ, সেদিনই, তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝে গেলেন ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে' এই বচনটার মানে কী'। [৩৮] গল্পের এই সমাপ্তি যেমন ইঙ্গিতবহ তেমনি সরস কৌতুকাবহ। স্বল্পায়তন গল্পটিতে নারায়ণবাবু পরিমিতিবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পটির এক একটি এক্সপেরিমেন্ট যেন হাস্যরসে ভরা এক একটি রসগোল্লা; আর গল্পের শেষে রসগোল্লার হাঁড়িটাই ভেঙ্গে গেছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মামাই বাক্যবাগীশ ও ভোজনরসিক — বিশেষ করে, টেনিদা যেসব মামাদের গল্প বলেছে। আসলে মানুষ উঠতি বয়সে নিজেকে 'হিরো' ভাবতে ভালবাসে এবং এই প্রবণতা অনেক সময় বেশী বয়সেও দেখা যায়। সেই মনস্তত্ব অনুযায়ী টেনিদার মামারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পের হিরো এবং তাদের টেনিদার সঙ্গে মিলও যথেষ্ট।

নারায়ণবাবুর ছোটগল্পগুলির দাদারাও প্রায় একই আদলে গড়া। এর থেকে আমরা তাঁর মানসিকতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। কিশোর গল্পের এইসব দাদা ও মামাদের সম্পর্কে সুদীপ বসু লিখেছেন — "টেনিদার সব গল্পই কি সমান উৎরেছে? তা বোধহয় বলা চলে না। মাঝে মাঝে গল্পের টান যেমন কমেছে, তেমনি একইভাবে টেনিদার মুখে ঘটনা শুনতে শুনতে পাঠকেরও ক্লান্তি জমেছে। লেখক তা বুঝেছিলেন। তাই অন্য চরিত্রদেরও প্যালারামের সঙ্গে এনেছেন যাতে টেনিদার ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় — ঘন্টাদা, বল্টুদা, ঘোড়ামামা, হলধরদা, ফুচুদা, ভজকেষ্টবাবু, হারুবাবু প্রমুখ।"[৩৯]

প্রসঙ্গত 'গজকেষ্টবাবুর হাসি' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই গজকেষ্টবাবু একটি অদ্ভুত চরিত্র — "একবার যদি তাঁর হাসি পায়, তাহলে তিনি মারাত্মক হয়ে ওঠেন। তখন আশেপাশের লোককে তিনি কাঁদিয়ে ছাড়েন।"[৪০] হাসতে হাসতে তিনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন — 'হাসির সঙ্গে সঙ্গে যাকে সামনে পান আঁচড়ে-কামড়ে কিল-ঘুষি মেরে অস্থির করে তোলেন।'[৪১] প্রাণধনবাবু একবার গজকেষ্টবাবুর হাসির তোড়ে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হন এবং তারপর এমন প্রতিশোধ নেন যে, গজকেষ্টবাবুর হাসিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রাণধনবাবু কুস্তিগীর ভাগ্নে কানাইয়ের সাহায্যে হাস্যরত গজকেষ্টবাবুকে চিৎপাত করে তেতো কুইনিন খাইয়েছিলেন। হাসি বন্ধ করার এহেন কৌশল সত্যই অভিনব ও উপভোগ্য। এই চরিত্রটি সম্পর্কে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ 'সেইসব দিন' এর একটি উক্তি মনে পড়ে — " সেখানে প্রবাসী খ্যাত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায় — এছাড়া প্রবোধবাবু, অচিন্ত্যবাবু, বিভূতি বাঁড়ুয্যে, ভয়াবহ এন. দাস, (ভয়াবহ এই জন্য যে, কেউ হাসিয়ে দিলে', তিনি দুই পাশে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের প্রচণ্ড চিমটি কেটে শরীরে কালসিটে পড়িয়ে দিতেন) এছাড়াও কিছু বৈঠকদার আসতেন।"[৪২] এই ভয়াবহ আর. এন. দাসের কথা এঁদের কারো কাছে শুনেই হয়তো নারায়ণবাবু 'গজকেষ্টবাবুর হাসি' গল্পটি লিখেছেন।

নারায়ণবাবুর এইসব গল্পের হাস্যরসের স্বাদুতার অন্যতম কারণ সম্পর্কে সমরেশ মজুমদার যথার্থই বলেছেন — "প্রসন্ন হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত হাসি, স্মিত হাসি থেকে প্রাণখোলা হাসি, তির্যক হাসি পর্যন্ত — সব হাসিতেই শিল্পীর ব্যক্তিত্বটি সহজ সুন্দরভাবে উন্মোচিত হয়।"[৪৩] 'গজকেষ্টবাবুর হাসি' গল্পটিতে যেমন প্রাণখোলা হাসির পরিচয় মেলে, তেমনি 'দুরন্ত নৌকা ভ্রমণ' গল্পে তির্যক হাসির সাক্ষাৎ পাই। শ্লেষে, বিদ্রূপে, ঈষৎ বঙ্কিম এই তির্যক হাসি। এই গল্পে ঝাঁকে ঝাঁকে গজিয়ে ওঠা শখের কবিদের প্রতি লেখকের সরোষ নয়, সরস কটাক্ষ আছে। রবি ঠাকুরের মত বিশ্বকবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে হারাধন হাওলাদারের যে করুণ অবস্থা হয়েছিল, তারই হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনা আছে এই গল্পে। এখানে হারাধনবাবু কোনও ব্যক্তিবিশেষ নন, তিনি এ যুগের শখের কবিসমাজের প্রতিনিধি মাত্র। তিনি সম্পাদকদের তেল দিয়ে কবিতা শোনাতে ব্যর্থ হয়ে এবং খাবারের লোভ দেখিয়ে বন্ধুদের কবিতা শোনাতে অসমর্থ হয়ে অভিমানে দেশত্যাগ করেছেন। আর যাওয়ার সময় প্রতিজ্ঞা করেছেন — 'ফিরব—এই বাঙলা দেশেই ফিরব— প্রতিভার লেলিহান আগুন জ্বেলে ফিরব'।[৪৪] রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে তিনিও নৌকাতে বসে কাব্যচর্চায় মেতেছেন। এর মধ্যে রাত গভীর হয়েছে আর কচুরিপানায় আটকেছে জলপথ। ডাকাতের ভয়ে কাব্যচর্চা মাথায় উঠেছে হলধরবাবুর। অবশেষে নৌকা ফেরাতে গিয়ে তিনি জলে নাকানি চোনি খেয়ে নৌকো ডুবিয়েছেন। সারারাত ধরে সেই কচুরিপানাময় জলে ডুবে, কাদা মেখে, মশার কামড় খেয়ে নৌকো জল থেকে তুলেছেন। তারপর দেড়মাস পরে ম্যালেরিয়ার পীলে সম্বল করে ফিরে এসে স্বীকার করেছেন "না, আর কবিতা নয়। যে কবিতা লেখে সে শুধু ভোম্বল নয় — এক নম্বরের ডম্বোল"।[৪৫]

'ভজরামের প্রতিশোধ' গল্পেও এ জাতীয় বক্রহাসির নমুনা মেলে। এই গল্পে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সাহিত্যিক ভজরামবাবু ও সাহিত্যিক দোলগোবিন্দরামবাবুর রেষারেষি ও প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছে যেমন, হাস্যকর, তেমনি উপভোগ্য। এরকম চরিত্র বাস্তবে মোটেই দুর্লভ নয়। লেখকের কৌতুক-কটাক্ষ ঐ জাতীয় চরিত্রের প্রতি।

ভূতপ্রেতের ভয় যেমন বেশি শিশুদের মনে, তেমনি অশরীরীদের প্রতি তাদের আকর্ষণও প্রবল। নারায়ণবাবু যুক্তিবাদী কলম দিয়ে ছোটদের এই মিথ্যে ভয় ভাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। অথচ তিনি ভূতের গল্পের শিহরণ ভরা আকর্ষণও বজায় রেখেছেন।

হাস্যরসের মোড়কে তিনি এ জাতীয় গল্পে বুদ্ধি ও যুক্তিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। একদিকে ভৌতিক গল্পের রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠা, অপরদিকে কৌতুকরস — এই দু'য়ের সার্থক সমাবেশে কিশোর-মন পরিতৃপ্ত হয়েছে তাঁর ভূতের গল্পগুলি পড়ে। এখানেই নারায়ণবাবুর গল্পের বিশিষ্টতা। 'ভুতুড়ে' এইরকম একটি গল্প। লেখকের অন্যান্য গল্পের মত এই গল্পেও ভূতের কোনও অস্তিত্ব নেই, আছে হাস্যকর একটি ঘটনা যা ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সাময়িকভাবে; গল্পের শেষে ভূতের আসল রহস্যভেদ হাস্যরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। গল্পের সূচনায় গা ছমছমে পরিবেশ 'বর্ষা পিছল রাস্তা;' 'কালির মতো অন্ধকার'; 'দৈত্যের মতো গাছের দুলুনি'; 'বিদ্যুৎচমক।' এইরকম পরিবেশে শ্মশানযাত্রীরা দেখেছে গঙ্গার জলে মড়া নড়ে উঠেছে ও ক্রমে তা জলের দিকে নামতে শুরু করেছে। তিন বন্ধু মিলে সেই মড়া তো টেনে তুলতে পারেই নি, বরং মড়াই তাদের সলিল সমাধির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। এই চরম উৎকণ্ঠার মুহূর্তে আরও দু'জন এসে তাদের সাহায্যে করায় তারা অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে। শেষ পর্যন্ত জানা গেছে কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার নয়, 'কালনার গঙ্গার বিখ্যাত অতিকায় কচ্ছপ'; তার টানেই মরা গঙ্গার জলে ক্রমশ নেমে যাচ্ছিল, যা শ্মশানযাত্রীরা মড়ার টান ভূতের ব্যাপার মনে করেছিল। গল্পটির প্রতিটি মুহূর্তই রোমাঞ্চকর এবং সমাপ্তিটি অবশ্যই নাটকীয়। ধাপে ধাপে রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চের চূড়ায় উঠে আচমকা এমন বাস্তব হাস্যরসঘন সমাপ্তি অবশ্যই উপভোগ্য। যেন অন্ধকারময় গোলকধাঁধাঁর পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ রৌদ্রকরোজ্জ্বল খোলা আকাশের নীচে পৌঁছনো যে আকাশে আছে নির্মল, প্রসন্ন হাস্যরসের বিস্তার।

'ভূত মানে ভূত' গল্পটি অনেকটা এই ধরণেরই। সমগ্র গল্পটি সংলাপের ঢঙে রচিত এবং গল্পটির নাটকীয় গঠনভঙ্গিও অভিনব। ভূতের গল্পগুলির মধ্যে নারায়ণবাবুর ছেলেবেলায় লেখা 'করিম মিঞা' গল্পটি কিছুটা আলাদারকম। এ গল্পে ভূত আছে; ছেলেমানুষ নারায়ণের ভূতে বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। তখনও সম্ভবত তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। ছেলেবয়সেও লেখকের কৌতুকপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পেয়েছে। ডাক্তারের অবহেলার প্রতিশোধ নিতে ভূত হয়ে জাকির মিঞা ডাক্তারের চায়ে কুইনিন মিশিয়ে দিয়েছে। ভূতের এই আচরণ বাস্তব রক্তমাংসের মানুষেরই মতো, একটুও ভীতিপ্রদ নয়। গা-ছমছম করা রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি হয় নি। নির্দোষ রসিকতাময় কৌতুকই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। এতে বাংলার মোপাসাঁ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পের মতো লঘু হাস্যরসের স্বাদুতা আছে। আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (নারায়ণবাবুর স্ত্রী ও পুত্র) যথার্থই বলেছেন — ''মাত্র ৭-৮ বৎসরের ছেলের পক্ষে এ ধরণের লেখায় পরবর্তী কালের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের টেনিদার গল্পের কৌতুকপ্রিয়তার আঁচ পাওয়া যায় গল্পটিতে।'[৪৬] গল্পে করিম মিঞার দুষ্টুবুদ্ধির কথা পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর সহপাঠী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি উক্তি মনে পড়ে —'' দুষ্টুমি বুদ্ধি ছিল তার যথেষ্ট। বন্ধুদের নামে সে মজার গল্প বানাত। আমিও বাদ যাই নি।''[৪৭]

তিনি কিশোরদের জন্য কেবল হাস্যরসের গল্পই লেখেননি, ভিন্ন স্বাদেরও কিছু গল্প লিখেছেন। যেমন, 'সেই বইটি' নামক গল্পে লেখকের স্মৃতিচারণা তথা 'নস্টালজিয়া' যুক্ত হওয়ায় গল্পটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। পরিণত বয়সে বইয়ের দোকানে বই নাড়াচাড়া করতে করতে প্রিয়দর্শন মিত্রের রচিত 'গহন বনের গল্প' তাঁর মনের গহনে নাড়া দিয়ে তাঁর ছেলেবেলাকে জাগিয়ে তুলেছে। সেই রমণীয় স্মৃতি গল্পটির প্রাণ। পুরানো, অনামী, বাতিলের দলে ফেলা ঐ বইটি লেখকের শৈশব-স্বপ্নের ছোঁয়ায় এমন অমূল্য, দুষ্প্রাপ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে, বিস্ময় বিমুগ্ধ পাঠকের মনও যাত্রা করে সেই শৈশবের স্বপ্নলোকে। 'ছেলেবেলার সেই ছুটির দিন — স্বপ্নভরা দুপুর' — লেখকের মতো পাঠকের বুকের ভিতরে 'রিম্ ঝিম্' করে বেজে ওঠে। শৈশবের স্বপ্ন, রহস্য-রোমাঞ্চের নেশা, সুদূরাভিসারী কল্পনা হৃদয়ে ঘনিয়ে আসে। স্কুলে পড়ার সময় লেখক 'গহন বনের গল্প' বইটি কুঞ্জের কাছ থেকে পড়তে নেবার জন্য কুঞ্জকে ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স কেনার পয়সা দিয়ে চা, চপ, সিগারেট খাইয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে চড় খেয়েছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটি তিনি পান নি। শৈশবের সেই না পাওয়ার বেদনা কালের প্রলেপে ঢাকা পড়েছিল মাত্র, কিন্তু পরিণত বয়সে সেই বইটি যখন তাঁর হস্তগত হলো তখন 'ছেলেবেলার হারানো দুপুরে রোদ লেগে' ঐ পুরানো ক্ষতের বেদনাই লেখকের বুকের ভিতর অশ্রু-মুক্তা হয়ে জ্বলজ্বল্ করেছে। সেদিনের নিশির ডাকের মত মোহময় হাতছানি দেওয়া না পাওয়া বইটি আজ তাঁর হাতের মুঠোয়। কিন্তু লেখক সেই বইটি পড়তে আজ ভয় পেয়েছেন; কারণ, পরিণত মনে যদি বইটা তাঁর আজ ভাল না লাগে? তার চেয়ে আফ্রিকার জঙ্গল কৈশোরের স্বপ্ন হয়েই থাক্। একটা রোমান্টিক ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছেলেমানুষ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর কিশোরদের জন্য রচিত গল্পগুলি আজও সমভাবে আকর্ষণীয়। সমালোচক সুদীপ বসুর ভাষায় —— ''বয়ঃসন্ধির আগে এবং বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের ভালোলাগার গল্প লেখা বোধহয় সবচেয়ে কঠিন। কি তারা চায় আর কি না চায় দেবা ন জানন্তি। নারায়ণ বাবু তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝেছিলেন''।[৪৮] এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে সুপ্রিয় সেনের বক্তব্যও যথোচিত —— ''ছোটদের জন্য লিখতে তিনি আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। বড়দের জন্য লেখার সময় লেখককে অনেক সতর্ক থাকতে হয়, কলমকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত ছেড়ে দেওয়া যায় না, রাখতে হয় লাগাম কষে। কাহিনীর বুনোটে কোন শৈথিল্য থাকলে

চলবে না, প্রতিটি শব্দচয়ন হবে কঠিন মানসিক বিচার-বিবেচনার পর। তার আঙ্গিক এবং সারবস্তু খেয়ালখুশীর ফসল নয়, পরিশ্রমসাধ্য চিন্তার দান। কিন্তু কিশোরদের জন্য যে সব গল্প, উপন্যাস, নাটক নারায়ণবাবু লিখেছেন, সেগুলো তাঁর সাহিত্যের আনন্দমেলায় খোলা গলার গান। তাতে হয়ত কঠিন সাধনার স্বাক্ষর নেই, আছে মুক্ত আকাশে ডানা মেলে চলার মজা। কলমকে ছেড়ে দিয়েছেন খেয়াল খুশির পাখনা দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিশীলতায়''।[৪৯]

উৎসপঞ্জী

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আমার কথা' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৭

২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কি করে লেখক হলাম' (২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৫; আকাশবাণীতে পঠিত)

৩। ঐ

৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দুর্ধর্ষ মোটর সাইকেল' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ১৩৩

৫। ঐ পৃঃ ১৩৪

৬। ঐ পৃঃ ১৩৭

৭। সুদীপ বসু ঃ 'টেনিদা-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং' ('কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯২) পৃঃ ৭৬

৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'লঙ্কানাথম্ কট্টুসুন্দরম্' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ৪৪

৯। ঐ পৃঃ ৪৫

১০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ভূতুড়ে কামরা' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩) পৃঃ ৪৮

১১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ব্রহ্মবিকাশের দন্তবিকাশ' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ মার্চ, ১৯৮১) পৃঃ ২৪

১২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ন্যাংচাদার হাহাকার' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩) পৃঃ ২৮

১৩। ঐ পৃঃ ৩২

১৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ঘন্টাদার কাবলুকাকা' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ৫

১৫। আশা দেবী ঃ 'আসল টেনিদা' ('সেরা সন্দেশ' ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ)

১৬। ঐ

১৭। 'Power News' : VOL. 3, SEPT-NOV, 1995-96 পৃঃ ২৩

১৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আমার কথা' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৭

১৯। সাক্ষাৎকার ঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঃ স্থান পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, ১৮.৭.৯৪

২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'ক্যামোফ্লেজ' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৪২

২১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'মৎস্য পুরাণ' (ঐ) পৃঃ ১০

২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দি গ্রেট ছাঁটাই' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ৩৯

২৩। সরল দে ঃ 'টেনিদার গল্প ও বুড়ো নামে সেই ছেলেটা' ('রোশনাই' পত্রিকা, ডিসেম্বর - জানুয়ারী, ১৯৭০-৭১) পৃঃ ২৩০

২৪। ঐ

২৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ঘোড়ামামার অবদান' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ৯

২৬। ঐ

২৭। ঐ

২৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ঘোড়ামামার অবদান' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ১১

২৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কুট্টিমামার দন্তকাহিনী' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খণ্ড প্রঃ প্রঃ ১৯৮৭) পৃঃ ৬১

৩০। ঐ পৃঃ ৬৩

৩১। সমরেশ মজুমদার ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' (প্রঃ প্রঃ ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮৬) পৃঃ ১৯ থেকে সংগৃহীত

৩২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কাঁকড়াবিছে' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ মার্চ, ১৯৮১) পৃঃ ৬১

৩৩। ঐ পৃঃ ৬৪

৩৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'পেশোয়ার কি আমীর' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৮০

৩৫। ঐ পৃঃ ৮৩

৩৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'পিসেমশায়ের মামার গল্প ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ৬১

৩৭। ঐ পৃঃ ৬২

৩৮। ঐ পৃঃ ৬৩

৩৯। সুদীপ বসু ঃ 'টেনিদা - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং' ('কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৯২) পৃঃ ৭৮

৪০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'গজকেষ্টবাবুর হাসি' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৮৭) পৃঃ ২৫

৪১। ঐ পৃঃ ২৬

৪২। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ঃ 'সেইসব দিন' (প্রঃ প্রঃ ১৩৯৭) পৃঃ ১৩৩-৩৪

৪৩। সমরেশ মজুমদার ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' (প্রঃ প্রঃ ২৮শে নভেম্বর ১৯৮৬) পৃঃ ১৮

৪৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দুরন্ত নৌকাভ্রমণ' ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ১২৬

৪৫। ঐ পৃঃ ১৩২

৪৬। ('সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ১২৭

৪৭। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' ('রোশনাই' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৭) পৃঃ ২১৭

৪৮। সুদীপ বসু ঃ 'টেনিদা-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং' ('কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৯২) পৃঃ ৭৩

৪৯। সুপ্রিয় সেন ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য' ('কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৯২) পৃঃ ১৫৬

পঞ্চম অধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রসাধনকলা ঃ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী

ছোটগল্প মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যময় দিক প্রকাশ করে। তাই তার ভাষা বিষয় অনুযায়ী না হলে পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারেনা। এদিক থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাফল্য বিস্ময়কর। তাঁর গল্পে বক্তব্য ও বাচন-ভঙ্গির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। তিনি গল্পের বিষয় অনুযায়ী ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিষয় ও ভাবোপযোগী ভাষা ব্যবহার করে গল্পের আবেদনকে তিনি পাঠকের মর্মমূলে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই কখনো তাঁর ভাষা পল্লবিত পুষ্পের মতো, কখনো শাণিত তরবারীর মতো, কখনো আবার এই ভাষা রৌদ্র-রসে সমুজ্জ্বল গুণীনের ছোঁড়া বাণের মতো অলৌকিক এবং ভয়ঙ্কর। ভাব ও বিষয় অনুযায়ী সবসময় তাঁর ভাষা বদলে গেছে। আসলে গল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে প্রসাধনকলা হিসেবে ভাষাকে তিনি নিপুণ শিল্পীর মতো ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন বিষয় ও ভাবকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে ভাষাকে ব্যবহার করেছেন, তা কিছু উদাহরণ দিয়ে এবার বোঝাবার চেষ্টা করছি।

'বীতংস' গল্পে সাঁওতাল পরগণার অপূর্ব বনশ্রী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন 'এখানে জঙ্গলের মধ্যে ডুমডুম করে টিকারা বাজে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়। যখন মহুয়া বন আকুল হয়ে ওঠে, ছোট ছোট গোলাপজামের মতো মহুয়ার সাদা ফুলগুলি তিক্ত মধুর রসে টস্‌টস্‌ করতে থাকে, আর তার গন্ধে হরিয়ালের দল এসে ডালে পাতায় নাচানাচি করে তখন সুন্দরলালেরও যেন নেশা ধরে যায়।'[১] এখানে ভাষা রোম্যান্টিক স্বপ্নভারে মদিরালস। কাব্যধর্মিতা এ ভাষার ভিতরকার সম্পদ। সরস মাধুর্যও ভাষার আস্বাদ বহন করে। সর্বোপরি ব্যঞ্জনার অনুরণন এ ভাষার পরিধিকে বহুদূর বিস্তারিত করে।

কেবল প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রেই নয়, নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়েও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ, কোমল ও রোম্যান্টিক। 'অপঘাত' গল্পে 'রানীর মতো লঘুছন্দে আসে নমিতা, কপালে কাঁচপোকার টিপটি জ্বলজ্বল করে, পিঠের ওপর সবুজ ফিতে জড়ানো বেনীটি দোলা খেতে থাকে আর তারই তালে তালে দোলে সঞ্জীবের হৃৎপিণ্ড।'[২] এত সহজ, সরল, অলঙ্কার ভারহীন, অনাড়ম্বর ভাষাকে লেখক এখানে কেবল প্রসাদগুণে রমণীয় করে তুলেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানে রমণীর মুখশ্রী বা অঙ্গের কোন বর্ননা নেই; কেবল সাজ-সজ্জার চকিত আভাসে, লঘু পদ-ছন্দে নমিতা কেবল সঞ্জীবের বুকে নয়, পাঠকের বুকেও দোলা লাগিয়েছে। ভাষা কতখানি শক্তিশালী এবং ভাবগ্রাহী হলে এমন হওয়া সম্ভব, তা সত্যিই চিন্তা করবার বিষয়।

প্রেমের স্পর্শে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা হয়ে উঠেছে আরও রোম্যান্টিক, আরও ব্যঞ্জনাবাহী। 'কেয়া' গল্পে কারারুদ্ধ জয়ন্ত দেখেছে 'ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নেমে এসেছে।' আর তার মনে পড়েছে 'এমনি বর্ষাতেই, লাখুটিয়ার খালের ধারে, নীল-কাজল ছায়ার আড়ালে কেয়াফুল ফোটে।'[৩] নারী 'কেয়া'র ভালবাসা এখানে কেয়াফুলের স্নিগ্ধ কোমলতা ও সুগন্ধ নিয়ে বিপন্ন জয়ন্তকে ঘিরে ধরেছে স্বপ্নের মতো। এত সংক্ষিপ্ত, ইঙ্গিতগর্ভ, ভাবগভীর ভাষা সচরাচর দেখা যায়না। ভাষার ব্যঞ্জনা এখানে মেঘের 'নীল-কাজল' ছায়ার ভিতরে কেয়াফুলের গন্ধে আকুল।

প্রকৃতি-জগতকে সঙ্গীত-চেতনার ছাঁচে ঢেলে যখন পরিবেশন করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তখন তাঁর ভাষা সপ্ত সুরের মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছে। যেমন 'আলেয়ার রাত' গল্পে হারাণ ভেবেছে 'ওই নদীটা ঠিক কোনো পুরোনো বড় ওস্তাদের মতো ঝিম মেরে চুপচাপ বসে থাকে -- বাহবা চায়না, আসরে যায়না - লোকে ভাবে মানুষটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসে বুড়ো ওস্তাদ তানপুরা টেনে নেয়, ধীরে ধীরে গলা খোলে তারপরেই বিদ্যুতের মতো খেলতে থাকে সারগমের ঝলক। পাহাড়ী ঢলের মতো সব ভাসিয়ে দিয়ে সুরের বাণ আসে - তখন কে দাঁড়ায় তার সামনে? এই জংলী নদীটাও ঠিক সেই ওস্তাদের মতো আজ ওর গলায় আকাশ ভাঙ্গা মিঞাকি মল্লারের সুর লেগেছে।'[৪] এ ভাষা কেবল যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গীত বিষয়ক জ্ঞানের কথা সপ্রমাণ করে তাই নয়, সঙ্গীতের মতো মধুর ভাবাবেশে আচ্ছন্ন করে। এ ভাষার প্রথমাংশে যেন রাগ-রাগিণীর বিলম্বিত লয়ে আলাপ, তারপরেই দ্রুতলয়ে তান-বিস্তার। মিঞাকি মল্লারের সুরের ইন্দ্রজাল এ ভাষার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা এ ভাষাকে শাব্দিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে প্রসারিত করে দিয়েছে অনন্তলোকের দিকে।

সমাজ-সমস্যার ক্ষেত্রে আবার এই একই লেখকের ভাষা হয়ে উঠেছে ক্ষুরধার। 'হাড়' গল্পে বেকার যুবক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, শোষিত মানুষকে দেখে ভেবেছে 'দেশজোড়া ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে। একমুঠো ভাত আর এক খাবলা বাজারই কি যথেষ্ট এর পক্ষে?' আরো বেশি- আরো বেশি এমনকি রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের এই ছবির মতো বাড়িগুলো পর্যন্ত?'[৫] এখানে ভাষার মধ্যেও যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই আগুনের আঁচ এসে লেগেছে পাঠকের মনেও।

আবার 'বীতংস' গল্পে সুন্দরলালের ভাবনার ভাষা সমাজের বাস্তব নিষ্ঠুরতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে- 'আসামের চা বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো

নেই। বুধনীকে বাদ দিয়ে— আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করতে লাগল বুধনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশজন কুলিতে তার কমিশন পাওনা হয় কত?'[৬]

রাজনৈতিক গল্পের ভাষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে আবেগ-উদ্দীপ্ত। শাণিত, জ্বালাময়ী, আগ্নেয় ভাষা ব্যবহার করে তিনি এ ধরণের গল্প লিখেছেন। যেমন 'নিশাচর' গল্পে লেখক লিখেছেন 'একথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিনা বাঁচতে আমাকে হবেই। আশ্রয় চাই, উত্তাপ চাই। নিদ্রিত নগরীর ঘরে ঘরে উষ্ণ লেপের তলায় আর উষ্ণ নারীমাংসের উত্তাপে পূর্ণোদর মানুষ স্বপ্ন দেখছে এখন। নিয়মিত চাকুরি, নিভৃত নীড়, নিশ্চিন্ত প্রেম। বাইরে অন্ধকার কালো রাত্রির মধ্যে সহস্র বাহু প্রসারিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পঙ্কিল কামনা, তীক্ষ্ণাগ্র হিংসা। আর-আর হয়তো অতন্দ্র হয়ে প্রহর .... কাটাচ্ছে নতুন প্রভাতের নতুন সূর্যের তপস্যা।'[৭] এ ভাষার প্রথমাংশে যে আবেগ, আকুলতা আছে তা রাজনৈতিক চেতনার স্পর্শে আরও মর্মস্পর্শী হয়েছে ভাষার শেষাংশে এসে। আর এই ভাষার মাঝের অংশে আছে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চিন্ত মানুষের স্বার্থপরতার প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বর্ষণ।

বিদ্রূপাত্মক গল্পে এই বিদ্রূপ আরও শাণিত। 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' গল্পে বক্তার ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে, তেরশ পঞ্চান্ন সালের মন্বন্তরের সময় গোপীবল্লভ কুণ্ডু 'সামান্য কিছু ধান চাল স্টক করেছিলেন সত্য, কিন্তু অন্যান্য অসাধু ব্যবসায়ীদের মতো তা থেকে তিনি নির্বিচারে লাভ করেননি— মাত্র সামান্য তিন লাখ টাকা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবে সঞ্চয় করেছিলেন। স্বীয় গ্রাম কুণ্ডুগ্রামে তখন যে লঙ্গরখানা খোলা হয়, তাতে তিনি এক সহস্র মুদ্রা চাঁদা দেন। এ থেকে তাঁর দানশীলতার সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়'।[৮] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা এখানে ক্ষুরধার, বক্র, শ্লেষে উজ্জ্বল। লেখক এখানে প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা করেছেন— অর্থাৎ ব্যজস্তুতি করেছেন কৌশলে বাক্য-বিন্যাস করে।

'আদর্শাত্মক' গল্পে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক গভীর, ভাবাবেগ সমৃদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'দাম' গল্পের শেষে সুকুমারের মনে হয়েছে 'স্নেহ-মমতা ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। সেই স্নেহ, কোটি মণি-মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয়না; সেই মমতা— যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা কুবেরের ভাণ্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায়না। আমি তাঁকে দশ টাকায় বিক্রী করেছিলুম। এ অপরাধ আমি বইব কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব।'[৯] — গভীর বোধ ও বেদনার স্পন্দন এ ভাষায় কান পাতলে শোনা যায়।

মনস্তাত্বিক গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় প্রশ্নমূলকতা ও তিক্ততা বেশি। বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা এবং বিশ্লেষণও এইধরনের গল্পের ভাষায় ব্যাপ্ত। অমনোনীতা' গল্পে লোকেনের মনে প্রশ্ন জেগেছে 'শুধু কম্প্লেক্স? কেবল ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্প্লেক্সেই এমনকরে পিছিয়ে গেল দুলাল, কোনো পুরুষ কি কখনো মেয়েদের কাছে এমনভাবে পিছিয়ে গেছে কোনোদিন?'[১০] তারপরেই আছে বিশ্লেষণ—উল্টোটাই বরং হয়। ভাল লাগা না লাগার কারণ খুঁজতে গিয়ে অনুসন্ধিৎসু লোকেন ভেবেছে 'কোনো অবচেতনার অন্ধকারে হয়তোবা সে রহস্য লুকিয়ে আছে।'[১১] আর গল্পের শেষদিকে লোকেন যখন অনুভব করেছে 'একটা দুরারোগ্য নিষ্ঠুর ব্যাধির কীট তার হৃৎপিণ্ডে বাসা বেঁধেছে। এরপর থেকে দিনের পর দিন সেই বীজানুরা তাকে তিলে তিলে খেয়ে চলবে, সে আর বাঁচতে পারবে না — তার আর পরিত্রাণ নেই।'[১২] তখন ভাষা হয়ে উঠেছে তিক্ত।

'রূপক সাঙ্কেতিক' গল্পে লেখকের ভাষা কখনো রূপকথার মতো অপরূপ, কখনো প্রশ্নাত্মক বিশ্লেষণে মুখর, কখনোবা গভীর সঙ্কেতের তাৎপর্যবাহী। যেমন 'লালঘোড়া' গল্পে তেরো বছরের ছেলে স্বপ্ন দেখে 'লালু কিংবা চাঁদকপালীর পিঠে সোয়ার হয়ে আমি ছুটেছি। মরুভূমি, পাহাড়, বন সব পার হয়ে একদিন ছাড়িয়ে চলে গেলুম পৃথিবীর সীমা, ঝাঁপিয়ে পড়লুম শূণ্য আকাশে নীল, নীল, অনন্ত নীল, পেরিয়ে ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে ছুটল, তারায়, তারায় ক্ষুরে শব্দ বাজতে লাগল।'[১৩] এখানে রূপকথার অপরূপ শিল্পকথা মায়া ও মাধুর্যের এক স্বপ্নলোক গড়ে তুলেছে ভাষার যাদুতে।

এই গল্পেরই শেষের দিকে বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নের ভীড়— 'লালু কেন অমন করেছিল সেদিন? সত্যিই কি ইরাণীরা বিষ খাইয়েছিল তাকে? অষ্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি না সাহারার ডাক শুনেছিল সে? কোন্ যুদ্ধের দামামা তালে তালে সেদিন বেজে উঠেছিল তারি বুকের রক্তে?'[১৪] আর গল্পের শেষে গভীর ইঙ্গিতগর্ভী সঙ্কেতের তাৎপর্যবাহী ভাষার ব্যবহার আছে অত্যন্ত সংক্ষেপে 'কিন্তু আজ যেন দুটি সত্য একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি তার ভেতরে। মৃত্যু আর মুক্তি। মুক্তি আর মৃত্যু। কিংবা দুই-ই এক।'[১৫] সংক্ষিপ্ততা এ ভাষার ইঙ্গিতধর্মীতাকে আরও উজ্জ্বল করেছে, ভাষার সংকেতগর্ভ তাৎপর্যকে করেছে আরও গভীর।

বীভৎস রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও অতিপ্রাকৃত পরিবেশ নির্মাণের ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষাশৈলী বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। 'টোপ' গল্পে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে, প্রকৃতির মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অনুভব জাগিয়ে তুলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন 'জঙ্গলের ভেতরে বসে আছি মোটরে। দুটো তীব্র হেড লাইটের আলো পড়েছে সামনের সঙ্কীণ পথে আর দুধারের শালবনে। ওই আলোকরেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারিদিকে অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দূরের কোনো পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর

প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে আছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।'[১৬] রুদ্র প্রকৃতির নিষ্ঠুর ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষাও এখানে হয়ে উঠেছে দুঃস্বপ্নের মতো ভয়াবহ ও অলৌকিক। আর এই গল্পেই বীভৎস রসের সৃষ্টি হয়েছে তখন, যখন টোপের স্বরূপ বুঝে 'আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার! কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?'[১৭] এখানে এক পৈশাচিক বীভৎসতায় ভাষা যেন শিহরিত হয়ে উঠেছে।

নারী ও পুরুষের বিচিত্র সম্পর্ককে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃথক পৃথক ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রেমের অলৌকিক স্পর্শে এ ভাষা রোমান্টিক, ব্যঞ্জনাবাহী। আবার এই প্রেমই যখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়, তখন ভাষা হয়ে ওঠে তিক্ত, তীক্ষ্ণ শায়কের মতো। আবার নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যখন জায়গা করে নেয় দ্বিধা, সংশয়; ভাষাও তখন যেন থমকে দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা চিহ্নে।

প্রথমোক্ত ভাষার উদাহরণ মেলে 'একটি চিঠি' নামক গল্পে। এ গল্পের নায়িকা শৈশবে তার সাথীর সঙ্গে একটি ফুলের গাছ লাগিয়েছিল। যৌবনে সেই স্মৃতি প্রেম হয়ে তার বুকে বেজেছে। তার ভাষায় 'জানো, এত দুঃখেও আমাদের গাছটাকে ভুলিনি। কত বড় হয়েছে— কী অজস্র ফুল ধরে। কিন্তু একটা ফুলও আমি কাউকে নিতে দিইনা। কত ভোরের আবছা আলোয়, কত রিমঝিম দুপুরে টগর ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে যায় আমি চুপ করে বসে থাকি, দেখি পুতুলের বিয়ের স্বপ্ন।'[১৮] এখানে ভাষাতেও যেন টগর ফুলের ঘ্রাণ, মধুর স্বপ্নের আবেশ।

'অপঘাত' গল্পে দ্বিতীয়োক্ত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। নমিতার রূপ-গুণ-মুগ্ধ সঞ্জীব যখন নমিতার আদর্শহীন স্বার্থপরতা ও ভীরুতার পরিচয় পেয়েছে, তখন তার মনে হয়েছে 'আশ্চর্য, এ তৃতীয় নমিতা। সত্যশরণবাবুর মতো এও নমিতার ক্যারিকেচার— এরও মুখে একটা বিচিত্র অস্বাভাবিকতা, একটা বিগলিত বিনয়ের ব্যঙ্গ। নমিতা কখনো এত কুৎসিত হতে পারে এটা স্বপ্নেরও অতীত ছিল সঞ্জীবের।'[১৯] ভাষার তিক্ততা ও তীক্ষ্ণতা এখানে যেন বিষমাখানো ছুরির মতো।

আর তৃতীয়োক্ত ভাষার নমুনা মেলে 'কাণ্ডারী' নামক গল্পে। কুশ্রী অখিল ঘোষ তার স্ত্রী অলকার পতি-প্রেম সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। তাই সে ভাবে 'সংসারে নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়া বোধহয় সবচাইতে কঠিন। অভ্যাসের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে স্বীকার করে নেওয়া যায়— চুক্তি করা চলে। কিন্তু সেই আশ্চর্য জিনিস? যা আলোর মতো স্পষ্ট— কোন রূপ নেই অথচ যার জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তি; যা শান্ত অন্ধকারের মতো — যার শীতল বিশ্রামের ভেতর সমস্ত স্নায়ুগুলো গভীর শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে চায়? অনিচ্ছুক দাম্পত্য জীবনের ভেতরে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?[২০] এখানে ভাষা-কুশল লেখক আশ্চর্যভাবে সংশয়, দ্বিধা, প্রশ্নময়তার মধ্যে রোম্যান্টিকতাকে পাঞ্চ করে দিয়েছেন।

পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব যখনই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে এসেছে, লেখকের ভাষায় আবেগ, মমত্ব, বেদনা ও যুক্তিবাদের সম্মিলন ঘটেছে।

'ভাঙ্গা বন্দর' গল্পে পুরোনো বন্দরের সমৃদ্ধির কথা ভেবে শ্রীধর মিত্তির আক্ষেপ করেছে- 'উঃ, কী ছিল আর কী হয়েছে। তখন কোথায় থাকত নারায়ণগঞ্জ আর কোথায় দাঁড়াত ঝালকাঠি! হাওয়ায় উড়ে আসত টাকা— আকাশে আগুনের মতো উড়ত টাকার ফুলকি। পাট আর সুপুরির মরশুমে এখানে এসে জড়ো হত সমস্ত বাংলাদেশ। আর আজ— বল কি, দুঃখ হয়না?'[২১] এখানে পুরনো দিনের প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা ও বর্তমানের বেদনা জড়িয়ে আছে ভাষার শরীরে আবেগ-কম্পিত নস্টালজিয়ার মতো।

আর গল্পের শেষে একটিমাত্র বাক্যে নিষ্ঠুর যুক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অনিবার্যভাবে— 'ভাঙা বন্দর কোনদিন আর জোড়া লাগবেনা।''[২২] এত সংক্ষিপ্ত, অনিবার্য ভাষা প্রয়োগ লেখকের— শক্তিশালী লেখনীর পরিচয়-বাহী।

এভাবে আলোচনা করে দেখা গেল যে, বিষয় ও ভাবানুযায়ী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সচেতনভাবে সঠিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ভাষার এই নমনীয়তা বিস্ময়কর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন স্বাভাবিকভাবে মানুষের চেহারার পরিবর্তন হয়, বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষারও তেমনি স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে। কোথাও এ পরিবর্তন জোর করে কৃত্রিমভাবে করা হয়নি। এর থেকেই ভাষার ওপর নারায়ণবাবুর দখল কতখানি ছিল, তা বোঝা যায়।

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের ভাষায়— 'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষাকে বিগলিত করে স্বকীয়তার শীলমোহর অঙ্কিত এক অনবদ্য সুন্দর ভাষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আয়ত্ত করেছিলেন।'[২৩] আমার মনে হয় সেইসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় সৌন্দর্যের সঙ্গে বীভৎসতার যে দ্বৈত-রাগিণী গীত হয়েছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় তারও প্রভাব দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করে আমি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা-রীতির পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষার সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে

রাখা কর্তব্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র বহু পূর্বকালের লেখক এবং তিনি প্রধানত উপন্যাসই লিখেছেন। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধোরোত্তর কালের ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ভাষার বিস্তর ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। তবু ভাষার কবিত্বে, নাটকীয়তায়, সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাগর্ভ বাক্য প্রয়োগে উভয়ের কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উপনিবেশ' এ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। অলঙ্কৃত সাধুভাষায় ক্লাসিক সাহিত্যের সুরারোপ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসটি লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্পে এত প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত, ইঙ্গিতগর্ভ, নাটকীয় কথোপকথন পরপর আছে অনেক সময় গল্পের বর্ণনাভঙ্গি ব্যতিরেকেই নাটকের মতো করে।

যেমন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন –

'মহেন্দ্র। সন্তান কি ? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল— সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে ? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি ডাকাতি করিনা।

মহে। এইত গাড়ী লুঠিলে।

ভবা। সেকি চুরি ডাকাতি ? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার?

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। যে রাজ্য পালন করেনা, সে আবার রাজা কি ?'[২৪]

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিতির' গল্পে সুখলাল আর জুলফিকারের কথোপকথন নিম্নরূপ ঃ

'আমার ভাই মরল, মামা মরল।'

'আমার ঘর দরজাভি নিকাশ হয়ে গেল।'

'ওরা আরামসে আছে।'

'ওরাই থাকবে।'

'আমার ঘর নিল!'

'আমার ইজ্জত নিল।'

'ওদের জন্য দুসরা কানুন।'

'হাঁ, ওদের কানুন আলাদা।'[২৫]

দুই ক্ষেত্রেই ভাষা সংক্ষিপ্ত ও নাটকীয়। উভয় ক্ষেত্রেই শাসক শ্রেণীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশিত। কিন্তু প্রথমক্ষেত্রে ভাষায় বিদ্রোহের বলিষ্ঠ উত্তাপ। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাষায় নিরাশা ও তিক্ততার উদ্গার। প্রথমক্ষেত্রে সাধুভাষা ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে চলিত ভাষার ব্যবহার এবং বঙ্কিমচন্দ্র তবু সংলাপের পাশে বক্তার নামোল্লেখ করেছেন, নারায়ণবাবু তাও করেননি।

দুর্যোগময় প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে এই দুই লেখকের ভাষায় নাটকীয়তার স্পর্শ লেগেছে। কবিত্ব ও নাটকীয়তার মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁদের এ ধরণের বর্ণনায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লিখেছেন 'এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল।'[২৬] এবং 'আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ ব্যাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে।'[২৭]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'তীর্থযাত্রা' গল্পে লিখেছেন 'ওইখানে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের রাশ জমে উঠেছে। ফরিদ মাঝি জানে লক্ষণ

ভাল নয়। কালো কালিন্দীর মতো মেঘনার জল থেকে কালীয়নাগের বিষ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে যেকোন মুহূর্তে ওই হাঁসের পাখার মতো মেঘ কষ্টি পাথরের রঙ ধরে দিগ্-দিগন্তকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। তারপর মাতাল মেঘনাতো রইলই।'[২৮]

এখানে দুই লেখকই গম্ভীর, অলঙ্কৃত, রোমাঞ্চকর, কবিত্বময় ভাষায় প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করেছেন। উভয়েই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতার সম্ভাবনাকে ভাষা কৌশলে নাটকীয়ভাবে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুভাষায় তৎসম শব্দের ঘনঘটা ও মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য বেশি।

অতিপ্রাকৃত পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং বীভৎস রস সৃষ্টি করতে বঙ্কিমচন্দ্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর নরক যন্ত্রণাভোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— 'শৈবলিনী দেখিল সন্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই— দু-কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোত বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড কঙ্কালাদি ভাসিতেছে।'[২৯] এবং 'মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগতে লাগিল।'[৩০]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মর্গ' গল্পেও 'দুর্গন্ধ। অসহ্য দুর্গন্ধ। সে গন্ধে নিজের পাকস্থলীটা পর্যন্ত যেন ছিঁড়েছুঁড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে তীব্র ক্লোরোফর্মের বিষক্রিয়ার মতো ঝিমঝিম করছে। ভেজানো দরজাটাকে এক আঘাতে খুলে দিয়ে দমকা বাতাস সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। মড়ার গায়ের ওপর থেকে উড়ে পড়ল কাপড়টা, আর একটা বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল পচা ধরে আসা একটা বীভৎস দেহ— পেটটা দু ফাঁক করে চেরা।'[৩১]

উভয়ক্ষেত্রেই ভাষা যেমন বীভৎস ভীতির শিহরণ জাগিয়েছে, তেমনি ভাষার শরীরেও যেন পূতিগন্ধ জড়িয়ে আছে। দান্তের 'ডিভাইন কমেডিয়া'য় নরক বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষায় যে মহাকাব্যিক রূপ আছে, তা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় মেলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় এই মহাকাব্যিক গঠনশৈলী এখানে অনুপস্থিত। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার ভাষায় যে শিল্পীর নিরাসক্তি আছে, তা নারায়ণবাবুর লেখায় তত নেই। এখানে দুর্গন্ধ কেবল অনিরুদ্ধর নাকেই আসেনি, লেখকও যেন এই দুর্গন্ধে শিউরে উঠেছেন। তাই ভাষা হয়ে উঠেছে আবেগ-তাড়িত। সুতরাং আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার নাটকীয়তা, কবিত্ব ও ভয়ঙ্করতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় অনেকাংশে থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার গাম্ভীর্য, উদাত্ততা ও ঐশ্বর্য তাঁর ভাষায় অনুপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যে উচ্চস্তরের হাস্য-কৌতুক আছে, তাও তাঁর ভাষায় দুর্লভ। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাকে যদি ঢাকাই বেণারসীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা তাহলে বাংলার ধনেখালি শাড়ি। এ ভাষায় চোখ ধাঁধাঁনো সমৃদ্ধি নেই, আছে আটপৌরে ভাষার রুচিসম্মত শিল্পরূপ।

এবার আসছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষারীতির সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের ভাষার তুলনামূলক আলোচনায়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী চিঠিতে লিখেছে— 'ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন্ শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম, সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত ঝরে পড়তো, রাঙামালায় সে রাঙা রং তুমি চিনতে পারোনি।'[৩২] এই রোম্যান্টিক প্রেমের বেদনা ও আবেগ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষাতেও 'একটি চিঠি' গল্পে চিঠির বয়ানে আছে-'আমি কিন্তু মনে রেখেছিলুম। বছরের পর বছর কাটতে লাগল, বারেবারে আমার টগর গাছটি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। আমি আর পুতুলের বিয়ে দিইনি— গাছের একটি ফুল তুলিনি, একটিও তুলতে দিইনি কাউকে।'[৩৩]

ভণ্ড চরিত্রের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় শরৎচন্দ্রের মতোই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে লালসাসক্ত বিষয়ী গোলক চাটুয্যে বলেন 'বুকের মধ্যে দিবারাত্রি হু হু করে জ্বলে যাচ্চে— হায়রে! আমার আবার হাসি, আমার আবার তামাসা। তবে মাঝে মাঝে— তা যাক নাই বললুম। কেউ অসন্তোষ হয়, জীবনে যা করিনি, আজই কি তা করব? বিষয় বিষ! সংসার বিষ! কবে, তোমার শ্রীচরণে একটু আশ্রয় পাবো! মধুসূদন!'[৩৪]

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নক্রচরিত' গল্পে চোরাকারবারী নিশিকান্ত লোককে ঠকাবার সময় বলে 'কেন এত অবিশ্বাস বলতো। তোমাদের এত কষ্টের রোজগার, মিথ্যে প্রবঞ্চনা যদি করি তাহলে তা কি ধর্মে সইবে কখনো। তাছাড়া পরলোকে জবাবদিহিও তো করতে হবে। যথা ধর্ম তথা জয়— অধর্মের রোজগার গোমাংস আর গোরক্ত।'[৩৫] -- উভয় ক্ষেত্রেই দুই লেখক ভণ্ডচরিত্র দুটিকে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে মানুষের প্রতি দরদ এবং বিদ্রোহের আভাসও এসেছে অরুণের মুখের ভাষাতে ' ...... এ গ্রামের বাস তুলে দিয়ে আর কোথাও যাবো কিনা, যেথায় বিনা দোষে মানুষে মানুষকে এত হীন, এত লাঞ্ছিত করেনা -- আমি সেই কথাই দিন-রাত ভাবছি।'[৩৬] শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প 'মহেশ'-এ এই বেদনা ও বিদ্রোহ আরও স্পষ্ট। এ গল্পের শেষে গফুর যখন বলে— 'আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে, তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করোনা।'[৩৭] তখন এই ভাষার বেদনা, জ্বালা হৃদয় স্পর্শ করে।

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ভাষায় দীর্ঘশ্বাসের চেয়ে— বেদনার চেয়ে সমাজে অন্যায় অবিচারের ক্ষেত্রে জ্বালাটা অনেক বেশি বড় হয়ে উঠেছে। মুসলমান ধাওয়া বসির জমিদারের অন্যায় অত্যাচারে গফুরের মতোই ভিটে ত্যাগ করার সময়ে ভেবেছে 'একটুর জন্য ফস্‌কে গেল হাসুয়াটা, পীরু মিঞার মাথাটাকে নামিয়ে দিতে পারলে কিছুমাত্র ক্ষোভ থাকত না আর।'[৩৮] ভাষা এখানে প্রতিবাদের হিংস্র আগুনে জ্বলে উঠেছে। সেই আগুনের আঁচ এসে লেগেছে পাঠকের মনে।

এভাবে আলোচনা করে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের মতোই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ভাবাবেগে পূর্ণ, বেদনায় গভীর ও প্রতিবাদে মুখর। চরিত্রোচিত সংলাপ রচনাতেও এঁরা দুজনেই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভাষার সহজতা, ঘরোয়াভাব ও গৃহিনীপণা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় দুর্লভ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা যেন বাড়ির রান্নাঘর, আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা যেন বাড়ির বৈঠকখানা — সাজানো, গোছানো, রুচি-সম্মত এবং তুলনামূলকভাবে একটু কৃত্রিম।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে সসম্মানে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি 'কথাকোবিদ্ রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প-উপন্যাস নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনাও করেছেন। তাই তাঁর লেখার ভাষাতে রবীন্দ্র-প্রভাব ভিতরে ভিতরে কাজ করে গেছে বলে মনে হয়। কিছু গল্পাংশের উদ্বৃতি দিয়ে আমার বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ভাষায় গদ্য কবিতার যে বর্ণ গন্ধ ও স্পর্শ মেলে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ভাষাও অনেকটা সেই কাব্যের ছন্দে ঝঙ্কৃত।

'বন-জ্যোৎস্না' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোৎস্নারাতের বর্ণনা দিয়েছেন 'পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে উৎরাইয়ের পথ। দু'ধারে শালের বন হাওয়ায় কাঁপছে। পাহাড়ী ঝাউয়ের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। জংলী কলার পাতাগুলো কাঁপছে। কাঁপছে জ্যোৎস্নার রঙ মেখে।'[৩৯] এখানে রোম্যান্টিক কাব্য, মাধুর্যময় ভাষা স্বপ্নভারে অলস। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পে একটি জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনার কথা মনে পড়ে 'আকাশের চন্দ্র, যমুনা পারের ঘনকৃষ্ণবনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি দূরে আম্রবর্নের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্না-চিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দ গম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল';[৪০] লক্ষণীয় এ দু'টি জ্যোৎস্না রাতের পটভূমি ও ভাব পৃথক, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা রোমান্টিক এবং কাব্যময়। প্রভেদ কেবল এইযে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এখানে তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দের বাহুল্য, এ ভাষার ভাব গভীর ও গম্ভীর; অনেকটা ক্লাসিক্যাল গানের মতো। আর ভাষাটিও সাধুভাষা। অন্যপক্ষে নারায়ণবাবুর ভাষা সহজ চলিত ভাষা, তার ভাব পাহাড়ী ঝর্ণার মতোই প্রবল, লঘুচ্ছন্দ ও তুলনামূলকভাবে তাতে গভীরতা কম।

বিবাহকে ঘিরে যে রোম্যান্স, তাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের মতোই অপূর্ব স্বপ্নময় ভাষার জগত নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' গল্পে বিবাহ ভঙ্গে লাঞ্ছিত যুবকটি ভেবেছে— সমস্ত মন যে অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারিনা। ...... কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল।'[৪১]

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শুভক্ষণ' গল্পে বিবাহ করবার জন্য যাত্রা করে নৌকায় চেপে যুবকটির মনে হয়েছে'সারা পৃথিবীটাই আজকে গায়ে হলুদ মেখে বসে আছে-চাঁদ থেকেও চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলুদ ঝরে পড়েছে চারদিকে। নৌকার ছলছল উলুধ্বনি দিচ্ছে, পাতায় পাতায় খস্‌খস্ করে বেজে উঠছে নতুন চেলির শব্দ, খালের ধারে নরম কাদা একরাশ শ্বেতচন্দন হয়ে গেছে, বাঁশের বনে রাত্রির হাওয়ায় শানাইয়ের সুর বাজছে।'[৪২] এ ভাষাও গদ্যের নয়, যেন কবিতার ভাষা। এ ভাষা যেন ফুলের কোমলতা, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা দিয়ে গড়া। ভাষার ফ্রেমে বাঁধানো চিত্রকল্প এখানে গড়ে তুলেছে কল্পনার জগত। প্রকৃতি তার শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ নিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত লোকে করেছে যাত্রা ভাষার স্বর্ণ-ডিঙিতে চড়ে।

'শেষের রাত্রি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর পর বহু সংলাপ ব্যবহার করেছেন ভাষায় নাটকের মতো। গল্পের সমাপ্তিও ঘটেছে সংলাপ রচনায়। – 'বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো - ঐযে এসেছে। একবারটি চাও।'

'কে এসেছে, স্বপ্ন?'

'স্বপ্ন নয়, বাবা, মণি এসেছে— তোমার শ্বশুর এসেছেন।'

তুমি কে ?'

'চিনতে পারছনা বাবা, ঐতো তোমার মণি।'

'মণি, সেই দরজাটাকি সব খুলে গিয়েছে।'

'সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে। '

'না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।'

'শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে - ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর। — অমনকরে কাঁদিস্‌নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে এখন একটুখানি চুপ কর।'[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরোক্ত গল্পটি বলতে গেলে সংলাপেই রচিত। বর্ণনা প্রায় নেই বললেই চলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই মৃত্যুটা' নামক গল্পটিও প্রধানত সংলাপের ভাষাতেই আগাগোড়া রচিত।—

'কার গোরুরে?'

'কে জানে?'

'এখানে মরতে এলো কেন?'

'কোথায় মরবে, বল্? একটা জায়গাতো চাই।'

'ইস একেবারে চোখের সামনে।'

'চোখটা কথায় সরাবি চিন্তে? মরণ কোথায় নেই?'

'তা বটে।'[৪৪]

ভাষার ভাব সম্পূর্ণ পৃথক হলেও ভাষার আঙ্গিকগত সাদৃশ্য এখানে লক্ষ্য করবার মতো। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সংলাপের ভাষা কোমল, আবেগময়। আর নারায়ণবাবুর সংলাপের ভাষা এখানে কাটা-কাটা, তীক্ষ্ণ।

নারীর রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতার ছাপ পড়েছে এঁদের দুজনেরই ভাষায়। নারীর দৈহিক রূপের বর্ণনা নয়, অন্তরের আলোকে উদ্‌ভাসিত রূপের মার্জিত বর্ণনা কাব্যের ঝঙ্কারে বেজে উঠেছে তাঁদের লেখনীতে।

'হৈমন্তী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৈমন্তীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন 'ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি, কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারিনা।'[৪৫]

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পে প্রণতির 'শুভ্র কপালে সবুজ রঙের টিপটি জ্বলজ্বল করছে। কালো চোখে সস্নেহ অনুযোগ। টেবিলের ওপরে রাখা ছোট হাতখানির সুকুমার আঙুলগুলিতে লালিত্যের ছন্দ।'[৪৬] এখানেও রুচিস্নিগ্ধ শুচিতা ও লাবণ্যের অলৌকিক স্পর্শ ভাষাকে কবিত্বের ছন্দে দুলিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষার গভীরতা, তির্যক ইঙ্গিতময়তা, সূক্ষ্মতা - সর্বোপরি ব্যঞ্জনার আদিগন্ত বিস্তার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় অনেকটা হলেও ততটা কখনোই মেলেনা।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষারীতির পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

রুক্ষ প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ বর্ণনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়েই কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। 'জন্মভূমিশ্চ' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'সূর্যটা যেন একটা অতিকায় অতসী কাচ হয়ে দশগুণ তীব্র করে রোদ ছুঁড়ে দিচ্ছে মাটিতে। সর্বংসহ কাঁটাগাছের গোড়াগুলো পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে সে তাপে। ...নীরস মাটির চাঙরগুলো মাঠভরা নুড়ির রাশির মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে। দূরের লোকাল বোর্ডের রাস্তার ওপর ঘুরে যাচ্ছে ঘূর্ণি— যেন কোনো একটা বিশাল চিতা থেকে উঠে আসা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ক্ষ্যাপার বাতাসের তাড়া খেয়ে।'[৪৭] আর 'ডাইনি' গল্পে তারাশঙ্কর 'ছাতিফাটার মাঠে'র বর্ণনা দিয়েছেন 'ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মতো ধূলার একটা ধূসর আস্তরণ মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ... শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম ধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ।'[৪৮] রুক্ষ প্রকৃতির নিষ্করুণ সৌন্দর্য যেন বীভৎসতার লেলিহান জিহ্বা মেলে দিয়েছে এ ভাষায়। দুই লেখকের বর্ণনার ভাষার সাদৃশ্য এখানে ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখেনা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাব এবং রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যের প্রভাব যুগপৎ বর্তমান। তাঁর ভাষাভঙ্গিতেও এই দ্বিচারিতার পরিচয় মেলে। তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নারীর শুচি-স্নিগ্ধ রূপ বর্ণনা করেছেন, তেমনি কখনো কখনো আবার নারীর ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করেছেন তিনি উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে। তাই তাঁর গল্পে নারী কখনো হয়ে উঠেছে সর্পিনী। ভাষাতেও লেগেছে তার বিষাক্ত ছোঁয়াচ। 'কলঙ্ক' গল্পে নারায়ণবাবু গল্পের চরিত্র আদিত্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন 'এক ধরণের মেয়ে দেখেছ সুকুমার? কালো বেশ কালো, অথচ দৃষ্টি পড়লে তুমি সহজে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারবে না। উজ্জ্বল তরল চোখ অথচ সে চোখে কী একটা বিষাক্ত প্রভাব আছে। সুন্দর শরীরে একটু পল্লবিত ছন্দ— আচমকা তোমার মনে হবে পায়ের একটা ফণা তোলা একটা কেউটে সাপ দেখতে পাচ্ছ।'[৪৯] আর তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া স্পষ্টই বলেছে

দংশনকারী বিষাক্ত সর্পিনীকে 'তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই এই।'[৫০]

দুজনের ভাষার প্রভেদ এখানে কেবল মাত্র এইয়ে নারায়ণবাবুর ভাষায় রয়েছে বিষাক্ত ফুলের সৌন্দর্য ও জ্বালা যুগপৎ; আর তারাশঙ্করের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতধর্মী ভাষায় রয়েছে শ্লেষের তীক্ষ্ণ তরবারির ধারালো আঘাত।

বস্তুত, তারাশঙ্করের ভাষার রুদ্রতা, অলৌকিকতা, ও বীভৎসতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও আছে কমনীয়তা, আধুনিকতা ও আবেগ। তাই তারাশঙ্করের ভাষার আদিম বলিষ্ঠতা নারায়ণ বাবুর ভাষায় ততটা নেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের ভাষায় 'তারাশঙ্করের ভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষা বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত,কখনো অমার্জিত, গ্রীষ্মদগ্ধ বীরভূমের প্রকৃতির মতোই রুদ্র রৌদ্রোজ্জ্বল। স্বভাবতই এই ভাষায় ইঙ্গিতের চাইতে বিবৃতি সার্থকতর।'[৫১] আর আমার মনে হয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষারও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষা মধুর অথচ পৌরুষে উজ্জ্বল, মার্জিত। উত্তরবঙ্গের মতোই এ ভাষায় স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য। আর এই ভাষায় বিবৃতির চেয়ে ইঙ্গিত সার্থকতর। পরিশেষে বলা যায়, বঙ্কিমের নাটকীয়তা, রাবীন্দ্রিক রুচি, কাব্যিকতা ও মাধুর্য এবং তারাশঙ্করের রুদ্রতাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাষায় আধুনিকতার ছাঁচে ঢালাই করেছেন। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'প্রথমদিকে পল্লবিত ও আলঙ্কারিক সাধুভাষায় নারায়ণবাবু লিখলেও পরে তিনি চলিত ভাষায় লিখেছেন। তখন তাঁর ভাষা বাড়তি মেদ ঝরিয়ে হয়ে উঠেছে তন্বী।' (সাক্ষাৎকার ঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, স্থান ঃ সাঁতরাগাছি ঃ সময় ঃ 24.4.1994) প্রসঙ্গত, অসিতবাবু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উপনিবেশ' -এর কথা বলেছেন। বস্তুত নারায়ণবাবুর ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই অলঙ্কার ভাষার শরীরে ভার হয়ে ওঠেনি, বরং ভরিয়ে তুলেছে। তাঁর ভাষার লাবণ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে অলঙ্কার। শব্দালঙ্কার যেমন এই ভাষাকে মাধুর্যে ঝঙ্কৃত করেছে, অর্থালঙ্কার তেমনি এই ভাষাকে গভীর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছে। বিশেষত, নারায়ণবাবুর কিশোর-গল্পগুলিতে শব্দালঙ্কারের ছড়াছড়ি। যেমন, 'কুট্টিমামার দন্ত কাহিনী'তে অনুপ্রাসের ঘনঘটা লক্ষ্য করার মতো— 'সায়েবরা ঘোঁয়া ঘোঁয়া ঘ্যাঁয়োৎ ঘ্যাঁয়োৎ করে বেশ খানিকটা হাসল'[৫২] আবার 'বাঘটা হুবহু কান্নার সুরে বললে 'ঘ্যাং ঘ্যাং ভ্যাঁও।'[৫৩]

'চামচিকে আর টিকিট চেকার' গল্পেও টেনিদা বলে 'হুঁঃ, পোলাপান! আবার যদি বকবক করেতো জলপান করে ছাড়বো।'[৫৪] এখানে ছেকানুপ্রাস দেখতে পাই। আবার 'ডিলা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্'[৫৫] শব্দ নিয়ে অনায়াসে পান্ সৃষ্টিও করেন নারায়ণবাবু। সুদীপ বসুর ভাষায় 'আসলে শব্দ যেন লেখকের হাতের আমলক বিশেষ। কত সহজে তাদের নিয়ে খেলা করেন তিনি। এরই বিপরীতে শিব্রামী পান্ অনেক সময়েই কুস্তির প্যাঁচ টোকা কসরৎ মনে হয়।'[৫৬]

'কবিতার জন্ম' গল্পে পোকনের পোকাভরা দাঁত দেখে ছোটমামা যখন বলেছে 'হরিবোল-হরিবোল!' তখন প্যালারাম টিপ্পনী কেটেছে 'হরিবোল কেন? বোধহয় হরিবল্?'[৫৭] এখানে একই শব্দকে বানানের সামান্য হেরফেরে পৃথক অর্থ তাৎপর্যে অন্বিত করে যমকের সৃষ্টি করেছেন হাস্য-রসিক লেখক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পে প্রায়ই হাস্যরসাত্মক ছড়া ও কবিতার ব্যবহার থাকায় অন্ত্যানুপ্রাসেরও দেখা মেলে। যেমন 'ঢাউস' গল্পে ফুচুদার কবিতাংশ— 'রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা। মনটি তাহার বড়ই সাদা —'[৫৮]

কাকু বক্রোক্তির ব্যবহার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় খুব বেশি। যেমন 'কাণ্ডারী' গল্পে অখিল ঘোষের মনে প্রশ্ন জেগেছে ' ও কী করে টের পেল? বাইরের ব্যবহারে? অলকার কোন চাল চলনে?'[৫৯] শেষোক্ত দুটি প্রশ্নেরই উত্তর-'না'। 'এক্‌জিবিশন' গল্পেও পতিতা নারীর কাকু-বক্রোক্তিতে শ্লেষের তীব্রতা 'আমি কি ভিখিরি?'[৬০] লক্ষ্য করলে দেখা যায় নারায়ণবাবুর ভাষায় প্রশ্ন খুব বেশি। যেমন 'ইতিহাস' গল্পে প্রণতির চোখে আশঙ্কা— 'এসব কি ভালো হচ্ছে?'[৬১] 'একটি শত্রুর কাহিনী' গল্পে হ্যান্সের মনে প্রশ্ন— 'শত্রু? কার?'[৬২] প্রতিনায়ক' গল্পে অবহেলিত পুরুষটির মনেও শেষে অসহায় প্রশ্ন জেগেছে 'আর আসবনা একথা জোর করে বলবার শক্তি কি আছে? আবার যদি কখনো ক্লান্ত, শিথিল, নিশ্চেতন অবসাদের মধ্যে ওর ডাক আসে, তখন সেই মুহূর্তে আমি কি করব?'[৬৩] — আসলে বিংশ শতকের দ্বিধা-যন্ত্রণা-সংশয়-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, বিদ্রোহী আবেগ এইসব প্রশ্নের মর্মমূলে কাজ করেছে বলে মনে হয়। বস্তুত জিজ্ঞাসা-চিহ্ন হয়েইতো ছোটগল্পের আবির্ভাব।

কখনো বিদ্রূপ ও শ্লেষ ধারালো তরবারির মতো খোঁচা মারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা-প্রয়োগের কৌশলে। যেমন 'এক্‌জিবিশন' গল্পে পতিতা মেয়েটির বক্রোক্তি 'আমার জন্য এত মাথাব্যাথা কেন আপনার? প্রেমে পড়ে গেছেন না কি?[৬৪] উপমার সঠিক ব্যবহার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষাকে কখনো বা করে তুলেছে চিত্রধর্মী। যেমন 'গিল্‌টি' গল্পে 'ডুরে শাড়ির আবরণে ঢাকা রূপোর মূর্তির মতো দেখাল গৌরীকে,'[৬৫] আবার 'মধুবন্তী' গল্পে "খেজুর গাছের পাতা নড়ছে পেতনীর চুলের মতো।'[৬৬] এ দু'টি উপমা নারায়ণবাবুর ভাষায়-রাবীন্দ্রিক লাবণ্য ও কল্লোলীয়-চেতনার সহাবস্থানের কথা স্মরণ করায়।

অপহ্নুতির দেখাও মেলে কখনো কখনো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়। যেমন 'কলঙ্ক' গল্পে ডাক্তারের চিন্তা 'এতো নিউরোসিস নয়!'[৬৭] 'একটি অমর রাত্রি' গল্পে মিত্র মশাই মৃত্যুর মুহূর্তে আশ্বাস-বাণী শুনে নিশ্চিত হয়েছেন 'না, শুনবার ভুল নয়।'[৬৮]

প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকৃতির উপর ব্যক্তিত্বের আরোপ করে। যেমন 'একটি অমর রাত্রি' নামক গল্পেই

লেখক লিখেছেন-'রাত্রিটা যেন স্থির আর স্তব্ধ হয়ে বসেছে মেঘনার উপরে।'[৬৯] এসবক্ষেত্রে সমাসোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়। 'নেতার জন্ম' গল্পে 'নাউ হি ইজ এ গ্রেট লীডার'[৭০] ব্যাজস্তুতিমাত্র। এখানে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়েছে। ক্লাইম্যাক্সের সঙ্গে কাব্যরসকে পাঞ্চ করে নারায়ণবাবু পরিবেশন করেছেন। সপ্তসুর যেন ধাপে ধাপে উঠেছে তাঁর ভাষার শরীরে। প্রসঙ্গত, 'আলেয়ার রাত' গল্পে হারাণের উক্তি মনে পড়ে -- 'জল পড়বে, মেঘ ডাকবে, ঝিকিমিকি করে বিদ্যুৎ চমকাবে, মল্লারের সুর উঠবে'[৭১]

একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এইযে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় উপমা হিসেবে বাঘ, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বারবার এসেছে। যেমন 'তীর্থযাত্রা' গল্পে 'মেঘনার মেঘবরণ জল প্রশান্ত মন্থর গতিতে চলেছে সমুদ্রের দিকে। অজস্র হাওয়ায় রাশি রাশি ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, নদীর বুকে ফুটছে ফেনার ফুল, যেন কালীয়নাগের হাজার ফণা ছোবল তুলছে একসঙ্গে। মহানাগের কুণ্ডলীর মতো এখানে ওখানে চক্রাকারে 'উলাস' দিচ্ছে শুশুকের দল।'[৭২]

'পাণ্ডুলিপি' গল্পে নারায়ণবাবু লিখেছেন 'ট্রেন এসে গেল। বাঁকের মুখে খানিকটা হাল্‌কা অস্পষ্ট ধোঁয়া তারপরে দীর্ঘ সরীসৃপের মতো নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসের যান্ত্রিক দেহটা।'[৭৩]

'কালো জল' গল্পে'আকাশে অনেকগুলো জ্বলজ্বলে তারা একসঙ্গে ছায়া ফেলেছে খালের জলে। জলটা ঝিলমিল করছে যেন বাঘের থাবা। পচা মাটি আর পাতার অত্যুগ্র গন্ধ ভাসছে বাঘের গায়ের গন্ধের মতো।'[৭৪]

'পুষ্করা' গল্পে 'শুক্লা চর্তুদশীর রাতকে কালো মেঘ অমাবস্যার মুখোস পরিয়েছে এক কোণে থেকে থেকে বিদ্যুতের সর্পিল চমক;'[৭৫] 'খড়্গ' গল্পে হরিলালের 'লোলুপ আর কঠিন মুষ্টি একখানা মাংসাশী থাবার মতো ভোমরার হাত আঁকড়ে ধরেছে।'[৭৬] তাই ভোমরার মনে হয়েছে তার 'সর্বাঙ্গে যেন একটা বিষধর সাপ পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে।'[৭৭] আর আতঙ্কবিহ্বল মুখের ওপর 'সাপের প্রসারিত ফণা দুলছে, লাল টকটকে চোখদুটো জ্বলছে যেন আগুনের বিন্দু।'[৭৮]

'টুটুল' গল্পে একজনের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন 'একজন দেখতে যেন একটা বাঘের মতো— মুখটায় ছিটে বসন্তের দাগ, হলদে হলদে মস্ত চোখ।'[৭৯] আবার 'আলোয়ার রাত' গল্পেও লেখক লিখেছেন 'সেই মুখে বসন্তের দাগ থাকার জন্যে কোথায় যেন চিতাবাঘের সাদৃশ্য পাওয়া যেত;'[৮০] 'কাণ্ডারী' গল্পে দেখি 'হলদে হয়ে আসা ডোরাদার বাঘের মতো দেখতে কুয়াশা-মাখানো ফার্ণের ঝোপ।'[৮১] এরকম আরও অজস্র উপমা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় ছড়িয়ে আছে। অপ্রয়োজনে আর সেগুলি উদ্ধৃত করলাম না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে শুধু বিভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, তাঁর অনবদ্য ভাষাশৈলী সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -- 'শব্দপ্রয়োগের তীক্ষ্ণ সঙ্কেতময়তা ও চিত্রাধর্মিতায়, বর্ণনার আবেগময় গতিবেগে, প্রতিবেশ রচনার কুশলতায় ও অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য উদ্‌ঘাটনে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন সর্বত্রই সুস্পষ্ট।'[৮২] বস্তুত, ভাষাকে নিখুঁত করার জন্য ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে যথার্থ অর্থবাহক করার জন্য বুদ্ধিমার্গের লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে এই চিন্তা ভাবনারই দেখা মেলে। তিনি এ গ্রন্থে ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও রূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ছোটগল্পের 'প্রতিটি সংলাপ ধারালো-ভাবগর্ভ; তার প্রতিটি বাক্যে থাকবে ইঙ্গিতমর্মী উদ্ধৃতিযোগ্যতা।'[৮৩]

যেমন 'সঞ্চার' গল্পে শিক্ষক করুণাময়বাবুর উক্তি 'প্রফেসাররাতো দূর থেকে বক্তৃতা ছুঁড়ে দিয়ে খালাস— ছাত্রদের হাতে করে গড়তে হয় আমাদেরই'।[৮৪] --এখানে সঠিক শব্দ ব্যবহার করে যে ইঙ্গিতময় ব্যাক্যটি গড়ে তুলেছেন লেখক, তাতে অহমিকার সঙ্গে সঙ্গে চাপা ক্ষোভ ফুটে ওঠে। নিপুণ শব্দ-প্রয়োগ কৌশলে ও বাক্যের ব্যঞ্জনামর্মিতায় তা পাঠকের কান এড়ায়না। চিত্রাধর্মিতাও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। 'রিবন বাঁধা ভালুক' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সুবর্ণরেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন 'সত্যিতো সুবর্ণরেখাইতো বটে। দুপাশে উঁচু উঁচু লোহার ত্রিভুজ দেওয়া ...... একটা লাল রঙের পুল। তার নিচে অনেকটা শুকনো আর খানিকটা ভিজে ভিজে লাল রঙের বালি। সেই বালি পার হয়ে কুলকুল করে সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে। ছোট নদীটা, তবু ভরা আশ্বিনে কেমন দুলে দুলে উঠছে, ব্রীজের থামের গায়ে ঘা দিয়ে তৈরী করছে, শাদা শাদা ফেনার ঘূর্ণি -- সোঁ সোঁ করে একটানা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জলের'।[৮৫] --এখানে সুবর্ণরেখা যেন ছবির চেয়েও জীবন্ত। সুবর্ণরেখা তার রূপ, রং, গতি নিয়ে আক্ষরিক শব্দের জগত থেকে দর্শনেন্দ্রিয়ের জগতে, ও ক্রমে কর্ণেন্দ্রিয়ের শব্দের জগতেও চলে যায়।

উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় যাদু-শক্তির কথা সর্বজনবিদিত। কলকাতার বালিগঞ্জের বিলাস-বহুল বৈঠকখানা থেকে শব্দের যাদুতে তিনি অনায়াসে উড়ে যান সেখানে, যেখানে 'তাহিতির আকাশে ঝড়ে মেঘ রক্তের মতো রাঙা হয়ে ওঠে, ক্ষ্যাপা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হল্‌কা বয়ে যায়, আকাশ থেকে যে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে, তা জল নয়, টকটকে তাজা রক্তের ফোঁটা।'[৮৬] ('হাড়')

অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য ছবি নারায়ণ বাবুর ভাষায় উজ্জল। তাই ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে পড়ে অতীত ইতিহাসের রক্তাক্ত পদলেখা। বলিষ্ঠ কণ্ঠে লেখক বলেন -- 'বারেবারে এমনি অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা পদচিহ্ন এঁকে যাই— আমাদের রক্তাক্ত পদলেখা জ্বলজ্বল করে জালিয়ানাওয়ালায়, সেবাগ্রামে কর্ণফুলীর তীরে, বুড়ী বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরের রাঙা মাটিতে। ভাবীকালের

পথ-নির্দেশ সেই রক্ত লিপিতে।'[৮৭] এখানে ভাষা ইতিহাসের মহান আদর্শের গৌরব উজ্জ্বল।'

চরিত্রোচিত ভাষা প্রয়োগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধহস্ত। অশিক্ষিত কুলী, মজুর, কৃষক থেকে শুরু করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, অভিজাত জমিদার, বন্য সাঁওতাল; ঠগ প্রতারক থেকে শুরু করে সৎ নিরীহ মানুষ, আদর্শবান পুরুষ; এবং বিভিন্ন ধরনের নারী চরিত্র তাঁর গল্পে সংলাপের গুণে জীবন্ত।

'তৃণ' গল্পে মুসলমান ধাওয়ার খেদোক্তি – 'ওই শালা 'বিনে'র দল, বারো মাস ভেসাল নামিয়ে চুনোপুঁটিগুলো অবধি সব সাবড়ে নিলে মাছ কি আসমান থেকে ঝরঝর করে পড়বে নাকি?'[৮৮] এ ভাষায় মুসলমানী গন্ধ যেমন আছে, তেমনি দরিদ্র জেলের খেদে ক্রোধের সঞ্চার ঘটেছে সার্থকভাবে।

'নিশাচর' গল্পে সমাজ-বিরোধী চোর-ছ্যাঁচোড়ের উক্তি— 'বেশ, বেশ, দলে এসো তাহলে। কী করেছিলে? খুন? চুরি? হাত দিয়েছিলে মেয়েমানুষের গায়ে? তা চুপচাপ পড়ে থাকো ওখানে। শীতের রাত্তিরে কোন্ ব্যাটার সাধ্য যে খুঁজে বার করবে তোমাকে।'এখানে কথা বলার ভঙ্গি অনায়াসে লোকটির শ্রেণী নির্ণয় করে দেয়।

'নীলা' গল্পে শ্রমিক-নেতার কণ্ঠস্বরে হুমকিও জীবন্ত— 'আমি আপনাকে ইনসিস্ট করছি স্টেপ নেবার জন্যে। নইলে রেজাল্ট খারাপ হবে।'[৯০] অপরদিকে মালিক পক্ষের কণ্ঠেও চাপা অহঙ্কারের ঔদ্ধত্য— 'আই ডিসচার্জ ইউ।'[৯১] চরিত্রগুলিকে এখানেও সংলাপের গুণেই চিনে নেওয়া যায়।

'হাড় গল্পে' ধনী রায়বাহাদুরের কথাতেও ধনতন্ত্রের শখের বিলাস বিকৃতির রূপ স্পষ্ট— 'এই হাড়গুলো আমার বহু যত্নের কালেকশান। অনেক আছে, প্রত্যেকটারই এইরকম সমস্ত গুণ। প্যাসিফিক ঘুরবার সময় এগুলো সংগ্রহ করাই 'হবি' ছিল আমার। ভাবছি এই নিয়ে বই লিখব একখানা।'[৯২]

ভণ্ড সন্ন্যাসী সুন্দরলাল যখন 'বীতংস' গল্পে বলে 'সেবার আসামের চা বাগানে এক সায়েবকে মেরে দিলুমনা; তিনটা দিনও পেরোলনা, মুখে রক্ত উঠে একেবারে হুঁ-হুঁ!'[৯৩] তখন তার স্বরূপ চিনে নিতে সময় লাগেনা। কুসংস্কারচ্ছন্ন সাঁওতালদের সে ভোলায় তার কথার যাদুতে। আর এই যাদুদণ্ডটি আছে লেখকের হাতে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উত্তম পুরুষ' গল্পে সাঁওতাল-সর্দার তার ছেলেকে বলে 'চল বাপ্, দু কোশ রাস্তা আছে এখনো।'[৯৪] এখানে বাপের ছেলেকে 'তুই' করে এবং 'বাপ' বলে সম্বোধন করা সাঁওতালদের বাচনভঙ্গিকেই মনে করায়।

সাহেবের অনুকরণকারী ধনী বাঙালীর চরিত্রও তাঁর লেখায় সংলাপের গুণে জীবন্ত। 'খুনী' গল্পে এইরকম একজন সাহেবী ভাবাপন্ন বাঙালী বলে— 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন নাকি মিস্টার মাইতি? হাউ ফানি'?[৯৫] পরিচিতজনকে 'মিস্টার' বলে সম্বোধন করা, কথায়-কথায় ইংরাজী বুলি আওড়ানো এজাতীয় মানুষেরই লক্ষণ।

আবার 'তিতির' গল্পে হিন্দুস্তানী সীমান্তরক্ষীর ভাষাও জীবন্ত— 'গরীবের ওয়াস্তে দুসরা কানুন। আধা সের সুপারি ইয়া সেরভর কড়ুয়া তেল নিয়ে বর্ডার পার হতে গেলে গোলী খেয়ে মরবে।'[৯৬] এখানে হিন্দী শব্দের প্রাধান্য ও বাচনভঙ্গিতে হিন্দুস্থানী সিপাহীর ক্ষোভ এবং বেদনা স্পষ্ট।

বিভিন্ন নারী-চরিত্রও লেখকের সংলাপের গুণে ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টতা নিয়ে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন গল্পে।

'তিলঙ্গমা' গল্পে লীলা মিত্রর চরিত্রে নারীসুলভ লজ্জা বা কমনীয়তা নেই, আছে দ্বিধাহীন স্পষ্টতা। তার সংলাপই একথা প্রমাণ করে দেয়। সে তার পরিচিত কলেজের একটি ছেলেকে সরাসরি বলে 'তেতলায় উঠে ডানদিকের ফ্ল্যাটটা। আসুননা একদিন। আমারও স্বার্থ আছে।'[৯৭] লীলা মিত্রের শেষোক্তিটি বিশেষভাবে তার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে।

সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের চোখে শহরের জৌলুষের স্বপ্নও নারায়ণবাবুর সংলাপে ফুটে উঠেছে। 'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পে টুনু বউদি বলেছে— '....ছুটির দিনে দুজনে যাব আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, কোনোদিন যাবো বায়োস্কোপ দেখতে।'[৯৮] নারী-হৃদয়ের তুচ্ছ সাধ আহ্লাদও টুনু বৌদির ভাষায় ব্যাগ্র হয়ে উঠেছে— 'আমার ভাবতে বেশ লাগে ঠাকুরপো, ছোট্ট একটি বাসা করে আছি দুজনে। ছিমছাম গুছনো একটি সংসার। সন্ধ্যেবেলা উনি আপিস থেকে ফিরলে কড়ায় করে খানকয়েক লুচি ভেজে দোব, চা করে দোব।'[৯৯] আবার অসাধারণ নারীর দেখাও মেলে বৈকি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে। সংলাপই তার এই অসাধারণত্বকে সপ্রমাণ করে। 'নীলা' গল্পে কুন্তলার বস যখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলাকে দেখে অবজ্ঞার সুরে বলেছে 'ইজ দিস্ বেঙ্গল?'[১০০] তখন কুন্তলার গলায় ঝাঁজ ফুটে উঠেছে 'নো, দিস ইজ স্টার্ভিং বেঙ্গল।'[১০১] এখানে কুন্তলার সাহস, দেশপ্রেম তাকে অন্য নারীদের থেকে স্বতন্ত্র গৌরব দান করেছে, ভাষার গুণে।

'দুর্ঘটনা' গল্পে নারীর হীনমন্যতাজাত ঈর্ষায় বিকৃত মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। কুৎসিত-অর্ধদগ্ধ মুখমণ্ডলের অধিকারিনী ইন্দিরার, নব-বিবাহিতা দম্পতির প্রতি বানানো গল্পে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে করা উক্তিতে এই ঈর্ষা স্পষ্টতর — 'হ্যাঁ আর একটা কথা। লক্ষ্মী শেষে

খবর পেয়েছে বিভাসের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বেশ সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে, এই আপনার মতোই অনেকটা।'[১০২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে কত ভাল সংলাপ রচয়িতা ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনায় তাঁর সাফল্যে। স্বর্ণসীতা, সম্পদ, সঙ্কেত, অঙ্কুশ, রূপান্তর, সঞ্চারিণী, রামমোহন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি চলচ্চিত্রের তিনি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে প্রধানত উত্তরবঙ্গকে ও কিছুটা পূর্ববঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে, সেই আঞ্চলিক ভাষা সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা স্থান করে নিয়েছে তাঁর লেখায়। ভগীরথ মিশ্রর ভাষায়— 'প্রতিটি পটভূমির একটি নিজস্ব সৌরভ থাকে। গদ্যের ভাঁজে ভাঁজে ঐ পটভূমিজাত শব্দের কস্তুরিগুলিকে লুক্কায়িত রেখে সমগ্র গদ্যটিকে পটভূমির নিজস্ব গন্ধে সুরভিত করে তোলা। প্রচলিত শিষ্ট ভাষাকে পটভূমির মাটির সঙ্গে মাখিয়ে, মিশিয়ে এক মাটির সৌরভযুক্ত গদ্যভাষা সৃষ্টি করা। যাতে রসিক পাঠক রচনাটি পাঠ করতে করতে, সহজেই, পটভূমিতে পৌঁছে যেতে পারেন, পটভূমিস্থ জীবনের ঘ্রাণটিকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।'[১০৩] তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের' বনজ্যোৎস্না' গল্পে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী মেয়ে মহীতোষকে 'বাঙালীবাবু' বলে সম্বোধন করে আর পূর্ববঙ্গে মেঘনার পটভূমিতে মুসলমান মাঝি বলে 'খোদা মেহেরবান কর্তা।' আঞ্চলিক ভাষা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এভাবে মাত্র দু' চারটি শব্দের মাধ্যমে আঞ্চলিকতার ঘ্রাণটুকু এনে দিয়েছেন । অবশ্য কখনো কখনো তিনি বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় ভাষাও ব্যবহার করেছেন তাঁর গল্পে। তবে ভাষার দুর্বোধ্যতা ঘোচাতে বন্ধনীতে অর্থ দিতে ভোলেননি। যেমন 'কালাবদর' গল্পে মাঝির উক্তি— 'ফ্যাগড়া প্যাচাল পাড়েন ক্যান্ কত্তা?'[১০৪] (বাজে বক্‌ছেন কেন?') আবার কিশোর গল্পে হাবুলের মুখে ঢাকাই বাঙাল ভাষা ব্যবহার করে নারায়ণবাবু হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অনেক সময় হাবুলের সঙ্গীরা তার ভাষার মর্মোদ্ধার করতে পাঠককে সহায়তা করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পগুলির তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ করেছেন। তাঁর শব্দ-সচেতনতা এক্ষেত্রেও বিস্ময়কর। যেমন 'বীতংস' গল্পে 'বীতংস' শব্দের অর্থ 'পাখি ধরার জাল'। আর এই জাল বিছিয়েছে এ গল্পে ভণ্ড, প্রবঞ্চক সুন্দরলাল, বনের পাখির মতো সহজ-সরল সাঁওতালদের ফাঁদে ফেলার জন্য। সুতরাং এ গল্পের নামকরণ অবশ্যই তাৎপর্যময়। 'আলেয়ার রাত' গল্পে আলেয়ার মতো সঙ্গীত-জগত হাতছানি দেয়। 'তৃণ' গল্পে গরীব মুসলমান ধাওয়ার দল তৃণের মতোই আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় এঘাট থেকে ওঘাটে। 'দুঃশাসন' গল্পে সেযুগের বস্ত্রসঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের তথাকথিত 'দুঃশাসন'দের রূপ স্পষ্ট। সুতরাং তাঁর গল্পের নামকরণ গল্পের বিষয়, ভাব ও ভাবনা সম্পর্কেও সচেতন করে পাঠকদের লেখকের অসাধারণ শব্দ সচেতনতার গুণে।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, তিনি নিজেই কিছু অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করেছেন— যার পরিচয় অভিধানে মেলেনা; কিন্তু যা প্রবাদ বাক্যের মতো আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। কিশোর-গল্পের ক্ষেত্রেই তিনি এই আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'কুরুবকের মতো বকবক করা' 'কান ছিঁড়ে কানপুরে পাঠানো' 'দাঁত পাঠানো দাঁতনে' 'নাক নাসিকে পাঠানো' 'পুঁদিচেড়ি' 'মেফিস্টোফিলিস' ইত্যাদি টেনিদার মুখের ভাষা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এমনকি জার্মানী, জাপানী, ফরাসী কোন ভাষা বানানোতেই নারায়ণবাবু পিছপা হননি। আসলে শব্দের দুরূহ গতির বিপজ্জনক খেলায় নারায়ণবাবু সিদ্ধহস্ত। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোন গোঁড়ামি তাঁর নেই। তাই জাপানী ভাষা 'ফাই - দু - চি' জার্মানভাষা 'ব্লিৎক্রিগ গট্ ইন হিম্মেল', ফরাসী ভাষা 'আঁফাঁ তেরিব্‌ল্'।'[১০৫] তাঁর লেখায় সড়গড়। আবার তৎসম, দেশী-বিদেশী নানা উদ্ভট শব্দ তাঁর ভাষায় সহাবস্থান করেছে। 'খট্টাঙ্গ ও পলান্ন', 'তালিয়াৎ', 'দধীচি পোকা ও বিশ্বকর্মা' প্রভৃতি গল্পের উদ্ভট নামকরণ এর প্রমাণ দেয়। 'পুলিশের কারবারই আলাদা' গল্পে 'প্ল্যাটফর্মের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মাছিমার্কা গোঁফ বললেন, ঐ যে লোকটা কানে জড়ুল আর লাল রঙে টাই - এখুনি যে চা খেতে নেমে গেল ওকে চেনেন?'[১০৬] এখানে তদ্ভব, ইংরাজী (প্ল্যাটফর্ম), পোর্তুগীজ (মার্কা), ফার্সী (লাল), চীনা (চা) শব্দের সহাবস্থান সাবলীল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে শব্দের এমন বিচিত্র সমাবেশ প্রায়ই দেখা যায়। তথাকথিত অশালীন শব্দকেও তিনি অবলীলায় তাঁর ভাষায় স্থান দিয়েছেন। 'পাঁঠা', 'উল্লুক', 'ব্যাটা', 'চীজ' এমনকি 'হারামীর বাচ্চা' অনায়াসে তাঁর লেখায় জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু চরিত্রোপযোগী ভাষা জোগাতে গিয়েই লেখক এ ধরণের ভাষার শরণাপন্ন হয়েছেন মাঝেমধ্যে। তাই এইসব শব্দ গল্পকে বিন্দুমাত্র অশালীন করে তোলেনি। 'একটি অমর রাত্রি' গল্পে অত্যাচারী সায়েবের মুখে 'ড্যাম - সোয়াইন'[১০৭] যেমন স্বাভাবিক, 'উত্তমপুরুষ' গল্পে বাঘকে আহত করে সাঁওতাল সর্দারের উত্তেজিত স্বগতোক্তি— 'শালা'[১০৮] তেমনই স্বাভাবিক। অর্থহীন, ব্যাকরণ-বর্জিত হাস্যরসাত্মক বাক্য নির্মাণেও তাঁর জুড়ি নেই। যেমন 'কুট্টিমামার দন্ত কাহিনী'তে কুট্টিমামার সগর্ব উক্তি 'আই গো টু ঝর্ণা। টাইগার কাম। আই ডু বক্সিং ..... অল্ টুথ ব্রেক। টাইগার কাট ডাউন'[১০৯] মানে বাঘ কেটে পড়ল এবং সবশেষে বাঘ 'একেবারে উইণ্ড' মানে হাওয়া হয়ে গেল।'[১১০] পরবর্তী সাহিত্যক্ষেত্রে নারায়ণ বাবুর এই কিশোর গল্পের ভাষাই ছাপ ফেলেছে। প্রসঙ্গত ১৯৯২ সালের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলাতে বিমল করের লেখা 'সার্কাস থেকে পালিয়ে' গল্পে কিকিরার মুখের ভাষার উল্লেখ করা যায়। 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র ইংরেজী করেছে কিকিরা 'হাউস ইটিং এণ্ড ফরেস্ট ব্যাফেলো ড্রাইভিং'।[১১১]

এক কথায় বলা চলে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর-গল্পের ভাষা যেন জিলিপি। কথার প্যাঁচে প্যাঁচে রস। আর তাঁর অন্যান্য ছোটগল্পকে যদি ধূপের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে ভাষা তার সুগন্ধ। কাহিনীর ধূপ নিভে যাবার পরেও অনেকক্ষণ এই ভাষার সুগন্ধী ব্যঞ্জনা পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে।

উৎসপঞ্জী

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বীতংস' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৫০৯

২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'অপঘাত' (রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৩) পৃঃ ৩৮২

৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কেয়া' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩০১

৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আলেয়ার রাত' (রচনাবলী ১২শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৫) পৃঃ ৩৫০

৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হাড়' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৫২১

৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বীতংস' ঐ পৃঃ ৫২০

৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নিশাচর' (ঐ) পৃঃ ৫৫০

৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' (রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৮) পৃঃ ৪১০

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দাম' (রচনাবলী ১১শ খণ্ড, ১৩৯৪) পৃঃ ২২৫

১০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'অমনোনীতা' (ঐ) পৃঃ ১৯০

১১। ঐ পৃঃ ১৯১

১২। ঐ পৃঃ ১৯৪

১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'লালঘোড়া' (রচনাবলী ১০ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৪) পৃঃ ২৪২

১৪। ঐ পৃঃ ২৪৭

১৫। ঐ পৃঃ ঐ

১৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'টোপ' (রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৮) পৃঃ ৩৫৪

১৭। ঐ পৃঃ ৩৬০

১৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি চিঠি' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩৬৫

১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'অপঘাত' (রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৮) পৃঃ ৩৮৮

২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কাণ্ডারী' (রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৪) পৃঃ ১৬৬

২১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'ভাঙ্গা বন্দর' (রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৬৮) পৃঃ ৩৫৯

২২। ঐ পৃঃ ৩৬২

২৩। সমরেশ মজুমদার ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' প্রঃ প্রঃ ১৯৮৬ পৃঃ ১৮৭

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'আনন্দমঠ' (বঙ্কিম রচনাবলী প্রথম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩৬০, শিশু সাহিত্য সংসদ)

২৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তিতির' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩৭৮

২৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'চন্দ্রশেখর' (বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, শিশুসাহিত্য সংসদ, প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩৬০) পৃঃ ৩৩৬

২৭। ঐ

২৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তীর্থযাত্রা' (রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৩৭৪

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'চন্দ্রশেখর' (বঙ্কিম রচনাবলী প্রথম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩৬০ শিশু সাহিত্য সংসদ) পৃঃ ৩৩৯

৩০। ঐ

৩১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'মর্গ' (রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭) পৃঃ ৪১০

৩২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'শ্রীকান্ত'৪র্থ পর্ব (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ' প্রঃ প্রঃ ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬০) পৃঃ ২১

৩৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি চিঠি' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩৬৪

৩৪। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'বামুনের মেয়ে' (শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' প্রঃ প্রঃ ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬০) পৃঃ ১৯১

৩৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নক্রচরিত' (রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৪১৫

৩৬। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'বামুনের মেয়ে' (শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' প্রঃ প্রঃ ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬০) পৃঃ ২০৯

৩৭। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'মহেশ' (শরৎ সাহিত্য সমগ্র ২য় খণ্ড আনন্দ সম্পাঃ সুকুমার সেন প্রঃ প্রঃ ৩১ ভাদ্র ১৯৯৩) পৃ ১৩৯৩

৩৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তৃণ' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৫৫৫

৩৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বন-জ্যোৎস্না' 'রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭) পৃঃ ৪৯৮

৪০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'দুরাশা' (রবীন্দ্র রচনাবলী ১১শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩৯৭) 'গল্পগুচ্ছ' পৃঃ ৩০৮

৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অপরিচিতা' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭) 'গল্পগুচ্ছ' পৃঃ ৩৬৩

৪২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'শুভক্ষণ' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩৮২

৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'শেষের রাত্রি' (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭) 'গল্পগুচ্ছ' পৃঃ ৩৫৮

৪৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সেই মৃত্যুটা' (রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭) পৃঃ ৫৩১

৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'হৈমন্তী' ঃ (রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭) ঃ 'গল্পগুচ্ছ' পৃঃ ৩১৪

৪৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ইতিহাস' (রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭) পৃঃ ৪৯৫

৪৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'জন্মভূমিশ্চ' (রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭) পৃঃ ৪৪৯

৪৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'ডাইনী' (রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'গল্পপঞ্চাশৎ' প্রঃ প্রঃ ১৯৬৩) পৃঃ ৩৬৫

৪৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কলঙ্ক' (রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২) পৃঃ ১৮৮

৫০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায় ঃ 'নারী ও নাগিনী' ঃ (রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'গল্প পঞ্চাশৎ' প্রঃ প্রঃ ১৯৬৩) পৃঃ ২৯

৫১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' প্রঃ প্রঃ ১৩৬৪, পৃঃ ৩৬০

৫২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কুট্টিমামার দন্ত কাহিনী' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ জানুয়ারী, ১৯৭৮) পৃঃ ৬২

৫৩। ঐ পৃঃ ৬৪

৫৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'চামচিকে আর টিকিট চেকার' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ মার্চ, ১৯৮১) পৃঃ ৭

৫৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ঢাউস' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৪৮

৫৬। সুদীপ বসু ঃ 'টেনিদা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং' ঃ সাহিত্য পত্রিকা 'কোরক' (১৯৯২) পৃঃ ৭৯

৫৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কবিতার জন্ম' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ এপ্রিল, ১৯৮৭) পৃঃ ৬৬

৫৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ঢাউস' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ১ম খণ্ড,প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৪৯

৫৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কাণ্ডারী' (রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৪) পৃঃ ১৬৮

৬০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'এক্‌জিবিশন' ঃ (ঐ) পৃঃ ১৭৩

৬১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ইতিহাস' (রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭) পৃঃ ৪৯৮

৬২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি শত্রুর কাহিনী' (ঐ) পৃঃ ৪৯৩

৬৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'প্রতিনায়ক' (রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২) পৃঃ ২৩৮

৬৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'এক্‌জিবিশন' (রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৪) পৃঃ ১৭৮

৬৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'গিল্‌টি' (ঐ) পৃঃ ২০০

৬৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'মধুবন্তী' (ঐ) পৃঃ ২১৭

৬৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কলঙ্ক' (রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২) পৃঃ ১৯৩

৬৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি অমর রাত্রি' (ঐ) পৃঃ ২২৬

৬৯। ঐ পৃঃ ২২৮

৭০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নেতার জন্ম' (ঐ) পৃঃ ২৫৬

৭১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আলেয়ার রাত' (রচনাবলী ১২শ খণ্ড , প্রঃ প্রঃ ১৩৯৫) পৃঃ ৩৪৩

৭২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তীর্থযাত্রা' (রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৩৭৯

৭৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'পাণ্ডুলিপি' (ঐ) পৃঃ ৪০৯

৭৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কালো জল' (ঐ) পৃঃ ৪৫৫

৭৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'পুষ্করা' (ঐ) পৃঃ ৪৫৮

৭৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'খড়্গ' (ঐ) পৃঃ ৪৯২

৭৭। ঐ

৭৮। ঐ

৭৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'টুটুল' (রচনাবলী ১২শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৫) পৃঃ ৩৭৬

৮০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'আলেয়ার রাত' (ঐ) পৃঃ ৩৪১

৮১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কাণ্ডারী' (রচনাবলী ১১শ খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৪) পৃঃ ১৬৭

৮২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৯, পৃঃ ৬০৬

৮৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্যে ছোট গল্প' নব-সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৬৫ পৃঃ ২২৭

৮৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সঞ্চার' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩০৮

৮৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'রিবন বাঁধা ভালুক' (ঐ) পৃঃ ২৮৭

৮৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হাড়' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৫২৫

৮৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ইতিহাস' (রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৭) পৃঃ ৫০৪

৮৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তৃণ' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৫৪৭

৮৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নিশাচর' (ঐ) পৃঃ ৫৬০

৯০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নীলা' (ঐ) পৃঃ ৫৩৫

৯১। ঐ

৯২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হাড়' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৫২৬

৯৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বীতংস' (ঐ) পৃঃ ৫১৫

৯৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'উত্তম পুরুষ' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩২৮

৯৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'খুনী' (ঐ) পৃঃ ৩৩৬

৯৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তিতির' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩৭৪

৯৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'তিলঙ্গমা' (ঐ) পৃঃ ৩৫০

৯৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'প্রদীপ ও প্রজাপতি' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬) পৃঃ ৫৪৪

৯৯। ঐ

১০০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'নীলা' (ঐ) পৃঃ ৫৩৩

১০১। ঐ

১০২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'দুর্ঘটনা' (জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রঃ প্রঃ ১৩৬১) পৃঃ ১৭২

১০৩। ভগীরথ মিশ্র ঃ 'বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ' (তাপস ভৌমিক প্রমুখ সম্পাদিত 'কোরক' পত্রিকা, ছোটগল্প সংখ্যা, ১৪০২) পৃঃ ২৯

১০৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কালাবদর' (রচনাবলী ৫ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮) পৃঃ ৪৩১

১০৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'হনোলুলুর মাকুদা' সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৮১) পৃঃ ৭৮ ও ৭৯

১০৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'পুলিশের কারবারই আলাদা' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৪৩

১০৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'একটি অমর রাত্রি' (রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২) পৃঃ ২২৯

১০৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'উত্তম পুরুষ' (রচনাবলী ৮ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯১) পৃঃ ৩৩২

১০৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'কুট্টিমামার দন্তকাহিনী' (সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ১ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৯৭৮) পৃঃ ৬৩

১১০। ঐ পৃঃ ৬৪

১১১। বিমল কর ঃ 'সার্কাস থেকে পালিয়ে' (আনন্দমেলা পত্রিকা, পূজোসংখ্যা, ১৯৯২)

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের কালানুক্রমিক তালিকা ও গ্রন্থপঞ্জী এবং পত্র-পত্রিকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের কালানুক্রমিক তালিকা

১৩৪২ সাল

'নিশীথের মায়া' —	দেশ পত্রিকা, ২৫শে শ্রাবণ
'বিস্মৃত কাহিনী' —	ঐ, ২৯শে চৈত্র

১৩৪৩ সাল

'প্রতিষ্ঠা' —	বিচিত্রা, মাঘ
'কল্লোল' —	দেশ ২০শে আষাঢ়

১৩৪৪ সাল

'আত্মহত্যা' —	বিচিত্রা, পৌষ
'রাণু ও কবিতা' —	ঐ, শ্রাবণ
'পরশ' —	ঐ, কার্তিক
'মায়াপুরী' —	ঐ, বৈশাখ
'স্বরূপরায়ের গাঙ' —	দেশ, কার্তিক

১৩৪৫ সাল

'অপেক্ষা' —	বিচিত্রা, কার্তিক
'বাঁচবার অধিকার' —	ঐ, জ্যৈষ্ঠ
'ভিত্তি' —	ঐ, মাঘ
'সতীদাহ' —	ঐ, পৌষ
'দ্বিতীয় অধ্যায়' —	শারদীয় আনন্দবাজার
'হত্যা' —	আনন্দবাজার (বার্ষিক),
'নোনাগাঙের কাহিনী' —	অলকা, চৈত্র

১৩৪৬ সাল

'তান্ত্রিক' —	বিচিত্রা, বৈশাখ
'বল্লম' —	অলকা, পৌষ
'শব' —	ঐ, জ্যৈষ্ঠ
'ভৌতিক'—	শনিবারের চিঠি, ভাদ্র
'কপালকুণ্ডলা'—	ঐ, আশ্বিন
'সোস্যালিস্ট'—	ঐ, শ্রাবণ
'যখ' —	শারদীয় আনন্দবাজার
'জাগ্রতা'—	বৈজয়ন্তী পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৩৪৭ সাল

'বন্ধনী'—	শনিবারের চিঠি, কার্তিক
'ঘূর্ণি'—	শারদীয় দেশ

'পাণ্ডুলিপি'—	বার্ষিক আনন্দবাজার

১৩৪৮ সাল

'মুখোশ'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'ভাঙা বন্দর'	শারদীয় ঐ
'মহামারী'—	শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ
'আততায়ী'—	চলন্তিকা

১৩৪৯ সাল

'অজগরের অপঘাত'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'বীতংস'—	শারদীয় ঐ
'পলাতক'—	শনিবারের চিঠি, আষাঢ়
'স্বর্ণসীতা'—	অলকা, পৌষ

১৩৫০ সাল

'নীলা'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'সৈনিক'—	শারদীয় ঐ
'কঞ্চুক'—	শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ
'রাঙীর মাঠ—'	ঐ, আশ্বিন
'রজনীগন্ধা'—	ঐ, চৈত্র
'বনবিড়াল'—	প্রভাতী, ফাল্গুন

১৩৫১ সাল

'ভাঙা চশমা'—	দেশ, ৭ই মাঘ
'পুষ্করা'—	ঐ, ৯ই অগ্রহায়ণ
'কপিলা'—	ঐ, ২৪শে চৈত্র
'খড়্গ'—	শারদীয় যুগান্তর
'পাইপ'—	ঐ, ৩রা অগ্রহায়ণ
'দুঃশাসন'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'কবর'—	বর্ষশেষ, অগ্রহায়ণ
'কালো জল'—	শারদীয় আনন্দবাজার
'পিঞ্জর'—	শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ

১৩৫২ সাল

'বনজ্যোৎস্না'—	শারদীয় দেশ,
'বীরভোগ্যা'—	ঐ ২রা আষাঢ়
'দুর্লঙ্ঘ্য'—	ঐ, ১৯শে মাঘ
'বৃত্ত'—	বার্ষিক আনন্দবাজার

'মৃত্যুবাণ'—		শারদীয় ঐ
'চক্রব্যুহ'—		শারদীয় যুগান্তর
'জন্মান্তর'—		মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন
'জান্তব'—		দিগন্ত, চৈত্র
'দাদুর রোমান্স'—		গল্পভারতী ২য় গ্রন্থ
'পরমাত্মীয়'—		অভিবাদন, মাঘ
	১৩৫৩ সাল	
'অপঘাত'—		পূর্বাশা, পৌষ
'জীবাণু'—		ঐ, চৈত্র
'ফলশ্রুতি'—		ঐ, বৈশাখ
'দাদুর রোমান্স'—		(নৈশপর্ব) গল্পভারতী ১০ম গন্থ
'দেশলাইয়ের বাক্স'—		ঐ (পূজার অর্ঘ্য),
'ধন্বন্তরি'—		বার্ষিক আনন্দবাজার
'ভোগবতী'—		শারদীয় ঐ
'টোপ'—		শারদীয় স্বাধীনতা
'ডিনার'—		পরিচয়, আশ্বিন
'তরফদার'—		শারদীয় দেশ
'দক্ষিণেতে ভুজঙ্গম'—		শারদীয় যুগান্তর
'পাশা'—		সংহতি, আশ্বিন
'বিভীষণ'—		শারদীয় দৈনিক বসুমতী
'শিল্পী'—		চতুরঙ্গ, পৌষ
'সভাপতি'—		মৌচাক, পৌষ
	১৩৫৪ সাল	
'ছুটি'—		পূর্বাশা, শ্রাবণ
'ভুতুড়ে'—		বার্ষিক শিশুসাথী
'মা'—		শারদীয় স্বাধীনতা
'রক্তাক্ত'—		অভিবাদন, গ্রীষ্ম
'শৈবা'—		পূর্বাশা, কার্তিক
'অলক্তক'—		গল্পভারতী, বৈশাখ
'ইজ্জৎ'—		শারদীয় যুগান্তর
'উস্তাদ মেহের খাঁ'—		শারদীয় দেশ
'একটি শত্রুর কাহিনী'—		বর্তমান, জ্যৈষ্ঠ
'কালনেমি'—		পরিচয়, পৌষ

'কালাবদর'—	মেঘনা, বৈশাখ
'ঘাসবন'—	শারদীয় আনন্দবাজার
'ঘাতক'—	চলন্তিকা, পৌষ ১৩৫৪ — ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ

১৩৫৫ সাল

'হাঁস'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'দ্বীপ'—	শারদীয় ঐ
'কনে দেখা আলো'—	শারদীয় দেশ
'বেইমান'—	শারদীয় পশ্চিমবঙ্গ
'ভজহরি ফিল্‌ম কর্‌পোরেশন্‌'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'আলিগড় টু আগ্রা'—	পূর্বাশা, বৈশাখ
'ম্যাগ্নোলিয়া'—	শারদীয় অভিবাদন

১৩৫৬ সাল

'ছাত্র চরিতামৃত'—	শিশুসাথী, বৈশাখ
'ছেলে ধরার ইতিহাস'—	ঐ, জ্যৈষ্ঠ
'চক্রবর্তী'—	পরিচয়, বৈশাখ
'নিষাদ'—	গল্পভারতী, ভাদ্র
'পদসঞ্চর'—	শারদীয় আনন্দবাজার
'স্বাধীষ্ঠান'—	পূর্বাশা, বৈশাখ
'প্রচ্ছদপট'—	শারদীয় দেশ
'অধ্যাপক'—	বেতার জগত ১ — ১৫ আগস্ট ১৯৪৯

১৩৫৭ সাল

'পরের উপকার করিওনা'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'কালপুরুষ'—	শনিবারের চিঠি, আশ্বিন
'বাইচ'—	পরিচয়, আশ্বিন
'ভালোয় ভালোয়'—	মৌচাক, কার্তিক
'হাউই'—	ফতোয়া, বৈশাখ
'মর্গ'—	শারদীয় যুগান্তর
'পুরুষ'—	বেতার জগৎ ১৬ — ৩১ জানুয়ারী ১৯৫০

১৩৫৮ সাল

'হাসি'—	শনিবারের চিঠি, আশ্বিন
'আগুন নিয়ে'—	কথাসাহিত্য, ফাল্গুন
'দুরন্ত নৌকা ভ্রমণ'—	অভিষেক, পূজাবার্ষিকী
'পুতুল'—	শারদীয় দৈনিক বসুমতী

'বাইশে শ্রাবণ'—	শারদীয় যুগান্তর
'একটি অমর রাত্রি'—	তরুণের স্বপ্ন, কার্তিক
'কূটস্থ'—	মঞ্জরী, বৈশাখ
'দায়মোচন'—	মাসিক বসুমতী, আশ্বিন
'ওস্তাদের মার'—	বার্ষিক শিশুসাথী

১৩৫৯ সাল

'নববর্ষ'—	শনিবারের চিঠি, বৈশাখ
'শ্বেত কমল'—	শারদীয় যুগান্তর
'সহমৃতা'—	শারদীয় দৈনিক বসুমতী
'বৃষ্টি'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'পোড়া তুবড়ি'—	নতুন সাহিত্য, ফাল্গুন
'দুর্ধর্ষ মোটর সাইকেল'—	পরশমণি (সঙ্কলন) আশ্বিন
'তিমিরাভিসার'—	শারদীয় দেশ
'অথচ'—	গল্পভারতী (শীতের অর্ঘ্য)
'চিত্ররেখা'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ১১ই মাঘ

১৩৬০ সাল

'কেন ভূত মানলাম'—	সচিত্র ভারত, ১৬ই মাঘ
'রোমাঞ্চকর'—	শারদীয় ঐ
'সপ্তপদী'—	শারদীয় দৈনিক বসুমতী
'ব্রাত্য'—	মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ
'উন্মোচন'—	শারদীয় স্বাধীনতা
'একটি ফুটবল ম্যাচ'—	মৌচাক, কার্তিক
'কল্পপুরুষ'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'মারীচ'—	শারদীয় ঐ
'গন্ধরাজ'—	শারদীয় যুগান্তর
'জরতী'—	শারদীয় দেশ
'বাঁচবার জন্যে'—	শারদীয় গল্পভারতী
'জুয়া'—	পরিচয়, বৈশাখ
'সূচনা'—	সংহতি, কার্তিক
'সেই বইটি'—	বসুধারা, মহালয়া
'দর্পণ'—	শারদীয় চতুষ্কোণ
'ব্রাত্য'—	মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ

১৩৬১ সাল

'অনেক বেশি আকাশ'—	বার্ষিক আনন্দবাজার

'একতমা'—	রবিবাসরীয় ঐ, ২৩শে শ্রাবণ
'চায়ের বিকেল'—	ঐ, ৯ই মাঘ
'ধস'—	শারদীয় আনন্দবাজার
'প্রতিনায়ক'—	রবিবাসরীয় ঐ, ৯ই জ্যৈষ্ঠ
'প্রহরী'—	ঐ ২১শে কার্তিক
'হরিণের রঙ'—	ঐ ১৫ই ফাল্গুন
'কুট্টিমামার হাতের কাজ'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'সদা হাস্যমুখে থাকিবে'—	ঐ, বৈশাখ
'নোট'—	কথাশিল্প, মাঘ
'নতুন গান'—	শারদীয় স্বাধীনতা
'ক্রিকেট মানে ঝিঁ ঝিঁ'—	মাসিক বসুমতী, মাঘ
'গ্রহণ'—	শারদীয় যুগান্তর
'টাকা'—	ক্রান্তি, আশ্বিন
'ট্রেন'—	নতুন সাহিত্য, বৈশাখ
'ধানশ্রী'—	শারদীয় উল্টোরথ
'নদীর নামটি অঞ্জনা'—	শারদীয় তরুণের স্বপ্ন
'নিহিত'—	সংহতি বৈশাখ

১৩৬২ সাল

'খাঁচা'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২৫শে ভাদ্র
'নকল'—	ঐ, ৩১শে বৈশাখ
'পদধ্বনি'—	ঐ, ২রা পৌষ
'ভাটিয়ালী'—	বার্ষিক ঐ
'প্রপাত'—	শারদীয় ঐ
'গোত্র'—	শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন
'তাস'—	ঐ, জ্যৈষ্ঠ
'কলঙ্ক'—	শারদীয় দেশ
'উভয়ত'—	তরুণের স্বপ্ন, বৈশাখ
'গলি'—	সংহতি, বৈশাখ
'দেনা'—	শারদীয় যুগান্তর
'পূতাস্থি'—	সঞ্চয়ণ (সিটি কলেজ, বার্ষিকী)
'পেশোয়ার কি আমীর'—	দেবালয় (সঙ্কলন)
'রোমাঞ্চকর'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'সন্তোষ মল্লিকের গল্প'—	রবিবাসরীয় যুগান্তর, ১১ই আষাঢ়

১৩৬৩ সাল

'শিবদাসবাবু'—	শারদীয় সচিত্র ভারত
'সভাপতিত্ব'—	ঐ, ১লা বৈশাখ
'সাপের মাথার মণি'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২২শে পৌষ
'সিংহ'—	ঐ, ৯ই বৈশাখ
'উত্তরপুরুষ'—	শারদীয় স্বাধীনতা
'সাংঘাতিক'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'আলপিন'—	পূর্বাশা, ফাল্গুন
'আতিথ্য'—	আন্তর্জাতিক, জ্যৈষ্ঠ
'খেয়া'—	শারদীয় তরুণের স্বপ্ন
'আজাহারউদ্দীন'—	পরিচয়,ভাদ্র-আশ্বিন
'কুট্টিমামার দন্তকাহিনী'—	জয়যাত্রা, মহালয়া
'অভিনয়'—	শারদীয় যুগান্তর

১৩৬৪ সাল

'কালো মোটর'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'খুনী'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ৫ই শ্রাবণ
'ব্লেড'—	ঐ, ২৫শে বৈশাখ
'স্টিমারের জন্য'	ঐ, ২২শে অগ্রহায়ণ
'আমরা'—	শারদীয় কথাসাহিত্য
'করাত'—	শনিবারের চিঠি, আশ্বিন
'ক্রাইসিস'—	শারদীয় তরুণের স্বপ্ন
'থলে রহস্য'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'নীলকণ্ঠ'—	শারদীয় যুগান্তর
'সাহেব মিঞা'—	আন্তর্জাতিক, ভাদ্র
'প্রদীপ'—	আবাহন (সংকলন), কার্তিক
'ছায়াসঙ্গিনী'—	শারদীয় দেশ
'বাঘের ভয়'—	ঐ সপ্তর্ষি
'বিকল্প'—	অনুক্ত, মাঘ-চৈত্র
'ঢাউস'—	নবপত্রিকা (সঙ্কলন), আশ্বিন
'রক্ষক'—	উদয়তীর্থ (সঙ্কলন), মহালয়া
'ভবিষ্যৎ'—	শারদীয় স্বাধীনতা

১৩৬৫ সাল

'দায়'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২৯শে অগ্রহায়ণ

'আকাশ'—	ঐ, ২৫শে মাঘ
'ট্রেনফেল'—	ঐ, ৭ই ভাদ্র
'উদ্বোধন'—	বার্ষিক ঐ
'কান্না'—	রবিবাসরীয় ঐ, ২১শে বৈশাখ
'ক্ষত'—	শারদীয় ঐ
'স্বখাত'—	রবিবাসরীয় ঐ, ১লা চৈত্র
'পুনশ্চ'—	ঐ, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ
'অন্যমনস্ক চোর'—	শিশুসাথী, বৈশাখ
'লঙ্কানাথম্ কটুসুন্দরম্'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'খুনী'—	শারদীয় স্বাধীনতা
'দাম'—	শারদীয় তরুণের স্বপ্ন
'চার নম্বর জুয়ারী'—	শারদীয় গল্পভারতী
'কৃতজ্ঞতা'—	সংহতি, বৈশাখ
'আর একজন'—	শারদীয় আগামী
'একজিবিশন'—	শারদীয় দেশ
'একটি চিঠি'—	আবাহন, বৈশাখ
'কবি সম্বর্ধনা'—	শুকতারা, চৈত্র
'দি গ্রেট ছাঁটাই'—	অপরাজিতা (পূজাবার্ষিকী)
'সেবনের পূর্বে ও পরে'—	শারদীয় যষ্টিমধু
'শুভক্ষণ'—	বসুধারা, মাঘ
'শিকার'—	শারদীয় উল্টোরথ
'নমুনা'—	আন্তর্জাতিক, ভাদ্র-আশ্বিন
'মধুবন্তী'—	পরিচয়, বৈশাখ
'বসুন্ধরা'—	শারদীয় যুগান্তর
'পাখি'—	শারদীয় সপ্তর্ষি

১৩৬৬ সাল

'কাপুরুষ'—	শনিবারের চিঠি,. বৈশাখ
'আতঙ্ক'—	ঐ, আশ্বিন
'অসত্য'—	ঐ, ফাল্গুন
'কমিশন'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২১শে কার্তিক
'তিলঙ্গমা'—	শারদীয় ঐ
'দু' আনার পুতুল'—	রবিবাসরীয় ঐ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ
'দায়িত্ব'—	ঐ, ১৬ই শ্রাবণ

'দক্ষিণা'—	ঐ, ১০ই মাঘ
'অমিতাভ'—	শারদীয় সমীপেষু
'একসূত্রে'—	ঐ, কথাসাহিত্য
'তিতির'—	পরিচয় ভাদ্র-আশ্বিন
'চারা'—	গল্পভারতী , চৈত্র
'গলি'—	শারদীয় যুগান্তর
'স্টাফরুম'—	বসুধারা, আশ্বিন
'দ্বৈত'—	শারদীয় অভিযান
'সায়েবের উপহার'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'সঞ্চার'—	শারদীয় দেশ
'শীত'—	শারদীয় উল্টোরথ
'নীতিতত্ত্ব'—	শারদীয় যষ্ঠিমধু
'শক্তি'—	শারদীয় স্বাধীনতা
'প্রতিপক্ষ'—	শারদীয় সপ্তর্ষি
'পরম্পরা'—	শারদীয় তরুণের স্বপ্ন
'রেকর্ড'—	ফসল, শ্রাবণ-আশ্বিন

১৩৬৭ সাল

'অপচয়'—	'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ
'বাইশ টাকার পুতুল'—	ঐ, ২৭শে কার্তিক
'অমনোনীতা'—	শারদীয় দেশ
'বল্টুদার উৎসাহ লাভ'—	অপরূপা, (সঙ্কলন) মহালয়া
'প্রহসন'—	শারদীয় বিংশ শতাব্দী
'একখানি বই'—	আন্তর্জাতিক, রবীন্দ্র সংখ্যা
'গজকেষ্টবাবুর হাসি'—	বার্ষিক শিশুসাথী

১৩৬৮ সাল

'রিবনবাঁধা ভালুক'—	শারদীয় দেশ
'মাৎস্যন্যায়'—	দেশ, ২রা অগ্রহায়ণ
'একটি মনোরম দিবস'—	দেশ, ২৩শে আষাঢ়
'অভ্যর্থনা'—	দেশ, ১৭ই চৈত্র
'বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে'—	দেশ, ২৩শে ভাদ্র
'কুলতিলক'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২৯শে পৌষ
'জিরাফ'—	ঐ, ২৪শে আষাঢ়
'তৃতীয় লোকটি'—	ঐ

'রাজপুত্র'—	শারদীয় ঐ
'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে'—	বার্ষিক ঐ
'হরিশপুরের রসিকতা'—	সেরা সন্দেশ, পৌষ
'স্মারক'—	মণিমঞ্জরী (সঙ্কলন), মহালয়া
'আফ্রেদিতে'—	শারদীয় অমৃত
'বেয়ারিং ছাঁট'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'তিন আনার আমের জন্য'—	ময়ূরপঙ্খী (পূজাবার্ষিকী)
'একটি ইতরলোকের কাহিনী'—	রবিবাসরীয় যুগান্তর, ২৭শে ফাল্গুন
'কাদা'—	শারদীয় যুগান্তর
'জয়দ্রথ বধ'—	শিশুসাথী, বৈশাখ
'শতবার্ষিকী'—	শারদীয় স্বাধীনতা
'সমাধান'—	শারদীয় লোকসেবক
'সাঁকো'—	পরিচয়, আশ্বিন
'সমুদ্রে ঢেউ'—	মানসী, মার্চ ১৯৬১
'হাসির গল্প'—	ঐ
'ছায়ামূর্তি'—	শারদীয় বেতার-জগত

১৩৬৯ সাল

'একটি কৌতুকনাট্য'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২০শে মাঘ
'উভয়ত'—	ঐ, ১৬ই আষাঢ়
'এক জঙ্গল থেকে'—	শারদীয় আনন্দবাজার
'শিকার'—	শারদীয় স্বাধীনতা
'হলদে বাস'—	শারদীয় উল্টোরথ
'গান শোনবার নিমন্ত্রণ'—	দেশ, ৮ই অগ্রহায়ণ
'ঘুম'—	জয়শ্রী, আশ্বিন
'হরিদাস আর নীল মাছি'—	অলকানন্দা, (পূজাবার্ষিকী)
'সহচর'—	অন্য ভুবন, ৮ই বৈশাখ
'চতুর্থ কোণ'—	শারদীয় অমৃত
'টুটুনের প্রতিজ্ঞা'—	পার্বণী, মহালয়া
'যাচাই'—	শারদীয় গল্পভারতী
'মেঘের ছায়া'—	বসুধারা, বৈশাখ
'মাল্টিপারপাস'—	সন্দেশ, আশ্বিন
'দালালী'—	শারদীয় সমীপেষু
'নিদারুণ প্রতিশোধ'—	বেতার-জগৎ ১ — ১৫ মার্চ ১৯৬২

১৩৭০ সাল

'লালঘোড়া'—	শারদীয় দেশ
'একটি মোটর যাত্রা'—	দেশ, ২৮ শে আষাঢ়
'একটি করুণ ফোটোগ্রাফি'—	ঐ, ১৪ই চৈত্র
'তমস্বিনী'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'দ্বিতীয় শরীর'—	শারদীয় ঐ
'অন্ধকারের প্রহরী'—	বসুধারা, শ্রাবণ
'সমুদ্রের ঢেউ'—	শারদীয় মধুরেণ
'সেই চেয়ারটা'—	শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী
'আমার মার গল্প'—	অমৃত, ২৪শে মাঘ
'সংক্রামক'—	শারদীয় টেক্কা
'এতটুকু বাসা'—	ঐ, স্বাধীনতা
'ক্যাকটাস'—	ঐ, মঞ্জরী
'দ্বৈত সংলাপ'—	ঐ, সমীপেষু
'তালিয়াৎ'—	মৌচাক বৈশাখ
'ছোঁয়াচ'—	জাগৃহী, আশ্বিন
'টিকটিকির ল্যাজ'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'তত্ত্বাবধান মানে জীবে প্রেম'—	শ্যামলী (সঙ্কলন), মহালয়া
'ট্যাক্সিওয়ালা'—	শারদীয় দৈনিক বসুমতী
'কাক রহস্য'—	বেতার-জগত ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩

১৩৭১ সাল

'মেঠো ইঁদুর'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'এম. এ. পি. এইচ. ডি.'—	রবিবাসরীয় ঐ, ২৪শে মাঘ
'কুটুম্ব সন্ধানে'—	ঐ, ৯ই ফাল্গুন
'ট্রাপিজ'—	ঐ, ২৭ শে বৈশাখ
'বন্ধু'—	ঐ, ১৯শে পৌষ
'স্পর্শমণি'—	ঐ, ১০রা মাঘ
'ভবভূতি চরিত'—	ঐ, ১৭ই মাঘ
'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্'—	ঐ, ২রা ফাল্গুন
'ভুতূড়ে কামরা'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'ফাঁকি'—	ঐ, শ্রাবণ
'ওস্তাদে ওস্তাদে'—	সন্দেশ, ভাদ্র-আশ্বিন
'হনোলুলুর মাকুদা'—	ঐ, জ্যৈষ্ঠ

'কাঁকড়াবিছে'—	উত্তরায়ণ
'স্টেজ'—	শারদীয় বেতার জগৎ
'সেই পাখিটা'—	শারদীয় দেশ
'খেয়া'—	জনতা, মহালয়া
'জার্নি বাই কার'—	রোশনাই, কার্তিক
'সীমারেখা'—	শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী
'সীমা'—	ঐ, লোকসেবক
'দুই বৃত্ত'—	ঐ, যুগান্তর
'রঙ্গ বিচিত্রা'—	রবিবাসরীয় ঐ, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ
'শান'—	শারদীয় চিত্রাঙ্গদা
'পেশা'—	ঐ, জলসা
'বিশ্বকর্মা'—	ঐ, মঞ্জরী,
'ভৌতিক'—	ঐ, কলাকার
'সত্য'—	বেতার জগত ১৬-৩১ মে, ১৯৬৪

১৩৭২ সাল

'আরো একজন'—	অমৃত, ১১ই চৈত্র
'ওপার'—	শারদীয় ঐ
'তিনজন এবং চতুর্থ'—	ঐ, আনন্দবাজার
'বাস্তব কল্পনা'—	রবিবাসরীয় ঐ, ১৯শে বৈশাখ
'অপমৃত্যু'—	শারদীয় সূর্যশপথ
'কবিতার জন্ম'—	নীহারিকা
'সাকী'—	শারদীয় ঘরোয়া
'শিকারী'—	ঐ, সাপ্তাহিক বসুমতী
'জগন্নাথের ঠ্যাঙা'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'দামী মোটর'—	শারদীয় গল্পভারতী
'নবাবী আমলের গল্প'—	ঐ, রোশনাই
'দিনান্ত'—	বেতার-জগত ১-১৫ অক্টোবর, ১৯৬৫

১৩৭৩ সাল

'অলৌকিক'—	বেতার-জগত ১-১৫ মার্চ, ১৯৬৬
'একদিনের উপোস'—	ঐ, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
'ক্যামেরা'—	রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ
'জ্যোৎস্নার ভিতর'—	শারদীয় আনন্দবাজার
'মৃগয়া'—	বার্ষিক ঐ

'হারপুণ'—	আনন্দ (শারদীয় সঙ্কলন)
'অকজ্জল'—	শারদীয় অমৃত
'অথাতো'—	শারদীয় স্বরান্তর
'সেই স্টেশন'—	পরিচয়, চৈত্র
'মৃত্তিকা'—	শারদীয় দেশ
'পঞ্চাননের কেনাকাটা'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'জেরা'—	শারদীয় দৈনিক বসুমতী
'অলক্ষ্মী'—	নতুন পরিবেশ, আশ্বিন
'আলেয়ার রাত'—	কথাসাহিত্য, কার্তিক
'ছুটির দিনটা'—	শারদীয় মঞ্জরী
'ঐ অন্ধ এবং তার বেহালা'—	শারদীয় চিত্রাঙ্গদা
'এক টুকরো'—	শারদীয় সূর্যশপথ
'লাভ'—	শারদীয় উল্টোরথ, ১৯৬৬
'অমনোনীত'—	নববর্ষ ঐ

১৩৭৪ সাল

'আটটা বাইশের ট্রেন'—	বার্ষিক আনন্দবাজার,
'বিসর্জন'—	শারদীয় ঐ,
'কালপুরুষ'—	দেশ, ৮ই অগ্রহায়ণ
'সেই মৃত্যুটি'—	শারদীয় দেশ
'নায়িকার সতীন'—	রবিবাসরীয় যুগান্তর, ২৫ শে কার্তিক
'মর্যাদা'—	শারদীয় ঐ
'আলুকাবলী'—	সন্দেশ, ভাদ্র - আশ্বিন
'স্টাফ রুম'—	শারদীয় সপ্তর্ষি
'সিদ্ধিদাতা'—	ঐ, অমৃত
'সহধর্মিনী'—	ঐ, উল্টোরথ
'এক টুকরো'—	ঐ, একালীন
'একটি জানালা খুলতে'—	আনন্দ (শারদীয় সঙ্কলন)
'ক্যালেণ্ডার'—	শারদীয় জয়শ্রী
'টিকটিকিবাবুর গল্প'—	ঐ, রোশনাই
'দশানন-চরিত'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'বন'—	ধ্বনি, (নবপর্যায়) ২রা চৈত্র
'শয়তানের সাঁকো'—	বেণুবীণা, (সঙ্কলন)
'রচনার রহস্য'—	সন্দেশ, বৈশাখ

'বিদেশী বড় গাড়িটা'—	শারদীয় দৈনিক বসুমতী

১৩৭৫ সাল

'হাতি চড়া মেজাজ'—	সন্দেশ, ভাদ্র-আশ্বিন
'তাঁর গল্প'—	সন্দেশ, বৈশাখ
'হয়তো'—	শারদীয় উল্টোরথ
'একাদশীর রাঁচীযাত্রা'—	বার্ষিক শিশুসাথী
'কিক'—	দীপান্বিতা, আষাঢ়
'চোখ'—	শারদীয় যুগান্তর
'দোসর'—	দেশ, ১৪ই অগ্রহায়ণ
'দেবদাস ও তিতির'—	শারদীয় পরিচয়,
'চোরাবালি'—	শারদীয় নবরূপা
'টুটুল'—	ঐ জলসা
'দিদির সঙ্গে'—	ঐ অমৃত
'টেনিদা আর ইয়েতি'—	ইন্দ্রনীল, (সঙ্কলন মহালয়া)
'টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক'—	আনন্দ, (শারদীয় সঙ্কলন)
'পেন্সিল কাটা ছুরি'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'সিগারেট'—	অনুক্ত, শ্রাবণ-আশ্বিন
'মেয়েটি'—	শারদীয় ধ্বনি, (নবপর্যায়)
'ভগবান আছেন'—	ঐ রোশনাই
'বংশবাবুর হংস'—	রামধনু, বৈশাখ
'ভালোবাসা'—	শারদীয় সপ্তর্ষি
'মশা'—	অমৃত, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ

১৩৭৬ সাল

'বিড়ি'—	শারদীয় দেশ
'মদনভস্ম'—	ঐ, ২২শে কার্তিক
'মিছিলের মধ্যে'—	বার্ষিক আনন্দবাজার
'লক্ষ্মীর পা'—	শারদীয় ঐ
'অভিনেতা'—	ঐ, সিনেমা জগৎ
'নাম রহস্য'—	সন্দেশ, ভাদ্র-আশ্বিন
'দোলন চাঁপার বৃন্ত'—	শারদীয় যুগান্তর
'এক টুকরো'—	প্রগতি, অগ্রহায়ণ
'গণ্ডার'—	শারদীয় সপ্তর্ষি
'দু'জন'—	কথাসাহিত্য, বৈশাখ

‘প্রভাত সঙ্গীত’— শুকসারি, মহালয়া

‘গুরুপ্রাপ্তি’— শারদীয় রোশনাই

‘দাদা হওয়ার দাম’— শারদীয় (সঙ্কলন)

‘ঘোড়ামামার কাটলেট’— বার্ষিক শিশুসাথী

‘প্রভাত সঙ্গীত’— শুকসারি (সঙ্কলন গ্রন্থ) মহালয়া

‘যুধিষ্ঠিরের কুকুর’— শারদীয় বেতার-জগৎ

১৩৭৭ সাল

‘কে যে লোকটা’— শারদীয় দেশ

‘তপনের চৌরচর্চা’— সাহিত্য-সংখ্যা দেশ

‘চরণামৃত’— রোশনাই, জ্যৈষ্ঠ

‘টিকেট’ — শারদীয় ঐ

‘হারানো মেডেল’— ঐ, অগ্রহায়ণ-পৌষ

‘অবিশ্বাস’— শারদীয় সপ্তর্ষি

‘ওরা’— ঐ, সাপ্তাহিক বসুমতী

‘করাতের শব্দ’— ঐ, কালান্তর

‘বন্দুকটা’— শীর্ষাণু, জুলাই

‘দুর্লভ রায়ের কথা’— ঐ, জুলাই

‘বাদশাহী গল্প’— শারদীয় ঝুমঝুমি

‘খাঁড়া মশাই’— বার্ষিক শিশুসাথী

১৩৭৮ সাল

‘নেমকহারাম’— শারদীয় যুগান্তর

‘চলে যাওয়া— ঐ

‘গন্ধরাজ’— সাপ্তাহিক বসুমতী, দীপাবলী সংখ্যা

‘সীসা’— শারদীয় নবকল্লোল

গ্রন্থপঞ্জী

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত'	(১৩৬৭)
অমলেন্দু দে	ঃ	'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ'	(১৯৭৪)
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	ঃ	'কল্লোল যুগ'	(১৩৫৭)
আর. জি. মূর	ঃ	'ক্রাইসিস অব ইণ্ডিয়ান ইউনিটি'	(১৯৭৪)
আন্তানোভা, বোনগার্দ-লেভিন, কতোভ্স্কি	ঃ	'ভারতবর্ষের ইতিহাস'	(১৯৮২)
ও. হেনরী	ঃ	'শ্রেষ্ঠ গল্প' (বিমল মিত্র অনূদিত, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত)	(১৩৯৮)
ক্ষেত্র গুপ্ত	ঃ	'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'	(১৩৬৮)
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	ঃ	'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'	(১৩৮০)
জ্যোৎস্না গুপ্ত	ঃ	'পরশুরামের মন ও শিল্প'	(১৯৮৫)
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	ঃ	'নির্বাচিত গল্প' (সম্পাদনা নিতাই বসু)	(১৯৮৯)
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	'নিশিপদ্ম' ২য় প্রকাশ	(১৩৮৯)
ঐ	ঃ	'গল্পপঞ্চাশৎ' (সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ রায়)	(১৯৬৩)
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	ঃ	'নাট্যতত্ত্ববিচার'	(১৩৯১)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	'সাহিত্যে ছোটগল্প'	(১৩৬৫)
	ঃ	'বাংলা গল্প বিচিত্রা'	(১৩৯২)
	ঃ	'রচনাবলী' ১ম খণ্ড	(১৩৮৬)
	ঃ	২য় খণ্ড	(ঐ)
	ঃ	৩য় খণ্ড	(১৩৮৭)
	ঃ	৪র্থ খণ্ড	(ঐ)
	ঃ	৫ম খণ্ড	(১৩৮৮)
	ঃ	৬ষ্ঠ খণ্ড	(১৩৮৯)
	ঃ	৭ম খণ্ড	(১৩৯০)
	ঃ	৮ম খণ্ড	(১৩৯১)
	ঃ	৯ম খণ্ড	(১৩৯২)
	ঃ	১০ম খণ্ড	(১৩৯৪)
	ঃ	১১শ খণ্ড	(১৩৯৪)
	ঃ	১২শ খন্ড	(১৩৯৫)
	ঃ	'সুনন্দর জার্নাল'	(১৩৮৪)
	ঃ	'সমগ্র কিশোর সাহিত্য' ১ম খণ্ড	(১৯৭৮)
	ঃ	২য় খণ্ড	(১৯৮১)
	ঃ	৩য় খণ্ড	(১৯৮৭)
	ঃ	৪র্থ খণ্ড	(১৯৮৭)
	ঃ	'শ্রেষ্ঠ গল্প' (সম্পাদনা জগদীশ ভট্টাচার্য)	(১৩৬১)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'গল্পমালা ৪' (সম্পাদনা অভিজিৎ মিত্র) (১৯৯৪)

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ 'আধুনিক ভারত' ২য় খণ্ড (১৯৮৪)

প্রমথনাথ বিশী ঃ 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (১৩৬১)

বি. বি. মিশ্র ঃ 'দ্য ইণ্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস' (১৯৬১)

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ঃ 'আধুনিক কবিতা' (১৩৪৬)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'রচনাবলী' ১ম খণ্ড (১৩৬০)

ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার (১৯৬২)

মনোজ বসু ঃ 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ) (১৩৭৮)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ' সেরা মানিক' সম্পাদনা শিখা ঘোষ (১৩৯৯)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'সঞ্চয়িতা' (১৩৩৮)

ঃ 'রচনাবলী' ৭ম খণ্ড (১৩৯৫)

ঃ 'রচনাবলী' ১২শ খণ্ড (১৩৯৭)

ঃ 'রচনাবলী' ১১শ খণ্ড (১৩৯৭)

রবিন পাল ঃ 'কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮০)

রথীন্দ্রনাথ রায় ঃ 'ছোটগল্পের কথা' (১৯৫৯)

শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ 'প্রভাতকুমার ঃ জীবন ও সাহিত্য' (১৯৭৩)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সংস্করণ (১৩৬৯)

সুকুমার সেন ঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩য় খণ্ড (১৩৫০)

সরোজমোহন মিত্র ঃ 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা' (১৯৬৪)

সরোজ দত্ত ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' (১৯৯৬)

সমরেশ মজুমদার ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' (১৯৮৬)

ঃ 'জায়গা' (১৯৭৩)

সতীশ পাকড়াশি ঃ 'অগ্নিযুগের কথা' (১৩৭৮)

পত্র - পত্রিকা

'অপরাজিতা' পূজাবার্ষিকী (১৩৬৫)

'অলকানন্দা' পূজাবার্ষিকী (১৩৬১)

'অভিষেক' পূজাবার্ষিকী (১৩৫৮)

'অভিযান' শারদীয়া (১৩৬৬)

'আরাধনা' সেপ্টেম্বর (১৯৮৪)

'আগামী' সেপ্টেম্বর (১৩৬৪)

'ইন্দ্রনীল' সঙ্কলন, মহালয়া (১৩৭৫)

'উদিত' প্রবন্ধ সংখ্যা, বিষয় ছোটগল্প ৪র্থ বর্ষ/১ম সংখ্যা, ফাল্গুন (১৩৯৩)

'কথাসাহিত্য' কার্ত্তিক (১৩৭৩)

	ফাল্গুন	(১৩৫৮)
	আশ্বিন	(১৩৭৩)
	শারদীয়	(১৩৬৬)
'কথাশিল্প'	মাঘ	(১৩৬১)
'কালান্তর'	শারদীয়	(১৩৭৭)
'কোরক'	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা	(১৯৯২)
'গল্পভারতী'	ভাদ্র	(১৩৫৬)
	শারদীয়	(১৩৬০)
	শারদীয়	(১৩৬৯)
	শারদীয়	(১৩৭২)
	আশ্বিন	(১৩৬৫)
'চলন্তিকা'		(১৩৪৭)
'চলন্তিকা'		(১৩৪৮)
'চলন্তিকা'	পৌষ ১৩৫৪ - ১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ	
'চতুষ্কোণ'	শারদীয়	(১৩৬০)
'জয়যাত্রা'	মহালয়া	(১৩৬৩)
'দাগ'	সাহিত্য সিনেমার সচিত্র মাসিক পত্রিকা, ৮ম প্রকাশ, মহালয়া	(১৩৭৩)
'দেবালয়'	সঙ্কলন	(১৩৬৫)
'ধ্বনি'	নবপর্যায় ২রা চৈত্র	(১৩৭৪)
'ধ্বনি'	নবপর্যায়	(১৩৭৫)
'নবপত্রিকা'	সঙ্কলন আশ্বিন	(১৩৬৪)
'পরশমণি'	সঙ্কলন, আশ্বিন	(১৩৫৯)
'বৈজয়ন্তী'	১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা	(১৩৪৬)
'বসুধারা'	মহালয়া	(১৩৬০)
'মৌচাক'	পৌষ	(১৩৫৩)
	কার্ত্তিক	(১৩৫৭)
	কার্ত্তিক	(১৩৬০)
	বৈশাখ	(১৩৭০)
'মেঘনা'	বৈশাখ	(১৩৫৪)
'মধুরেণ'	শারদীয়	(১৩৭০)
'রোশনাই'	কার্ত্তিক	(১৩৭১)
	জ্যৈষ্ঠ	(১৩৭৭)
	শারদীয়	(১৩৭২)
	ঐ	(১৩৭৪)
	ঐ	(১৩৭৫)

'রোশনাই'	নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ	(১৩৭৭)
'শনিবারের চিঠি'	ভাদ্র	(১৩৪৬)
	কার্ত্তিক	(১৩৪৭)
	শ্রাবণ	(১৩৪৩)
	আষাঢ়	(১৩৪৯)
	জ্যৈষ্ঠ	(১৩৫০)
	আশ্বিন	(১৩৫০)
	চৈত্র	(১৩৫০)
	শ্রাবণ	(১৩৫১)
	আশ্বিন	(১৩৫৮)
	বৈশাখ	(১৩৫৯)
	ফাল্গুন	(১৩৬২)
	জ্যৈষ্ঠ	(১৩৬২)
	আশ্বিন	(১৩৬৪)
	বৈশাখ	(১৩৬৬)
	সারস্বত সংখ্যা	(১৩৭৬)
'শুকসারি'	মহালয়া	(১৩৭৬)
'স্বাধীনতা'	শারদীয়	(১৩৫৩)
	"	(১৩৫৪)
	"	(১৩৬০)
	"	(১৩৬১)
	"	(১৩৬৩)
	"	(১৩৬৪)
	"	(১৩৬৫)
	"	(১৩৬৬)
	"	(১৩৬৮)
	"	(১৩৬৯)
'সেরা সন্দেশ'	পৌষ	(১৩৬৮)
	পৌষ	(১৩৮৮)
'সন্দেশ'	আশ্বিন	(১৩৬৯)
	ভাদ্র - আশ্বিন	(১৩৭৫)
	বৈশাখ	(১৩৭৪)
	ভাদ্র - আশ্বিন	(১৩৭১)
	ভাদ্র - আশ্বিন	(১৩৭৬)
'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা,	মাঘ - চৈত্র	(১৩৯৮)
	শ্রাবণ - আশ্বিন	(১৩৭৭)